বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান

(১৮৮৫-১৯৩০)

রশীদ আল ফারুকী

মুক্তধারা

৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

প্রথম প্রকাশ
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
৮ ফাল্গুন ১৩৭৮



প্রকাশক : চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ], ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। মুদ্রণ : প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১, বাংলাদেশ। প্রচ্ছদ : আবুল বারক আলভী। [স্ব] জীনান শম্পা।

ভূমিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কল্যানীয় খায়ের-উল বসর 'মুসলিম রচিত বাংলা উপন্যাস' (১৮৮৫—১৯৩০) শীর্ষক পি-এইচ. ডি.-র জন্য প্রদত্ত গবেষণা গ্রন্থটি সম্প্রতি "বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান" নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমার নির্দেশে উক্ত গবেষণা প্রস্তুত করে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেছেন। আমার কাছে তিনি গবেষণা করেছেন বলে, তাঁর গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলতে সংকোচ বোধ করছি। পাঠকেই তার ভালোমন্দ বিচার করবেন।

শ্রীমান বসর "রশীদ আল ফারুকী" এই নামে প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখে থাকেন। আমি তাঁর কিছু কিছু মুদ্রিত রচনা দেখেছি। তাঁর মতামত কোন কোন সময়ে আমার মতের আনুকূল্য করেনি। কিন্তু সাহিত্যে তাতে কিছু আসে যায় না। ব্যক্তি-ভেদে সাহিত্যের বিচারও পৃথক পৃথক হতে পারে, এবং তা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সকলেরই একসুরে কথা বলা সাহিত্যের ধর্ম নয়। সে যাই হোক, খায়ের-উল বসর এই গবেষণ গ্রন্থে অতিশয় প্রয়াস করে, নানা স্থান থেকে তথ্যসংগ্রহ করে সেগুলিকে বিন্যস্ত করেছেন, এবং তা থেকে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যূহ সন্নিবেশ করেছেন।

বাংলা উপন্যাসে বহু মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র স্থান পেয়েছে, মুসলমান লেখকগণও মুসলমান সমাজকে অবলম্বন করে বেশ কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন, অবিভক্ত বাংলাদেশে এরকম একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল, এখন উভয় বঙ্গেই তার ধারা অব্যাহত আছে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রাদির সমতুল্য কোন মুসলমান ঔপন্যাসিকের এখনও আবির্ভাব হয়নি, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁরা নিজ নিজ সমাজ সম্বন্ধে অতি সচেতন। কথাসাহিত্যে মুসলমান সমাজের ভূমিকা কতটা, খয়ের-উল বসর নানা তথ্য সন্ধান করে তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। পরিচ্ছন্ন গদ্যে যৌক্তিক পারম্পর্যের উপর ভিত্তি করে লেখা এই গবেষণাগ্রন্থ বাংলা উপন্যাস আলোচনা ও বিশ্লেষণের একটি স্মারকস্তম্ভ বলে বিবেচিত হবে। একটি প্রায়ান্ধকার প্রদেশে শ্রীমান বসর সন্ধানী আলোকবর্তিকা জেলে দিয়েছেন, এজন্য উভয় বঙ্গের পাঠক-পাঠিকা তাঁকে অভিনন্দিত করবেন।

সাহিত্যের গবেষণার জন্য শুধু তথ্যসন্নিবেশই যথেষ্ট নয়, তার জন্য একটি রসিক মনের সহৃদয়তা আবশ্যক। তা নইলে কেবল তথ্যের স্তূপ বাড়ে, তাতে সংগ্রহের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সমস্ত বিষয়টি নীরস রচনায় পর্যবসিত হয়। সুখের কথা,

বসরের এই রচনা তথ্য ও তত্ত্বের কচ্‌কচি না হয়ে একটি উপভোগ্য আলোচনায় পরিণত হয়েছে। আশা করব, এইখানেই তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয়ে থাকবে না, সাহিত্যের নতুন নতুন দিগন্ত তাঁর দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হোক এই আমার একান্ত কামনা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা নিবেদন

আমার এই গবেষণাপত্রটি দীর্ঘ দশ বছরের চিন্তা এবং তিন বছরের পরিশ্রমের ফল। 'বাঙলা সাহিত্যে চরিত্রচিত্রণ' (১৯৬৯) গ্রন্থটি দেখে ডক্টর মযহারুল ইসলাম আমাকে এই বিষয় নিয়ে একটি গবেষণামূলক কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর সেই পরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের তত্ত্বাবধানে 'মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণ' এই শিরোনামে গবেষণা শুরু করি। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করার পর আমি তাঁর নির্দেশ-মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে কাজ পুনরারম্ভ করি। ডক্টর আনিসুজ্জামান পূর্বের বিষয় অনুমোদন না করায় আমাকে চরিত্রচিত্রণ বাদ দিয়ে 'মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাস' এই শিরোনামে নতুন করে কাজ শুরু করতে হয়। কিছুকাল পর ভারত-বাঙলাদেশ সাংস্কৃতিক চুক্তির অধীনে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে কাজটি পুনরায় আরম্ভ করি।

বর্তমান গবেষণার জন্য ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী প্রদান করেছেন। আমার এই গবেষণা কাজের বিভিন্নস্তরে আমি উল্লিখিত শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। তার জন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। বিশেষত ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর আনিসুজ্জামানের ঋণ অপরিশোধ্য। প্রখ্যাত লেখক ও সমাজ-বিজ্ঞানী প্রয়াত বিনয় ঘোষ মহাশয় আমাকে এই ব্যাপারে শুধু উপদেশই প্রদান করেননি, তাঁর বিশাল গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র দিয়েও আমায় সাহায্য করেছেন। আমার কাজ তিনি দেখে যেতে পারেননি এই বেদনা আমায় চিরদিন পীড়িত করবে।

মুসলিম রাজনীতির উত্থানপতন সম্পর্কে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু দে, সাহিত্যিক শ্রীমিহির আচার্য ও জনাব আবদুল আজিজ আল আমান, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি আচার্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের কাছ থেকে আমি নানাপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। সাংবাদিক শ্রীনিরঞ্জন হালদার তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বহু বইপত্র পড়তে দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। এছাড়া আমার অনুজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব

মহম্মদ ইনাম উল হক এবং বাঙলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ভূঁইয়া ইকবালের কাছেও আমি নানাভাবে ঋণী। এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়েছেন আমার অনুজপ্রতিম সহকর্মী জনাব গোলাম মুস্তফা। তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বর্তমান গবেষণা-কর্মে যাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা আমাকে সর্বাধিক অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি আমার স্ত্রী বদরুন্নিসা খানম।

প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় রত্না প্রকাশনের রুচিবান কর্ণধার শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে ও মুদ্রণ সৌকর্যের জন্যে সাহিত্যিক বন্ধু শ্রী শ্যামল বসু-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণাপত্রটিকে বাস্তব রূপ প্রদানের জন্যে আমাকে বহু গ্রন্থাগারে কাজ করতে হয়েছে। এসব গ্রন্থাগারের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া লাইব্রেরি, আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগার, ঢাকার বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থাগারের কর্ম-কর্তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই প্রসঙ্গে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থগারিক শ্রীগোবিন্দ রায় ও শ্রীঅনিলবরণ রায় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মিসেস সিদ্দিকা জামানের কাছে। তাঁরা শুধু লাইব্রেরির বইপত্রের খোঁজখবরই দেননি, বাইরের নানাপ্রকার সূত্র সম্পর্কেও আমায় অবহিত করেছেন।

সবশেষে আমি বাঙলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে যথাক্রমে বৃত্তির জন্যে মনোনয়ন এবং বৃত্তি প্রদানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া কলকাতায় আতিথেয়তার জন্যে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশ্যানস'-এর কর্মকর্তাদের নিকটেও আমি ঋণী।

রশীদ আল ফারুকী

বাঙলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বাঙলাদেশ

উৎসর্গ

বাবা

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আবসার-স্মরণে :

যিনি আমার মতামত অনুমোদন করেননি, কিন্তু নিজের বিবেক ও বুদ্ধির নির্দেশ-অনুযায়ী চলতে আমাকে বাধা দেননি ;
যাঁর পথ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলাম, কিন্তু তাঁর সততা, সত্যনিষ্ঠা ও নীতিপরায়ণতার কাছে সর্বদাই অবনতমস্তক ছিলাম।

সূচীপত্র

ভূমিকা

॥ এক ॥

১৮৬৫ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের মাধ্যমে যে শিল্পকর্মের উদ্বোধন হলো তার গতি অনতিবিলম্বে তীব্রতা লাভ করলো। এই পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অনুকরণে বাঙলায় যেসব উপন্যাস রচিত হয় তা মান ও গুণের দিক দিয়ে অচিরেই যুগান্তর সৃষ্টি করলো। অতএব এসব রচনা ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হতে থাকলো। পরবর্তীকালে দেখা গেলো, শুধু উপন্যাসের ইতিহাস নিয়েও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—যাতে যুগপৎ ইতিহাস ও আলোচনা-সমালোচনা স্থান লাভ করেছে। এসব আলোচনা দুভাগে বিভক্ত। একভাগে রয়েছে সম্পূর্ণ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে উপন্যাস; অন্যভাগে শুধু উপন্যাসের আলাদা ইতিহাস। এসব ইতিহাসের অনেকগুলোই-যে বাঙলা সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাস-রচয়িতা হিসেবে সুকুমার সেন, মনোমোহন ঘোষ, গোপাল হালদার, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী যে অবদান রেখেছেন তার তুলনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অচ্যুত গোস্বামী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অবদান যে কোন দিক দিয়েই ন্যূন নয় তা যেকোন সমালোচকই স্বীকার করবেন। এঁদের ভেতর পার্থক্য হলো শুধু দৃষ্টিভঙ্গির। কেউ হয়ত নিছক শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা শিল্পপ্রকরণটি পর্যবেক্ষণ করেছেন, কেউ বা তার সঙ্গে ব্যক্তিগত মতাদর্শ যোগ করেছেন। এই প্রয়োগবিভিন্নতার জন্যে-যে আলোচনা বৈচিত্র্য লাভ করেছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এই ইতিহাসকারদের ভেতর ঐক্য রয়েছে: তা হলো

উপন্যাস রচনায় মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে ঔদাসীন্য। এই মনোভাব দুভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর একদিকে রয়েছে দায়সারা-গোছের আলোচনা—যাতে অমনোযোগও দুর্লক্ষ্য নয়; অন্যদিকে সার্বিক অস্বীকৃতি।

সুকুমার সেনের লেখাতে এই অমনোযোগের ছাপ বেশ স্পষ্ট। তিনি মুসলমানদের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একস্থলে বলেছেন,

"মুসলমান সংসারের চিত্রঘটিত উপন্যাস লেখায় দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন 'মতিচূর'এর (১৯০৭) লেখিকা মিসেস আর. এস. হোসেন, 'অপরিচিতা'র লেখক মনির হোসেন, 'গরীবের মেয়ে'র লেখক নজিবর রহমান।

'মীর পরিবার'এর (১৯১৭) ও 'নদীবক্ষে'র লেখক কাজী আবদুল [ওদুদ] (জন্ম ১৮৯৭), 'রূপের নেশা'র লেখক গোলাম মোস্তফা (জন্ম ১৮৯৭) 'আবদুল্লাহ' এর লেখক কাজী ইমদাদুল হক, 'কাঁটা ফুলে'র লেখক শাহাদাৎ হোসেন—ইহারাও অল্পবিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।"[১] এর ভেতর বেগম রোকেয়ার 'মতিচূর' (উভয় খণ্ড) উপন্যাস না হওয়া সত্ত্বেও[২] তাকে উপন্যাসের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগের' উল্লেখ পর্যন্ত নেই। সম্ভবত 'মতিচূর' তিনি দেখেননি। কাজী আবদুল ওদুদের 'মীর পরিবার'ও উপন্যাস নয়। নজরুলের উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর পরিবেশিত তথ্যও ভুল। সুকুমার সেন নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্যসরস্বতীর উপন্যাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রায় তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত[৩] তাঁর আলোচনা সরস ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু নূরন্নেছা খাতুনের উল্লেখযোগ্যতা অনেক মুসলিম ঔপন্যাসিকের[৪] চেয়ে কম। অথচ বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের কোন রচনাই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এর কারণ সম্ভবতঃ অন্যান্য উপন্যাস তাঁর চোখে পড়েনি।

অবশ্য এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান অবদান সম্পর্কে তিনি যতটুকু খবরাখবর পরিবেশন করেছেন আর কেউ তাঁর ক্ষুদ্রাংশও পারেনি।

মনোমোহন ঘোষ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ১৯২০ থেকে ১৯৪০ এর লেখকদের আলোচনায় কাজী নজরুল ইসলামের নাম করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি[৫] অথচ নজরুলের সবকয়টি উপন্যাসই তাঁর আলোচিত সময়সীমায় লিখিত ও প্রকাশিত। উপন্যাসশিল্পে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসেও[৬] কোন আলোচনা সংযোজিত হয়নি। তবে ভূদেব চৌধুরী মীর মশাররফ হোসেনের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু 'রত্নবতী' উপন্যাসের নাম 'রত্নাবতী' লেখাতে মনে হয় কোন ভুল সূত্র থেকে তিনি নামটি নিয়েছেন।[৭]

উপন্যাসের ইতিহাসের ভেতর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', (১৩৪৫) অচ্যুত গোস্বামীর 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' (১৩৬৪), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৩৬৮) এ নানাভাবে এই শিল্পরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে, কিন্তু মুসলিম প্রসঙ্গ কোথ ও নেই।

অবশ্য বাংলাদেশের সমালোচকেরা মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বেশ আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনার ভেতর মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৭), কাজী আবদুল মান্নানের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (১৯৬১), আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪) ইতিহাস বা ইতিহাসমূলক। এসব গ্রন্থে সার্বিক মুসলিম অবদানের পরিচয় রয়েছে বটে, কিন্তু উপন্যাসশিল্প তেমন গুরুত্ব পায়নি। মুসলিমরচিত বাংলা উপন্যাস নিয়ে লিখিত একমাত্র

গ্রন্থ হলো আবুল হাসানাতের 'মুসলিম রচিত উপন্যাস' (১৯৭০)। লেখক একটি বিস্তৃত পরিধি চয়ন করেছেন বটে, কিন্তু খুব কম উপন্যাসই তাঁর আলোচনায় ধরা পড়েছে। রাজিয়া সুলতানা 'কথাশিল্পি নজরুল' (১৯৭৫)-এর শেষে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত লিখিত বা প্রকাশিত মুসলিমরচিত উপন্যাসের একখানা কালানুক্রমিক তালিকা প্রদান করেছেন। তাতে বহু উপন্যাসের নাম যেমন বাদ গেছে, তেমনি বহু ভিন্নধর্মী রচনাকেও উপন্যাসের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবু এটি সর্বাধিক তথ্যবহুল তালিকা। এছাড়া প্রবন্ধের মাধ্যমেও মুসলমান লেখকদের রচনা বা কোন বিশেষ লেখক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও কেউ কেউ মুসলিমরচিত উপন্যাসের উপর আলোকপাত করেছেন। এসব আলোচনার ভেতর মুনীর চৌধুরীর 'মীর মানস' (১৯৬৫) এ মীর মশাররফ হোসেনের উপন্যাস সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় [৮] বাকি রচনাগুলো প্রায়ই গতানুগতিক।

মোটকথা উভয় বাঙলায় লিখিত সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিমরচিত উপন্যাস অবহেলিত হয়েছে বলেই এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যদিও আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্যকে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাগ করা উচিত নয়, তথাপি এসব সৃষ্টিকর্মকে অবলুপ্তির গহ্বর থেকে উদ্ধার করার অনুপ্রেরণাতেই আমি একাজে হাত দিয়েছি। তাছাড়া এসব উপন্যাস সমকালীন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ চিত্র বহন করছে। বাঙলাদেশের সমাজজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস জানার জন্যেও এসব উপন্যাসের স্বাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য।

দুই

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' (১৮৬৯)-কেই বাঙালী মুসলমান রচিত প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দান করেছেন। আমি

'রত্নবতী'কে উপন্যাস বলে মনে করি না—তার কারণ পরে বিশ্লেষিত হয়েছে। আমি মনে করি মীর মশাররফ হোসেনের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু'ই (১৮৮৫ ১৮৯১) বাঙালী মুসলমান-রচিত প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য হতে পারে। এই পথ ধরে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমরা আরো পঁচাত্তর জন মুসলমান ঔপন্যাসিক এবং তাঁদের রচিত প্রায় দেড়শ উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাই। কাজী নজরুল ইসলামের রচনা (১৯৩০) দিয়ে বাঙালী মুসলমান রচিত উপন্যাসের ধারার প্রথম পর্বের সমাপ্তি বলে গণ্য করা যায়। এই হিসেবে বর্তমান গবেষণাগ্রন্থে আমি ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমান-রচিত উপন্যাস আলোচনা করেছি। যেসব উপন্যাস ১৯৩০ এর মধ্যে লিখিত বলে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও, তা আমার বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ সাল—এই পঁয়তাল্লিশ বছর আমাদের সামগ্রিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাল। ১৮৮৫তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণের প্রকাশ। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বীজও এই সময়ের মধ্যে রোপিত হয়। সুতরাং কি উপন্যাসের বিচারে, কি রাষ্ট্রিক জীবনপ্রবাহের বিশিষ্ট প্রকাশে এই কালকে খণ্ডিত করে দেখার যুক্তি রয়েছে। এই কারণেই আমি এই কালসীমা গ্রহণ করেছি।

মুসলমানরচিত বাঙলা উপন্যাসের এই আলোচনায় আমি আশা করি, সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছি। সেই সঙ্গে একথা বলাও প্রয়োজন যে, বর্তমান আলোচনায় আমি এসব উপন্যাসের শিল্পরূপ বিশ্লেষণে তেমন প্রবৃত্ত হইনি। তার একটি কারণ এই যে, সমকালীন বাঙলা উপন্যাসের শিল্পরূপের মাপকাঠিতে এসব উপন্যাসে কোন অভিনবত্ব

লক্ষ্য করা যায় না। বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে বাঙলা উপন্যাসে বিধৃত সমাজচিত্র আমার কাছে বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। সমকালীন জীবনধারার—আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তা, বিশ্বাস-বিরোধের—যে চিত্র এতে আছে তা বাঙালী মুসলমান সমাজের একটি পর্বের নির্ভরযোগ্য দলিল বলে বিবেচিত হতে পারে। এই কারণে আমার আলোচনায় প্রধানতঃ উপন্যাসের এই সমাজচিত্র গুরুত্ব লাভ করেছে।

গবেষণাগ্রন্থটি মূলতঃ চারভাগে বিভক্ত: (ক) রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, (খ) বাঙলা উপন্যাসের ধারা ও মুসলিমপ্রয়াস, (গ) মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাস, এবং (ঘ) মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে জীবনবোধ।

(ক) প্রথম অধ্যায়ে ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ এই কালসীমার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পর্বে যতদূর সম্ভব এই কালের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ১৮৮৫ সাল থেকে আমাদের পর্যালোচনা শুরু হলেও মুসলিম-মানস বিশ্লেষণ করার জন্যে আমাদের আরো পেছনে যেতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অন্ততঃ মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো এবং সিপাহী বিপ্লব বিশ্লেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ পরবর্তীকালে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর যে রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তার পেছনে এই সময়টির প্রভাব খুবই স্পষ্ট—যা মূলতঃ আলিগড় আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আত্মপ্রকাশ করে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তার বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল। আমার ধারণা, পূর্ববর্তী পদক্ষেপ যথাযথ বিশ্লেষিত না হলে পরের ঘটনাক্রম উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয়। তবে এই পর্বে মূলতঃ আমি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে আন্দোলনপ্রবাহ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত

হয়, তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। এর ভেতর সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর ঘটনা হলো বঙ্গভঙ্গ এবং তার বিরুদ্ধে উত্থিত ব্যাপক আন্দোলন। আমি মনে করি পরবর্তী আন্দোলনধারায় এই ঘটনার প্রভাব গভীর। সেকারণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নানাদিক বিশ্লেষিত হয়েছে।

একই কথা সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেকারণে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারগুলো বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। এই বিশ্লেষণে গুরুত্ব পেয়েছে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহবিরোধী আন্দোলন, রাজা রাধাকান্ত দেব, ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে ব্যাপক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

সাংস্কৃতিক পটভূমিকার একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে মুসলিম-শিক্ষা প্রসঙ্গ। শিক্ষার বিষয়টি সামাজিক অধ্যায়েও আলোচনা করা যেতো। কিন্তু আমার ধারণা, মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় তার সাংস্কৃতিক জীবনেই সর্বাধিক আলোড়ন সূচিত হয়েছে। উপরন্তু পরবর্তীকালে মাতৃভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে বিতর্কের সূচনা হয় তাও এই শিক্ষানুভূতির ফল। এই সাহিত্যচর্চা রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চাইতে বেশি প্রভাবিত করে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনকে। তদুপরি ব্যক্তির যে সাংস্কৃতিক বিকাশ বহুলাংশে সমাজকে প্রভাবিত করে তা উৎসারিত হয় শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। উল্লিখিত কারণে এই পর্বেও আমি ধারাবাহিকতার জন্যে পেছন থেকে আলোচনা শুরু করেছি।

(খ) এই অধ্যায়ের একদিকে রয়েছে বাঙলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, অন্যদিকে উপন্যাসে মুসলমানদের আদি কর্মপ্রয়াস। এই অধ্যায়ের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। কারণ

এযাবৎ উপন্যাসের যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাতে উপন্যাস সম্পর্কে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে যে, এই অধ্যায়ে আমাকে মূলতঃ তার পুনরাবৃত্তিই করতে হবে। সেকারণে আমি তার ধারাটি ধরে সে ধারার সাথে মুসলিম প্রয়াসকে যুক্ত করে দিয়েছি মাত্র। আমার বিশ্বাস, এতে মূল ধারাটিও অক্ষুণ্ণ থাকলো, গবেষণাপত্রের অযথা কলেবরও বৃদ্ধি পেলো না।

(গ) এটিই আমার গবেষণার মুল অংশ। এই অধ্যায়ে ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ সালের ভেতর লিখিত বা প্রকাশিত উপন্যাসগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব আলোচনাটিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে উপন্যাসগুলোতে বিস্তৃত পাঁচটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো, কাহিনীনির্মাণকৌশল, চরিত্রচিত্রণ-রীতি, এসব উপন্যাসে সমকালীন হিন্দু ঔপন্যাসিক প্রভাব, ভাষা, এবং সমাজচেতনাবোধ।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের ফলে আমরা যেসব শিল্পরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, এবং নানাপ্রকার পরীক্ষানীরিক্ষা চালিয়েছি, তার ভেতর একটা হলো উপন্যাস। কিন্তু সেই পরীক্ষা-নীরিক্ষা এসব উপন্যাসে তেমন প্রতিফলিত হয়েছিলো বলে মনে হয় না। কারণ মুসলিম ঔপন্যাসিকদের অনেকেই ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তবে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁদের উপন্যাসেও সেই পরিচয়ের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। প্রথম পক্ষ সম্পর্কে কোন মন্তব্যের অবকাশ না থাকলেও দ্বিতীয় পক্ষের ভেতর এই অনুপস্থিতির কারণ বুঝা বেশ মুশকিল। তবু আমার ধারণা, বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করার জন্যেই বোধ হয় তাঁরা এই জটিল পরীক্ষানীরিক্ষা পরিত্যাগ করেছেন। একমাত্র কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী ইমদাদুল হক-এর আংশিক সফলতা ছাড়া আর সব লেখকের মধ্যেই পাশ্চাত্যরীতি অনুপস্থিত

বলে মনে হয়। এসব লেখক উপন্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের। দুয়েকজনের ভেতর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাব দেখা গেলেও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই নবনব পরীক্ষানীরিক্ষার ছাপ এসব উপন্যাসে দুর্লভ। সেকারণে আমি সর্বত্রই সাধারণ অনুভূতি দিয়ে এসব উপন্যাস পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সেভাবে বিশ্লেষণ করেছি, অযথা দর্শনের জটিল তত্ত্ব প্রয়োগ করিনি।

আলোচনাটি মোট দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পাঁচজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৭), মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯২৩)। আমি মনে করি, মুসলিম ঔপন্যাসিকদের ভেতর উল্লিখিত পাঁচজনের বিশেষ স্থান রয়েছে। সে কারণেই এই বিভক্তিকরণ। দ্বিতীয় ভাগে অবশিষ্ট লেখকবৃন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো, ঐতিহাসিক, সামাজিক, লোককাহিনীনির্ভর, ও প্রতিক্রিয়াজাত। দুটো উপন্যাসকে[৯] এই বিভাগের বাইরে রাখতে হয়েছে। কারণ, রূপবিচারে সেগুলো একটুখানি আলাদা।

(ঘ) এই অধ্যায়ে মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে জীবনের নানাপ্রকার সমস্যার প্রতিফলন দেখানো হয়েছে। যাতে তাবৎ সমস্যা সন্নিবেশিত করা যায়, সেজন্যে সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সঙ্গে ধর্ম ও ইতিহাসকে যুক্ত করা যেতো। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই তা করিনি। কারণ এই উপমহাদেশের জনসাধারণের ভেতর ধর্ম নানাভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে

ধর্মকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে নানাপ্রকার জটিলতা। সেই জটিলতা যাতে পাঠকের সামনে চক্ষুগ্রাহ্য হয় সেজন্যে এই ধর্মানুভূতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়েছে। ইতিহাসকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করে মুসলিম জীবনে তার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এক ভাগে রয়েছে অতীতের ইতিহাস, অন্যভাগে মুসলিম-মানসে সমকালীন রাজনীতির প্রভাব।

এই অধ্যায়ে আমি কোন প্রকার সমস্যাই বিশ্লেষণ করিনি। কারণ, প্রথম পরিচ্ছেদেই তা করা হয়েছে। এখানে শুধু সমস্যাগুলো তুলে ধরেছি এবং যে ব্যক্তি বা উপন্যাসকে কেন্দ্র করে সমস্যাটি আত্মপ্রকাশ করেছে তার নাম উল্লেখ করেছি। এজাতীয় ব্যাখ্যা লেখকের মানসিকতার প্রতি কটাক্ষপাতের মতো মনে হতে পারে বলেই আমি তা পরিহার করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

॥ এক ॥

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকে এদেশে মুসলিম শাসনের অবসান ধরে নিলেও মীরকাশিমই সম্ভবতঃ সর্বশেষ প্রতিরোধী। "দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে মীর কাশিমের এই সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় ঐতিহ্য।"[১] তবু সার্বিকভাবে মুসলমানদের অধঃপতনের সূচনা হয় ১৭৯৩ খ্রী রচিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে হিন্দুদের প্রাধান্য বেড়ে যায় বলে মুসলমানেরা জমিদারী হারাতে থাকেন।[২] তবে শাসনক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য সূচিত হয়েছে তারও আগে—মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকে।[৩] এরপর নবাব আলিবর্দি খাঁ আপন উত্তরাধিকারীকে মুসলিম আইনসম্মত অংশীদার-দের সম্ভাব্য উৎপাত থেকে রক্ষা করার জন্যেও শাসনব্যবস্থার উচ্চ-পদে হিন্দু আমলা নিয়োগ করেন।[৪] হিন্দু আমলাদের দ্বারা কতজন মুসলমান জমিদার সম্পত্তিচ্যুত হয়েছিলেন, বা নিজেদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় কতজন জমিদারী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন[৫] তার সঠিক হিসাবে না গেলেও মোটামুটি এই অবস্থাটা অনুমান করা যায়। ১৭৯৩ খ্রীঃ পর সমগ্র বাঙলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান দুটো আলাদা শ্রেণীতে—জমিদার ও প্রজা—বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ এটাই। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সূচনা আরো বহু পরের কথা। কারণ এত সচেতনতা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের ভেতর সম্প্রীতি তখনো ব্যাহত হয়নি।[৬]

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো শেষপর্যন্ত এই শ্রেণীচেতনার ভিত্তিতেই একীভূত হয়। ইংরেজরা

হয়তো এজাতীয় আন্দোলনের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়নি। তাই বার বার তারা এদেশের মানুষকে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। এ কারণেই হয়তো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভিত্তি স্থাপনের জন্যে তারা টিপু সুলতানের পতনের স্মরণীয় দিনটিকে বেছে নিয়েছে।[৭] ইংরেজের এই প্রচারণা এই দেশে কি পরিমাণ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তার প্রমাণ নবাব সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র ব্যাখ্যা এবং তাঁর কথিত 'অন্ধকূপ-হত্যা' সংক্রান্ত ঘটনা। অনেকে এই হত্যাকাণ্ডকে যেমন অলীক বলে প্রমাণ করেছেন[৮], তেমনি অনেকে একে প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে, সত্য বলে মেনে নিয়েছেন[৯], আবার কেউবা যুক্তির সাহায্যে একে যুগধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১০] উপরন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোটা বিবেকী কাঠামোটাই এই অপব্যাখ্যার উপর দাঁড়িয়ে।

তবু মুসলিম-মানসে জাগরণের ঢেউ এসেছিলো—যা একদিন সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অভ্যুত্থান ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন নামে খ্যাত।

১৮১৮ খ্রীঃ থেকে বাঙলাদেশে ফরায়েজী অন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন মূলতঃ আরম্ভ হয় ধর্ম সংস্কারকে কেন্দ্র করে। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম ধর্মীয় জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে তা-ই এই আন্দোলনের প্রেরণামূল। আরবী 'ফরায়েজ' শব্দ থেকে এই আন্দোলনের নাম 'ফরায়েজী' হয়েছে। 'ফরায়েজ' আরবী 'ফরজ' শব্দের বহুবচন।[১১] ফরজ হচ্ছে আল্লার অবশ্যপালনীয় নির্দেশ। মুসলমানদের ধর্মের অবশ্যপালনীয় বিধান-সমূহের প্রতি আনুগত্য দাবিই এই আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য। হাজি শরিয়তউল্লাহ (১৭৮১ ১৮৪০) এই আন্দোলনের উদ্গাতা। তিনি ফরিদপুরের বিস্তৃত অঞ্চলের জনসাধারণকে এই আন্দোলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। এই কারণে এটিকে 'সংস্কার আন্দোলন'

(রিফর্ম মুভম্যাণ্ট) আখ্যাদান[১২] যুক্তিসঙ্গত।

সাধারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হিন্দু জমিদারেরা প্রজাসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন পূজা-পার্বণের জন্যে চাঁদা আদায় করতেন। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের ধর্মকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে হাজি শরিয়তউল্লাহ হিন্দু জমিদারদের পূজা-পার্বণে চাঁদা দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ধর্মীয় অধিকারবলে প্রকাশ্য স্থানে গো-কোরবানী প্রদান করেন। ফলে তিনি এবং তাঁর দল জমিদারের রোষানলে পতিত হন। অতএব এই সংঘর্ষই গোটা আন্দোলনটিকে একটি ব্যাপক জমিদারবিরোধী অন্দোলনে রূপান্তরিত করে।

হাজি শরিয়তউল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোহসেনউদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের তিনটি ধারা লক্ষ্যণীয়। (ক) জমিদার নীলকরদের অন্যায় জুলুম প্রতিরোধ করা[১৩], (খ) হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলমানদের ভেতর প্রাদুর্ভূত উচ্চ-নীচ (আশরাফ-আতরাফ) ভেদাভেদ অস্বীকার করে সামাজিক বৈষম্য দূর করা[১৪] (গ) যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, সেহেতু জমির উপর তাঁর বান্দার (চাষী) অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।[১৫] এই দাবিগুলো আদায় করতে গিয়ে ফরায়েজীদের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি একটি সুশৃঙ্খল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণ করেন—যা 'ফরায়েজী খেলাফৎ' নামে পরিচিত।[১৬] দুদু মিয়া অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন—যা স্থানীয় শাসকদেরও ভাবিয়ে তোলে। এই ব্যবস্থা কি পরিমাণ নিখুঁতভাবে পরিচালিত হতো তার খানিকটা পরিচয় রয়েছে ফরায়েজীদের জন্যে গঠিত বিচারবিভাগীয় প্রতিবেদনে।[১৭]

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল গফুর ওরফে

নোয়া মিয়াঁ (১৮৫২-১৮৮৩) ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সফলতার সঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই অঞ্চলে তাঁর প্রভাব এতদূর বিস্তৃত ছিলো যে, "নোয়ামিয়ার মুখের কথা তাহাদের কাছে বেদ।...এ অঞ্চলে নোয়া মিয়া ইংরেজ রাজ্যের উপর একপ্রকার আপনার রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিল।"[১৮] তবে নোয়া মিয়াঁ শেষ জীবনে ধর্মীয় সংস্কারেই অধিক মনোযোগী হন। মাওলানা কেরামত আলি জৈনপুরীর সঙ্গে জুমার নামাজ নিয়ে বিতর্ক এর পরিণতি। নবীনচন্দ্র সেন এই বিতর্ককে 'জুম্মার যুদ্ধ' নামে আখ্যায়িত করেছেন[১৯]

নোয়া মিয়াঁর পর থেকে ফরায়েজী আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়। মোহসেনউদ্দীন দুদু মিয়াঁর নেতৃত্বকালকেই (১৮৪০-৪৭) এই আন্দোলনের 'স্বর্ণযুগ' আখ্যায়িত করা যায়। কারণ তাঁর আমলেই বিভিন্নপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হওয়ায় এর একটা সুস্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে।[২০] জনৈক ঐতিহাসিক "ফরায়েজী প্রজা আন্দোলনের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক ছিল না" বলে দাবি করেছেন।[২১] কথাটা এই আন্দোলনের প্রথম দিক সম্পর্কে সত্য হলেও পরে এই অবস্থা ছিলো না।

ফরায়েজী আন্দোলনের সময়ই সর্বভারতীয় পর্যায়ে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনের আদিগুরু ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩)। "ইসলামের নীতি ও বিধান-গুলিকে যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা" করাই তাঁর এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য[২২] এজন্যে তিনি "মুসলমানের রক্ষণশীল মধ্যযুগীয় মনোভাবকে বহুক্ষেত্রেই বিপ্লবীর সাহস নিয়ে আঘাত করেছেন।"[২৩] শাহ ওয়ালিউল্লার পুত্র শাহ আবদুল আযীয (১৭৪৬ ১৮২৪) এই মতধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। শাহ আবদুল আযীযই প্রথম ভারতবর্ষকে 'দারুল হর্‌ব' বা শত্রুর দেশ বলে ফতোয়া প্রদান করেন।[২৪] শাহ আবদুল আযীয উদার প্রকৃতির

লোক ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'ঈশ্বরাণুপ্রাণিত' পুরুষ বলে মনে করতেন।[২৫] শুধু তাই নয়, তিনি ইংরেজি শিক্ষা সমর্থন করে ফতোয়াও প্রদান করেছিলেন।[২৬] ওয়াহাবী বিদ্রোহী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) ছিলেন তাঁরই শিষ্য। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর গুণে মুগ্ধ হয়ে শাহ আবদুল আযীযের পুত্র শাহ আবদুল হাই এবং তাঁর জামাতা শাহ ইসমাইল দেহলভী (১৭৮২-১৮৩১) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফলে চারিদিকে সৈয়দ আহমদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্মসংস্কারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওয়াহাবীরা একটি সংগঠন সৃষ্টি করেন—যাকে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী 'তরিকা-ই-মোহাম্মদীয়া' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭] ১৮১৮ খ্রীঃ এই আন্দোলনের সূচনা হয়। তখন পশ্চিম ভারতে শিখদের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। এই প্রভাব খর্ব করার জন্যে সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। শিখদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষে জয়ী হয়ে তিনি ১৮২৭ খ্রীঃ 'ইমাম' রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং এই অঞ্চলে তাঁর নামে খুৎবা পাঠ চালু করেন।[২৮] এই উপলক্ষ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে ওয়াহাবীরা যে কর্মতৎপরতা আরম্ভ করেছিলেন তা সীমিতভাবে হলেও তাঁদের জয়ের মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলো। ১৮৩১ খ্রীঃ বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য বিলায়েৎ আলি ও ইনায়েৎ আলি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এতদিন এই আন্দোলন শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিলো। কিন্তু ১৮৪৭ খ্রীঃ বৃটিশ কর্তৃক পাঞ্জাব হস্তগত করার পর ওয়াহাবীদের এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করা হয়। "তখন থেকে ওয়াহাবী আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ ধারণ করে"[২৯] এই আন্দোলন ১৮৭১ খ্রীঃ প্রদমিত হয়। সিপাহী বিপ্লব সম্পর্কে সাংগঠনিকভাবে ওয়াহাবীদের কোন ধারণা না থাকলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁরা এই বিপ্লবেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ওয়াহাবী আন্দোলন আধুনিক ভারতের প্রথম অর্থনৈতিক আন্দোলন[৩০] —যেখান থেকে ভারতে কৃষক আন্দোলনের সূচনা।[৩১] অথচ তাকে ইংরেজ এবং তার সহযোগীরা বিভিন্নরূপে চিত্রিত করেছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার এই আন্দোলনের নেতারা যেমন বহিরাগত নন, তেমনি "কোনও রাজা বা রাজপুরুষের স্বার্থে বা নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়নি।"[৩২] প্রথম দিকে স্যার সৈয়দ আহমদ খানও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৩৩] তবু ওয়াহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হলো তার নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর ধর্মান্ধ অভিব্যক্তি এবং উপজাতীয়দের ভেতর প্রচলিত নিয়মকানুনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যে।[৩৪] তিনি নিজেকে 'খলিফা' হিসেবে দাবি করে[৩৫] দেশে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ফলে উপজাতীয় বিদ্রোহীরা পুনর্বিদ্রোহ করে এবং বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ওয়াহাবীদের আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করে।[৩৬] নচেৎ সরকার প্রথম দিকে ওয়াহাবীদের সম্পর্কে যেরূপ নির্লিপ্ত ও অজ্ঞ ছিলো[৩৭] তাতে এই আন্দোলন আরো জোরদার হতে পারতো।

ওয়াহাবী আন্দোলনের আরেকটি রূপ বাঙলাদেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো মীর নেসার আলির (১৭৮২-১৮৩১) নেতৃত্বে। ইতিহাসে নেসার আলি তিতুমীর নামে প্রসিদ্ধ তিতুমীর প্রচুর লেখাপড়া করলেও প্রথমদিকে একজন গুরুর অভাবে মানসিক অস্বস্তির ভেতর ছিলেন। এই অবস্থায় ১৮২২ খ্রীঃ মক্কাশরিফে তাঁর সঙ্গে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি ব্রেলভীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৮২৭ খ্রীঃ থেকে তিতুমীর তাঁর সংস্কার আন্দোলন সূচনা করেন। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিলো ইসলামের পুরনো দিনের গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনা এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তার যে অবক্ষয় সূচিত হয়েছে তা প্রতিরোধ করা।[৩৮] এক্ষেত্রে তাঁকেও

ফরায়েজীদের মতো অমূলক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য তিতুমীর ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে কিছু কিছু মানবতাবাদী ও অর্থ নৈতিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। যেমন তাঁর নির্দেশের ভেতর একটা ছিলো "হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার দমন করা।"[৩৯] একারণে বাধাটাও ছিলো প্রত্যক্ষ। এই বাধার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন পুঁড়ার জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায়। তিনি তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ, দাঁড়ি রাখা, মসজিদ প্রস্তুত করা এবং মুসলমানী মতে নাম রাখার বিরুদ্ধে বিভিন্ন হারে ট্যাক্স ধার্য করলেন। এছাড়া আরো বিধান জারি করা হলো যে, যারা গো-কোরবানী দেবে তাদের হাত কেটে ফেলা হবে।[৪০] অতএব "তিতুমীরের 'ধর্মসংস্কারের' কাজ জমিদারের কাছে বাধা পেয়ে অত্যাচারী জমিদার, সুদখোর মহাজন ও কালান্তক নীলকরবিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়।"[৪১]

এই সংগ্রামে তিতুমীর প্রথমদিকে গঠনমূলক পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিতে তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সেই পথ শেষপর্যন্ত একটা ব্যাপক দাঙ্গার সূচনা করে।[৪২] তখন দেশে ইংরেজের আইন-আদালত চালু হয়েছে। তিতুমীর জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে থানায় বিচার প্রার্থনা করলেন।[৪৩] কিন্তু রামরাম চক্রবর্তী নামে জনৈক "দারোগার জমিদারের কাছে ঘুষ"[৪৪] খাওয়ার ফলে তিতুমীর কোন বিচার পেলেন না। অতপর তিনি দারোগার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। কিন্তু দারোগার কারসাজিতে কোর্টের সুবিচার থেকেও বঞ্চিত হলেন।[৪৫] এই অবস্থায় জমিদার, তিতুমীরের সমর্থকদের উপর আরো জোরজুলুম শুরু করে দিলেন।[৪৬] অতপর সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে তিতুমীর নিজেই এর প্রতিকারের সংকল্প গ্রহণ করলেন।[৪৭] এরপর বিক্ষুব্ধ ওয়াহাবীরা পুঁড়া গ্রামে প্রবেশ করেন এবং একটি গরু হত্যা করে তার রক্তে মন্দিরের দেওয়াল রঞ্জিত করে

দেন। তাঁরা ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে এবং মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়েছে।[৪৮] এভাবে সংঘর্ষটি ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। এবার "শুধু জমিদার, মহাজন আর নীলকরের বিরুদ্ধেই নয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধেও তিনি লড়ায়ে নামেন।"[৪৯] নারকেলবেড়িয়ায় তাঁর সেনাবাহিনীর অন্যতম নেতা শেখ গোলাম মাসুম বাঁশের কেল্লা তৈরি করে সম্মিলিত জমিদার-মহাজন-নীলকর ও ইংরেজ শক্তির মোকাবেলা করেন। এই অসমযুদ্ধে কয়েকজন অনুচরসহ তিতুমীর নিহত হন এবং শেখ গোলাম মাসুমের ফাঁসি হয়।

তিতুমীর একজন অসমসাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর ভেতর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী বা তাঁর পরবর্তী অনুচরদের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি ইংরেজের রাষ্ট্রীয় ও শাসন-বিভাগীয় কাঠামো স্বীকার করেই আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৫০] তিনি ছিলের প্রথম বাঙালী যিনি সীমিত পরিসরে হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আওয়াজ তুলেছিলেন। যেহেতু তিনি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে তাবৎ অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেহেতু তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনে "প্রথম বাঙালী শহীদের গৌরব" প্রদান করা যায়।[৫১]

ভারতে যখন মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের রূপ ধরে ব্যাপক গণযুদ্ধ সংগঠিত হচ্ছিলো, তখন হিন্দু-সমাজেও সংস্কারের জোয়ার এসেছে। এই সময়ে এই দুটো পরস্পরবিরোধী সংস্কারপ্রয়াস দুটো সম্প্রদায়ের মানসধর্মের ভেতর মৌলিক পার্থক্য সূচিত করছে। "এই পার্থক্যকে মোটামুটিভাবে শ্রেণীগত পার্থক্যই বলা চলে। কারণ হিন্দুধর্মের সংস্কার আন্দোলন ছিলো মূলত মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন। মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলন ছিলো মূলতঃ কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন।"[৫২] একারণে জনৈক ঐতিহাসিক একে মুসলমানদের একটা "গণ-

আন্দোলন" রূপে আখ্যায়িত করেছেন[৫৩]

এই ধারার বিদ্রোহী মুসলমানদের দ্বারা কোথাও কোথাও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিলো। ১৮৭১ খ্রীঃ ২০ সেপ্টেম্বর আবদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি নর্মানকে হত্যা করেন[৫৪] কলকাতা টাউন হলের সামনে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। শের আলি নামে জনৈক আন্দামানে নির্বাসিত কয়েদী আন্দামান সফররত ভাইসরয় লর্ড মেয়োকে হত্যা করেন।[৫৫] অতএব এতদ্দ্বারা একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, "ইহারাই বাঙলার প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং ইহাদের মধ্য হইতেই প্রথম রাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল"[৫৬] শুধু তাই নয় "ওহাবী মামলা সেদিনকার ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের স্বাধীনতা স্পৃহাকে প্রেরণা দেয়, হিন্দুর মনেও ইংরেজ বিরোধ বাড়িয়ে তোলে।"[৫৭]

বাঙলাদেশে এপর্যায়ে যেসব প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো শান্তিপুরে তাঁতিদের বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুর ও দিনাজপুরে কৃষক বিদ্রোহ, উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ[৫৮] ইত্যাদি।

॥ দুই ॥

ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার আগেই ভারতবর্ষে সিপাহী বিপ্লবের সূচনা হয়। যদিও হিন্দু-মুসলমান-শিখ সবাই এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তবু এতে মুসলমানদের ভূমিকাই ছিলো ব্যাপক ও বিস্তৃত।[৫৯] কারণ ইংরাজেরা মুসলমানদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছে,[৬০] অতএব ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানের বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক। এই বিপ্লবে মুসলমানদের ব্যাপক উপস্থিতির আরো একটা কারণ হলো, ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলিমমানসে যে

জাগরণ সুচিত হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া সম্ভাব্য সকল রাজনৈতিক স্তরেই বিন্যস্ত। ফলে স্বভাবতঃই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সহজে।

সিপাহী বিপ্লবের জন্যে প্রায় সব ঐতিহাসিকই রাইফেলের টোটায় নিষিদ্ধ পশুর চর্বি সংযোজন বা তার সম্ভাবনাকে দায়ী করেছেন [৬১] তবে এছাড়াও অন্য কারণ ছিলো। সিপাহীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অযোধ্যায় কর বৃদ্ধি, ছাঁটাই এসবের অন্তর্গত।[৬২] অনেকে এই বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত কারণসমূকে বাস্তব ও চক্ষুগ্রাহ্য করে তুলেছেন সমকালীন ঘটনাপরম্পরার ভেতর দিয়ে। কে কে আযীয বিভিন্ন ইংরেজ লেখকের মতামত উদ্ধৃত করে এর একটা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছেন—যার ভিত্তিমূলে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় অনৈক্য অনেকাংশে ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়।[৬৩] স্যার সৈয়দ আহমদ খান সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালে ব্যক্তিগত বিপদাপদের ঝুঁকি নিয়ে বৃটিশের প্রতি সমর্থন প্রদান করেছিলেন।[৬৪] কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে 'আসবাবে বাঘাওয়াতে হিন্দ' নামক গ্রন্থে এই বিপ্লবের অন্তর্নিহিত কারণসমূহের ভেতর ইংরেজের সার্বিক নির্লিপ্ততা ও অজ্ঞতাকেই বেশি দায়ী করেছেন [৬৫] তবে এ সম্পর্কে যত প্রকারের মতামতই প্রদান করা হোক না কেন বা একে যেভাবেই বিস্তৃত করা হোক না কেন, এর ভেতরকার উত্তপ্ত অবস্থাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে এই আন্দোলনের পেছনে ওয়াহাবীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অংশগ্রহণ এবং সিপাহীদের ভেতর চাপাতি বিলির কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে।[৬৬]

সিপাহী বিপ্লব সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিপ্লব এত ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ পরিগ্রহ করেছিলো যে, ভারতে বসবাসকারী ইংরেজেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।[৬৭] এই ভীতি বাংলাদেশের সংস্কারপ্রেরণাতেও যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছিলো।[৬৮] স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই বিদ্রোহের উভয় দিকই প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব

দেখে তিনি এত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন যে, কোন এক পর্যায়ে তিনি দেশত্যাগ করে মিশর চলে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন [৬৯]

বৃটিশ সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে সিপাহী বিপ্লব দমন করেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই দমননীতির প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন মুসলিম সমাজ। সিপাহীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে, বিচারের নামে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে, নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে।[৭০] ১৮৫৮ খ্রীঃ রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং বিভিন্নপ্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু ফলতঃ তাঁর পক্ষে কিছুই কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[৭১] মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিনিধি সম্রাট বাহাদুর শাহর দৌহিত্র ও দুই পুত্রকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়।[৭২] তিনি কিছুকাল আত্মগোপন করেছিলেন। পরে তাঁকে সুদূর রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। সম্রাট একজন কবি ছিলেন। তিনি কবিতার ভেতর তাঁর শেষ জীবনের সীমাহীন একাকিত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন।[৭৩] সম্রাটের এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। তিনি বৃটিশের চর ছিলেন বলে বাদশাহর প্রতি তাঁর কোন আনুগত্যই ছিলোনা।[৭৪] সিপাহী বিপ্লব প্রমাণ করলো, ইংরেজের এই সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে তাদের ঐক্য, তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নয়।[৭৫] ১৭৫৭ খ্রীঃ যেখানে কাজ করেছিলো তাদের ষড়যন্ত্র।[৭৬]

সিপাহী বিপ্লবের স্বরূপ নিয়ে অনেকে অনেক প্রকার মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ এই আন্দোলনকে সামন্তবাদী শক্তির পুনরুত্থানপ্রয়াস বলে আখ্যায়িত করেছেন—যার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম রাজশক্তির পুনরুদ্ভব সূচনার চেষ্টা হয়েছে।[৭৭] আধুনিক ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৭৮] তাঁদের মতে "বিদ্রোহটি সর্বশ্রেণীর, সর্বস্তরের মানুষের একটি জাতীয় অভ্যুত্থান।"[৭৯] অনেকের মতে

"ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এটিই সর্বপ্রথম গণবিদ্রোহ।"[৮০] এই মতামতগুলো আলোচনা করা যেতে পারে।

এই বিদ্রোহের পেছনে-যে সামন্তবাদী ও রাজতান্ত্রিক পুনরুত্থানের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কাজ করেনি এমন কথা বোধহয় বলা ঠিক হবে না। কারণ এই বিদ্রোহে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ইতঃপূর্বে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন—যা কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়েছিলো।[৮১] বিশেষতঃ মুসলিম-শিখ যুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে। যার ফলে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের ভেতর কখনো কখনো তাৎক্ষণিক নির্লিপ্ততাও দেখা গেছে। যেমন মুসলিম শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়েও শিখ যোদ্ধারা তাদের উদ্ধারের চেষ্টা না করে নিজেদের অভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।[৮২] এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের চারিদিকে সেসময় বিভিন্নপ্রকার বিদ্রোহ দেখা দিলেও সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনাবোধ তখনো গড়ে ওঠেনি।[৮৩] যেখানে জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠার কোন সুযোগই ঘটেনি, সেখানে এজাতীয় অভ্যুত্থানকে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা সত্যি দুরূহ। অবশ্য এসব ঘটনা থেকে এই আন্দোলনের সার্বিক চরিত্র সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্তে আসা যায়না। কারণ এই বিদ্রোহের পেছনে দলবদ্ধভাবে না হলেও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ভারতীয় গণ-আন্দোলনগুলো-যে কাজ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৮৪] বিশেষ করে ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শ্রেণীচেতনা এই বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য তখন এজাতীয় আন্দোলন-অভ্যুত্থানে সর্বস্তরের জনসাধারণের কোন ভূমিকা ছিলো না। ১৭৫৭ খ্রীঃ যেমন, ১৮৫৭ খ্রীঃও ঠিক তেমনি। নচেৎ ১৭৫৭ খ্রীঃ সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর লর্ড ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ নগরে প্রবেশের সময় যতলোক তামসগীর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা শুধু ঢিল ছুঁড়লেও নাকি ইংরেজেরা শেষ হয়ে যেত।[৮৫]

কিন্তু ওয়াহাবী বা ফরায়েজী আন্দোলনে-যে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ এই যে, এসব আন্দোলনে জনসাধারণ যেমন নিজেদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন, সিপাহী বিপ্লবে তেমনটি করেননি।

সিপাহী বিপ্লব যখন সংঘটিত হচ্ছে তখন বঙ্গদেশে পুনর্জাগরণের যুগ। এই সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ অনেকেই জীবিত ছিলেন। বঙ্গদেশে তখন অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন চলছে। বিধবা বিবাহ আন্দোলন তখন তুঙ্গে। অথচ এমন একটা ঘটনা সম্পর্কে এসব মনীষী "তেমন কোন কৌতূহল প্রদর্শন" করেননি।[৮৬] বরং এতবড় একটা ঘটনার পরও ইংরেজ সম্পর্কে বাঙালীর মোহভঙ্গ হয়নি। বাঙালীর এজাতীয় আচরণ বিপ্লবীরা ক্ষমা করেননি। "বেরিলিতে বাঙালীদের প্রতি সিপাহীদের ঘৃণা এত দুর্বার হয়ে উঠেছিল যে, অনেককে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। সেকালে ফরাক্কাবাদ বা কানপুরে ইংরেজদের মতই বাঙালী বাবুরা বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন"[৮৭] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময়ে সিমলায় যে অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর দিন কাটাচ্ছিলেন সেকথা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[৮৮] শুধু তাই নয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকেও এজন্যে পরবর্তীকালে আক্ষেপ করতে হয়েছিলো।[৮৯] তবু শ্লাঘার কথা এই যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ যখন ইংরেজের সঙ্গে মিতালীতে ব্যস্ত, তখন বাঙলাদেশের মাটি থেকেই (ব্যারাকপুর) এই বিপ্লবের সূচনা।

এই বিপ্লবের ফলে বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করতে পারে যে, অতপর এতবড় একটা সাম্রাজ্যের দায়িত্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। কারণ ইতিমধ্যেই কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভ ইংল্যাণ্ডে পুঞ্জীভূত হয়েছে—যার

আওতায় রবার্ট ক্লাইভ ও লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসও পড়েছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টের বিতর্ক সর্বজনবিদিত। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ ভারতের প্রতিক্রিয়াসূচক। অতএব ১৮৫৮ খ্রীঃ ১ নভেম্বর এক ঘোষণাবলে ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাত থেকে সরাসরি পার্লামেন্টের হাতে চলে গেলো এবং ভারতের জনসাধারণ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাকুলের অন্তর্গত হলেন। ভারতের সমস্যাবলী দেখাশুনার জন্যে একজন ভারত সচিব নিয়োগ করা হলো। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে পড়লো।

এই বিপ্লবের ফলে ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের ভেতর একটা আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি হলো। ফলে তাঁরা সর্বভারতীয় পর্যায়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। সিপাহী বিপ্লবের দিনে সর্বসাম্প্রদায়িক পদক্ষেপে ত্রুটিবিচ্যুতি যাই থাক না কেন, এই অনুভূতি তাঁদের গভীরভাবে নাড়া দিলো। ফলে ইংরেজের সামনে দুটো সমস্যা দেখা দিলো। প্রথমতঃ ইতঃপূর্বে যেসব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিলো তার প্রভাব তো রয়েছেই। দ্বিতীয়তঃ এই বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত-মানসে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লো। এই উভয়বিধ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্যে সরকারী উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম।[২০] পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানই ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পরিচর্যার মাধ্যমে পুষ্ট করেছে।

এই বিপ্লবের ফলে মুসলমানেরাও লাভবান হয়েছেন। এতদিন ইংরেজের ধারণা ছিলো, মুসলমানেরা সর্বাবস্থায় তাদের বিরোধী। এইরূপ ফকির-ফরায়েজী-ওয়াহাবী বিদ্রোহে যেমন দেখা গেছে, তেমনি সিপাহী বিদ্রোহেও দেখা গেলো। ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর দমননীতি চললো বেশি। এই অবস্থায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান তাঁর বিখ্যাত 'আসবাবে বাঘাওয়াতে হিন্দ'

নামক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। এই গ্রন্থে স্যার সৈয়দ সম্পূর্ণ বিদ্রোহ পর্যালোচনা করেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই বিদ্রোহের পেছনে ইংরেজের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, এই বিদ্রোহে মুসলমানদের কোন অস্বাভাবিক ভূমিকা ছিলো না। উপরন্তু তিনি মুসলিম-মানসের অবক্ষয় সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং তার জন্যে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনিহাকে দায়ী করেন। এজন্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে অনেকে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৩১] কারণ উভয়ে ইংরেজি শিক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, উভয়ে মাতৃভাষা চর্চা করেছেন এবং উভয়ে প্রথমদিকে ইংরেজি জানতেন না। বলা বাহুল্য, সরকারী পর্যায়ে এই গ্রন্থের প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হয়।[৩২] অতঃপর ইংরেজ উপলব্ধি করতে পারলো যে, মুসলমানদের এভাবে বিচ্ছিন্ন রেখে এদেশ শাসন করা যাবে না। অতএব তারা একদিকে বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করলো, অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করলো। আলিগড়ে মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠার এটাই হলো অন্যতম কারণ।

॥ তিন ॥

সর্বভারতীয় সিপাহী বিপ্লব স্তিমিত হলেও বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রে গণবিক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। ১৮৫৯ খ্রীঃ ব্যাপক আকারে 'নীল বিদ্রোহ' সংগঠিত হয়, ১৮৭৩ খ্রীঃ পাবনায় দেখা দেয় 'কৃষক বিদ্রোহ'। এইসব ইংরেজ সরকারের জন্যে অশুভ সঙ্কেত। সিপাহী বিপ্লবের আগে যেসব আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিলো তাকে যেভাবে চিত্রিত করা হোক না কেন, শ্রেণীচেতনা ছিলো সেসব আন্দোলনের মৌল প্রকৃতি। তবে হয়তো বিভিন্ন কারণে তাতে সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য ছিলো। ফকির বিদ্রোহ, ফরায়েজী-ওয়াহাবী আন্দোলনে যেমন মুসলিম প্রাধান্য ছিলো, তেমনি ছিলো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা সাঁওতাল বিদ্রোহে হিন্দু ও

উপজাতীয়দের প্রাধান্য। ইংরেজ উপলব্ধি করতে পেরেছে, এসব বিদ্রোহ দমনে যত নির্মমতা প্রদর্শন করা হোক না কেন, তাতে কোন লাভ নেই।

এতো গেলো সাধারণ লোকের কথা—যাঁরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া সামনে রেখে এসব আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। তখন বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে এবং তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব বেশ সরবে ঘোষণা করতে চাইছেন। হিন্দু মেলা, শিবাজী উৎসব এজাতীয় অভ্যুত্থানেরই বহিঃপ্রকাশ। যদিও এজাতীয় আন্দোলনের উদ্যোক্তারা ভারতবর্ষকে শুধু হিন্দুর দেশ মনে করতেন [৯৩], তবু এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত আবেগকে অস্বীকার করা যায় না। এই আবেগ গড়ে ওঠেছে স্বাজাত্য ও স্বাধীনতাবোধকে কেন্দ্র করে। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এই বোধ আরো গাঢ় হয়েছে। এই সময়কার লেখকেরা ইংরেজের প্রতি বিশেষ অনুগত হয়েও তাঁদের লেখায় সগৌরবে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন এবং বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে নিজেদের সত্যিকার মনোভাব উচিয়ে ধরেছেন।

ইংরেজের জন্যে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের চাইতেও বড় হলো তাদের স্বার্থ। হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে যাই করুক না কেন, তা তাদের জন্যে সমস্যা নয়। সমস্যা হলো বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে বা বিপক্ষে তারা কি করছে। এই স্বার্থপ্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান এ্যাসেসিয়েশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্ম। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের তেমন গণভিত্তি ছিলো না। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের ভেতরকার উদ্দেশ্যকে গোপন রাখতে পারেনি বা চেষ্টা করেনি। অতএব সরকারের স্বার্থে সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সিভিলিয়ন স্যার অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউমের (১৮২৯-১৯১২) উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রীঃ তদানিন্তন "বড়লাটের শুভ আশির্বাদ নিয়ে কংগ্রেস

মহাসভার বোধন" হলো।[১৪] অথচ এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে "রাজভক্তি ও রাজানুগত্যের কথা প্রচুর থাকিলেও ভারতের আর্থিক রাজনৈতিক বহু সমস্যা নিবারণকরনার্থে প্রস্তাব বেশ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছিল।"[১৫]

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে মুসলমানদের মধ্যেও দুয়েকখানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিলো। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। এর ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৫৬), নওয়াব আবদুল লতিফের মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি (১৮৬৬), সেণ্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৮)। এসব প্রতিষ্ঠান মূলতঃ তাঁদের কার্য-কলাপ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলো।

যে উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন জাতীয় কংগ্রেসই প্রথম জনসাধারণের রাজনৈতিক মতামত সরকারের সামনে তুলে ধরে। এ কারণে ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকার বিরূপ হয়ে ওঠে।[১৬] প্রতিষ্ঠার পর থেকেই-যে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মুসলমানদের উৎসাহ বাড়ছিলো একথা মুসলমান লেখকরাই স্বীকার করেছেন।[১৭] অবশ্য এসব অধিবেশনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙালী মুসলমানদের প্রতিনিধি কম ছিলো। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের উপস্থিতি ক্ষীণ হতে থাকে।[১৮] এর মূল কারণ হলো সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্যের প্রতি তাঁদের প্রবল ঝোঁক—যার গভীরে বাঙালীবিরোধী প্রচারণা বিশেষ ভাবে কাজ করেছে।

যে সময় জাতীয় কংগ্রেস ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে বৃটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে সময় উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৫ ১৮৯৮)নেতৃত্বে মুসলমানদের পুনর্জাগরণ সূচিত হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এতদিন মুসলমানেরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে

মূলতঃ নিজেদেরই বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। এখন যে কোন মূল্যে হোক ইংরেজের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতার জন্যে তিনি মুসলমানদের আহ্বান জানালেন। তিনি বৃটিশ শাসনকে "দেশবাসী ভাইদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার পক্ষে বরকতস্বরূপ" মনে করতেন।[৯৯] এবং এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আলিগড় আন্দোলনকারীদের নিকট বৃটিশ ছিলো খলিফাতুল্লাহ্ (আল্লার প্রতিনিধি)।[১০০] এজন্যে তিনি মুসলমানদের কোনপ্রকার রাজনৈতিক বিক্ষোভে অংশ-গ্রহণের বিরোধী ছিলেন।[১০১] এই মতামতের উপর ভিত্তি করে তিনি এর বিরুদ্ধে পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন এবং এই গঠনকার্যকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলে অভিহিত করেন।[১০২] তাঁর মতে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের ভিত্তিই হলো ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, অতীত ও বর্তমানের বিস্মৃতির উপর এবং হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব অস্বীকারের উপর।"[১০৩]

স্যার সৈয়দ আহমদ সেদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর পূর্ববর্তী কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।[১০৪] কারণ তিনি ইতঃপূর্বে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। এই ঐক্য যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্যে এবং হিন্দু জনসাধারণের ধর্মীয় আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি আলিগড় কলেজের চৌহদ্দির ভেতর গো-হত্যা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিলেন।[১০৫] শুধু তাই নয়, পাঞ্জাবের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন যে, এককভাবে হিন্দু বা মুসলমানের উন্নতিতে এদেশের উন্নতি নেই।[১০৬] তিনি হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান-অধ্যুসিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন।[১০৭]

আসলে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের এই ভূমিকার পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন বাঙালীভীতি কাজ করেছিলো। ১৮৮৭খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি লক্ষ্ণৌতে এক বক্তৃতায় স্পষ্টই এই ভীতির কথা ব্যক্ত করেছেন।[১০৮] অতএব তাঁর

কংগ্রেসভীতিকে বাঙালীভীতি আখ্যাপ্রদান যুক্তিসঙ্গত।[১০৯] কারণ তখন সমগ্র ভারতের জনমত বাঙালীরাই নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম ভারতের জনসাধারণ অনেক পিছিয়ে ছিলেন।[১১০] এই বাঙালীভীতি ১৯৪৭ সালের পরও কিভাবে বাঙালী মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা সবাই জানেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তৎকালীন বাঙালী মুসলিম-মানসে এর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করবো।

কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের মনোভাবে যে দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে সে সম্পর্কে হিন্দু বুদ্ধিজীবীসমাজ বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। একারণে তাঁদের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে আসা-যাওয়ার ভাড়া পর্যন্ত প্রদান করা হতো।[১১১] শুধু তাই নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে সাবিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কোন বিষয়ে যদি সংশ্লিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক তাঁদের স্বার্থজড়িত বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহলে তা গ্রাহ্য হবে না।[১১২]

এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে স্যার সৈয়দ আহমদ সরকারকে 'ভাগ কর ও শাসন কর'-নীতি গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করেন এবং "অবস্থানুসারে মুসলমানকে দিয়ে হিন্দু দমন অথবা হিন্দুকে দিয়ে মুসলমান দমনের স্পষ্ট প্ররোচনা দেন"।[১১৩] তিনি-যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজ করেছেন তার প্রমাণ হলো ইংরেজের বিকৃত ইতিহাস পরিবেশন সম্পর্কে সচেতনতা।[১১৪] অবশ্য স্যার সৈয়দ 'ভাগকর ও শাসনকর'র কথা বললেও এই নীতির কথা ইংরেজদের মনে বহু আগেই এসে-ছিলো।[১১৫] এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে তিনিই প্রথম এদেশে পৃথক নির্বাচন প্রথার কথা বলেন।[১১৬]

কংগ্রেস সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব যাই থাক না কেন, এই

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু-মানসে ব্যাপক আন্দোলনপ্রবণতা গড়ে ওঠে। ফলে ভারতব্যাপী ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এর ফল হলো এদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত। কংগ্রেস এই চেতনার মূলে পরোক্ষভাবে জলসিঞ্চন করেছে। কারণ কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের যে পথ অবলম্বন করেছিলো তা চরমপন্থী নেতৃবৃন্দকে বিদ্রোহী করে তোলে। এই বিদ্রোহের ফলে বঙ্গদেশে বিপ্লবী কর্মতৎপরতার সূচনা হয়।[১১৭] এছাড়া বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু বুদ্ধিজীবীর মনেও কংগ্রেস সম্পর্কে এজাতীয় প্রশ্ন উদয় হয়েছিলো। এই বুদ্ধিজীবীদের ভেতর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন।[১১৮] তাঁরা লেখনীর মাধ্যমে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচার করেন। বরিশালের প্রখ্যাত জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত তৎকালীন কংগ্রেস অধিবেশনগুলোকে 'বার্ষিক তিন দিনের তামাশা' বলে অখ্যায়িত করতেও কুণ্ঠিত হননি।[১১৯]

হিন্দুদের কংগ্রেসবিরোধী ধারণাকে কেন্দ্র করে জাতীয় চেতনার সঞ্চার এবং মুসলমান কর্তৃক তার বিরোধিতা ইংরেজদের একটা নতুন পথের সন্ধান প্রদান করলো। এই পথে ইন্ধন জোগালো কিছু ধর্মান্ধ হিন্দুর আচরণ, যা তাঁদের গো-প্রীতিকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৯৩ খ্রীঃ পুণাকে 'গোবধ নিবারণী সভা' স্থাপনের পর থেকে এর সূচনা—যাকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রথম আত্মচেতনার বিকৃত রূপ" বলে অখ্যায়িত করেছেন।[১২০] এতদিন বিভিন্ন ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানের ভেতর বিভেদ সৃষ্টির যে প্ররোচনা দিয়ে আসছিলেন এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান যেকথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন ইংরেজ এতদ্দ্বারা সে পথের সন্ধান পেলো। তারা বুঝলো "এই বিষয়টিকে 'জিয়াইয়া' রাখিতে পারিলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের বাধাকে চিরন্তন করিয়া রাখা যাইবে।"[১২১]

এই পথে তার প্রথম পদক্ষেপ হলো বঙ্গভঙ্গ।

এই পর্বে আরেকটি ঘটনা মুসলিম মানসে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাহলো, ১৮৮৫ খ্রীঃ রচিত 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' (বেঙ্গল টেনানসি অ্যাক্ট)। এই আইনের মাধ্যমে জমির উপর চাষীর অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে সাধারণভাবে লাভবান হয় মুসলমানেরা। কারণ বঙ্গদেশের বেশির ভাগ প্রজাই মুসলমান। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়-যে এই পদক্ষেপ মুসলমানদের ভেতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, একথা বলা যায় না।

॥ চার ॥

কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের সার্বিক অভ্যুত্থান না ঘটলেও হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও যুবসমাজের ভেতর তা প্রচুর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া-যে প্রধানতঃ ইংরেজ শাসনকে বিপন্ন করবে তা ইংরেজের পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। ফলে বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলমানের ভেতর বিরোধ বাঁধিয়ে নির্বিঘ্নে শাসন করার দূরভিসন্ধি নিয়ে ইংরেজ তথাকথিত প্রশাসনিক সুবিধের নামে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করলো। এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ "ইহার বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহাই কালক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পর্যবসিত হয়।"[১২২]

বঙ্গভঙ্গের কারণ সম্পর্কে সরকারী ভাষ্যের সাথে বেসরকারী ভাষ্যের কোন মিল নেই। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ (ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যাসহ) একজন শাসকের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। একারণে তার বিভক্তির প্রস্তাব আসে। ইংরেজ যে কারণটিকে মূল প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে তা হলো, বঙ্গভঙ্গের ফলে একটা আলাদা মুসলিম প্রদেশ সৃষ্টি হবে, যা তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজকে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এগিয়ে আসতে সহায়তা করবে।[১২৩] এই

কারণটিই শেষপর্যন্ত গোটা আন্দোলনকে একটা আত্মঘাতী পথে টেনে নিয়ে যায়—যা ইংরেজ অভিপ্রায়ের পরিপূরক।

তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লর্ড কার্জন এই কাজটি করেছিলেন। এক, বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন-প্রবণতার মূলে বাধা সৃষ্টি করা। কারণ এতে একটা আলাদা মুসলিমপ্রধান প্রদেশ (পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ) সৃষ্টি হবে এবং হিন্দু অধ্যুসিত প্রদেশে (পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা) বাঙালী শিক্ষিত হিন্দুসমাজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হবেন—যাঁরা এখন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিরাট হুমকিস্বরূপ।[১২৪] দুই, হিন্দু মুসলমানের ভেতর স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।[১২৫] এতে অন্য অর্থে ইংরেজ শাসনতান্ত্রিক সুবিধে পেতে পারে। তিন, আসামের চা-প্রধান অঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গের পাট-প্রধান অঞ্চলকে একই শাসনকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা।[১২৬]

বঙ্গভঙ্গ লর্ড কার্জনের দীর্ঘদিনের চিন্তার ফল একথা তাঁর ভারত-ত্যাগের পর স্পষ্ট হয়ে গেছে[১২৭] শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গের যেসব প্রস্তাব এসেছে তাতেও একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ১৮৯৬ খ্রীঃ চট্টগ্রামের কমিশনার ডব্লিউ বি ওল্ডহ্যাম এবং তার কিছুকাল পরে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুদের প্রাধান্যের আশঙ্কায় বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করেছিলেন[১২৮] ১৯০৩ খ্রীঃ ৩ ডিসেম্বর সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ এইচ রিজলে প্রথম এই ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন।[১২৯]

প্রাথমিকভাবে তিনটি পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আসে। প্রথমত, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরাকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসাম প্রদেশের সাথে যুক্ত করা। চট্টগ্রামের অধিবাসীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন[১৩০] দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম বিভাগের সঙ্গে ঢাকা ও ময়মনসিংহকেও বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা। উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ জানান।[১৩১] এবার লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে জনমত সংগ্রহের জন্যে পূর্ববঙ্গ সফরে গেলেন এবং সফরের নাম করে জনগণকে উস্কানীমূলক ও ভীতিপ্রদ প্রচারণার মাধ্যমে বশীভূত করতে চাইলেন।[১৩২] এই সফরের ফল হলো তাঁর তৃতীয় প্রস্তাব। এবারের প্রস্তাবে পরিকল্পিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সঙ্গে সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা অন্তর্ভুক্ত হলো। চূড়ান্ত প্রস্তাবটি অত্যন্ত গোপনে তৈরি হলো—যা গ্রহণ করতে ভারতসচিবও ইতঃস্তত করেছিলেন।[১৩৩] প্রথমদিকে ইংরেজরা এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলোও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন।[১৩৪]

১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ বিধিবদ্ধ হয়।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলনের সূচনা হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রসর হিন্দুসমাজ কোনমতেই এই প্রস্তাব মেনে নিলেন না। কারণ বঙ্গদেশে যখন শাসনপরিষদ গঠনের কথা বলা হচ্ছে তখন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বিহারী ও উড়িয়াদের দ্বারা এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান ও আসামীদের দ্বারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছেন।[১৩৫] ছোট-বড় জনসভা ও বিক্ষোভের মাধ্যেমে তাঁরা নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করলেন। ১৬ অক্টোবর প্রতিরোধ দিবস হিসেবে প্রতিপালিত হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রাখি বন্ধন"—এর প্রস্তাব প্রদান করলেন এবং "রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গবঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে 'অরন্ধন' পালন" করার প্রস্তাব করলেন।[১৩৬] শোকচিহ্নস্বরূপ সেদিন সবাই উপবাসব্রত পালন করবেন।[১৩৭] দোকানপাট খোলা হবে না, গাড়িঘোড়া কিছুই চলবে না। ১৬ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে রেখে বাঙলার আপামর জনসাধারণ 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করতে করতে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ হয়ে আন্দোলনের সূচনা করলেন।[১৩৮] এই আন্দোলনের সময় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে-

ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে অভূতপূর্ব গণজাগরণের সূচনা হয় তাতেই এদেশে বিলাতি পণ্য বর্জন তথা স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ধর্মীয় রূপ লাভ করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই আন্দোলনের তীব্রতার কারণ হিসেবে "বিদেশের দ্রব্য বর্জনকে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করা এবং মন্দিরে দেবমূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করা"র কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩৯] এই আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের ভেতর দ্বন্দ্ব। ১৯০৫ খ্রীঃ কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশন থেকে এর সূচনা এবং ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট অধিবেশনে এর চূড়ান্ত রূপ লাভ। ফলত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও সূচনা হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চরমপন্থী মতাদর্শের ফল হলেও তাঁদের একটা বিরাট অংশ প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না [১৪০]

স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্যাপকতা লাভ করলেও তার সূচনা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে [১৪১] বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন জোরদার হয়েছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হলো জনজীবনের বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা 'সঞ্জিবনী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথম বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করে এবং 'হিতবন্ধু' অর্থনৈতিক চাপে কাজ হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে [১৪২] এই আন্দোলন ধীরে ধীরে এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, মুচি, ঠাকুর, চাকর, ধোপা প্রমুখের ভেতরও ছড়িয়ে পড়ে।[১৪৩] এই আন্দোলনের ফলে শুধু বিদেশী পণ্যই বর্জিত হলো না, বিদেশী শিক্ষার স্থলে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব ওঠলো এবং চারিদিকে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষার জন্যে এক

লক্ষ টাকা দান করলে কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৪৪] বিপিনচন্দ্র পাল সিলেটে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেন এবং অরবিন্দ ঘোষ বহু টাকার চাকরী পরিত্যাগ করে নামমাত্র বেতনে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এভাবে গোটা আন্দোলনটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে মুসলমানদের ভেতর তিন ধরনের মনোভাব কাজ করেছে। প্রথমত, মুসলমানদের ভেতর অনেকে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন আবদুর রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মুজিবুর রহমান খাঁ, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, আবুল কাসেম, লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ। 'মোহামেডান ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েশন' বঙ্গভঙ্গের ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চা এবং মোহসেন ফাণ্ড থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।[১৪৫] 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারী আমির হোসেন বঙ্গভাষী অঞ্চলকে অপ্রয়োজনে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং বর্তমান ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন।[১৪৬] 'মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনে'র সভাপতি খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফ বঙ্গভঙ্গবিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তবে মুসলমানদের চাপে তাঁকে ঘোষণা করতে হয়েছিলো যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সভায় যোগদান করেছেন, এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে নয়।[১৪৭] যে নবাব পরিবার বঙ্গভঙ্গের অন্যতম সমর্থক ছিলেন, তারই একজন সদস্য, খাজা আতিকুল্লাহ, কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মতামত প্রদান করেছেন।[১৪৮] অবশ্য সাধারণ মুসলমানদের উপর

এসব ব্যক্তির তেমন কোন প্রভাব ছিলো না।[১৪৯] জনৈক একিন-উদ্দীন বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, "নূতন প্রদেশ ভৌগোলিক বৈষম্য, অধিবাসীগণের বৈষম্য ইত্যাদি বহু বৈষম্যের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা এই বিষময় ফল ভোগ করিব বলিয়াই আমরা বিচলিত হইয়াছি।"[১৫০] 'মোহামেডান ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েশনে'র মতো তিনি মনে করেন "দেশের সামান্য উন্নতি এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকদের সমবেত চেষ্টা। গভর্ণমেণ্ট নূতন প্রদেশ সংস্থাপিত করিয়া এই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছেন।"[১৫১] একই সময়ে খায়েরুন্নেসা নাম্নী জনৈকা মহিলা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্যে সাধারণ নারীসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[১৫২] এছাড়া 'মুসলিম ক্রনিক্যাল' পত্রিকা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে খবরাখবর পরিবেশন করে জনসাধারণকে সচেতন করার কাজে সহায়তা প্রদান করেছে।[১৫৩] বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের দিন কলেজ স্কোয়ারের সমাবেশে প্রায় পাঁচশ মুসলমান উকিল উপস্থিত ছিলেন—যাঁরা প্রায়ই হিন্দু উকিলের অধীনে কাজ করতেন বা তাঁদের সাহায্য পেতেন।[১৫৪]

দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তার পক্ষে-বিপক্ষে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে সে আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম জনসাধারণের অজ্ঞতা। বলা বাহুল্য এই অজ্ঞতার পেছনে কাজ করেছে অশিক্ষা ও রাজনীতিবিমুখতা।[১৫৫] পরবর্তীকালে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। এই অজ্ঞতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারকে কেন্দ্র করে।[১৫৬]

তৃতীয়ত, মুসলিম জনসাধারণ কর্তৃক এই আন্দোলনের বিরোধিতা। এসব মুসলমান বঙ্গভঙ্গের সাথে সাথে স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছেন। যাঁরা বৃহত্তর

জাতীয় ঐক্যের জন্যে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছেন তাঁরা ধন্যবাদার্হ এখানে কোন সন্দেহ নেই। তবু যাঁরা এই আন্দোলনে সমর্থন জানাতে পারেননি তাঁদের যুক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে কোন কারণে হোক, মুসলমানেরা যখন শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর তখন তুলনামূলকভাবে অগ্রসর সমাজের প্রতি ক্ষোভ, ভয় বা ঘৃণা থাকা স্বাভাবিক। এই অবস্থায় বঙ্গভঙ্গ তাঁদের মনে আশার সঞ্চার করেছে, তাঁদের সামনে ভবিষ্যৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ খুলে দিয়েছে। এবার তাঁরা কোনপ্রকার প্রতিযোগিতা ছাড়াই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাবেন। এই হলো স্বতস্ফূর্ত সমর্থনের দিক। অন্য-দিকে সমসাময়িক হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অন্তরালে যে ধর্ম ও সম্প্রদায়বোধ প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন তা মুসলমান-দের এই আন্দোলনের বিরোধী করে তোলার পথে সহায়তা প্রদান করেছে। ফলত যে বিকৃত আবেগ নিয়ে হিন্দুনেতৃবৃন্দ আন্দোলনটি পরিচালনা করেছেন, সেই একই বিকৃত আবেগ নিয়ে মুসলিমনেতৃ-বৃন্দ তার বিরোধিতা করেছেন। একারণেই স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আন্দোলনটিকে 'আত্মঅস্বীকৃতিমূলক' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৫৭] 'বন্দেমাতরম' শ্লোগানের পেছনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মীয় আবেগ কাজ করলেও বিংশ শতাব্দীতে এই মন্ত্রের অনুসারীরা যদি সজ্ঞানে এতে ধর্মীয় ভাব আরোপ না করতেন, তাহলে দেশকে 'মাতা' হিসেবে বন্দনা করার ক্ষেত্রে মুসলমানেরা আপত্তি নাও করতে পারতেন। বঙ্গভঙ্গজনিত কারণে মুসলমানদের ভেতর শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি হয়ে-ছিলো[১৫৮]—যা পরবর্তীকালে সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারতো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে ইংরেজ যে সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলো সে সম্পর্কে অনেক মুসলমান সচেতন ছিলেন। তাঁদের অনেকেই বুঝেছিলেন "ইংরেজের এই ভেদনীতিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ক্ষীণাদপি

পার্থক্যের রেখা—তাহাকে সুবৃহৎ করিয়া তুলিয়াছে—তাই আজ হিন্দু মুসলমান হইতে বহু দূরে—তাহাদের মধ্যে যে সাম্য তাহাতে আজ প্রীতির অভাব ঘটিয়াছে।"[১৫৯]

বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলপ্রাপ্তি আপেক্ষিক হলেও স্বদেশী আন্দোলন মুসলমানদের আর্থিক সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হেনেছে। কারণ গ্রামের বেশির ভাগই মুসলমান, এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। এঁদের কেউ চাষাবাদ করেন, কেউ বা ছোটখাট ব্যবসা করে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। এসব ছোটখাট ব্যবসায়ীদের প্রায় সবাই স্বল্প পুঁজি-সম্পন্ন। তাঁদের অনেকেই একহাটে পণ্য ক্রয় করে অন্য হাটে তা বিক্রি করেন। এর ভেতর অনেকেই বিদেশী জিনিসপত্রের ব্যবসাও করতেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিলো যে একবার কিছু পণ্য নষ্ট হলে তার পক্ষে আবারো পুঁজি বিনিয়োগ করা অসম্ভব। অতএব এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। একারণে স্বদেশীদের ব্যবহারকে "অমানুষিক জোর জুলুম ও অত্যাচার" আখ্যায়িতকরণ[১৬০] অস্বাভাবিক নয়। এই বাস্তব দিকটি সেদিন আন্দোলনকারীরা ভেবে দেখেননি। অবশ্য দেশী দ্রব্য সরবরাহের নামে এক শ্রেণীর দেশীয় ব্যবসায়ী যে ফেঁপে ওঠেছিলো সে সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ সচেতন ছিলেন[১৬১] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রাধান্য। সেদিনকার বিশিষ্ট চিন্তানায়কেরাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিবাজী উৎসব বা "মুসলমান ধর্মবিরোধী এই প্রকার উৎসবকে টিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা সেদিন প্রাণপণ করিয়া যেরূপ ভাবে জাতীয়তাবাদের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাকে তো ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ বলিতে পারি না। এই নূতন জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১৬২] সমসাময়িক মুসলিম পত্রপত্রিকা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে

বলে বিকৃত প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণের ভেতর তা ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়।[১৬৩] স্বদেশী আন্দোলনের এই আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির দিকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' (১৩২২) উপন্যাসে যথাযথ উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সময় উত্থিত হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে মুসলমানদের অনগ্রসরতার পেছনে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার নিন্দা করেছেন। প্রথমদিকে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকেও রবীন্দ্রনাথ এসব কারণে পরে এই আন্দোলন থেকে সরে পড়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত এক পত্রে তিনি এই আন্দোলন থেকে সরে আসার কারণ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন, "উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।"[১৬৪]

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও তীব্র রূপ ধারণ করে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও একই প্রকারে ধর্মীয় রূপ লাভ করে। হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া…ধূপ দীপ নৈবদ্য চন্দনাদি সাজাইয়া ছন্দোগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে গীতা" স্থাপন করে যাতে দীক্ষা নেওয়া হয়[১৬৫] তাতে মুসলমানের অংশ গ্রহণের কোন উপায় নেই। বলা বাহুল্য কারণ সেই একই—ধর্মীয়। "কালীপূজা, চণ্ডী ও গীতা পাঠ প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক কর্মসাধনার মধ্যে আনিয়া তাহার উদ্দেশ্যকে ধর্মীয় আকার দান করা হইল" বলেই "হয়তো বাঙালী মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজের লোক এই বিপ্লববাদে যোগদান করিতে পারে নাই।"[১৬৬] শুধু তাই নয়, এই ধর্মীয়ভাবকে সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক আদর্শে রূপ দেওয়ার জন্যে হিন্দুরা

প্রথমদিকে দীক্ষাকার্য নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন।[১৬৭] অতএব এই আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই মুসলিম-মানসে হিন্দু চরমপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কার্যকলাপকে বিবেচনায় আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে যখন হিন্দুদের ভেতর থেকে এই ধর্মীয় ভাব তিরোহিত হয়েছিলো তখন বহু মুসলমানও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং বিভিন্নভাবে আন্দোলনে সহায়তা প্রদান করেছিলেন।[১৬৮] আবদুর রাজ্জাক খান নামে জনৈক মুসলমান চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় চারটি রিভলবার সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।[১৬৯] অবশ্য একথা ভুলে গেলেও চলবে না যে, যে-ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনকে এদেশে প্রথম সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করা হয়[১৭০] তাও ধর্মবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছিলো।[১৭১]

মুসলিম-মানসে হিন্দুবিরোধী ধ্যান ধারণার সূত্রপাতে হিন্দুদের দায়িত্ব যাই থাক না কেন বৃটিশ এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। বঙ্গভঙ্গের পরই একটা মুসলিম প্রতিনিধি দল ১৯০৬ খ্রীঃ ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড মিণ্টুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা ক্রমবর্ধমান হিন্দু প্রাধান্য থেকে নিজেদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবে ভাইসরয়কে রাজি করান।[১৭২] ভাইসরয় সেই প্রতিনিধি দলের কাছে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন।[১৭৩] যে মুহসিন উল মুলুককে যুক্তপ্রদেশের লেঃ গভর্ণর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে অপদস্ত করেছিলেন তিনিই এই প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৭৪] সে পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ খ্রীঃ ৩১ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯০৭ সালে করাচীর অধিবেশনে মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং তাতে স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।[১৭৫] এই দলই পরবর্তীকালে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে কিভাবে

জাতীয়তাবাদের মূলে আঘাত হেনেছে তার ইতিহাস মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর আত্মজীবনীতে বিবৃত করেছেন। সেখান থেকেই মুসলমানদের ভিন্নপথে যাত্রা শুরু হয়।

ইতোমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদীদের ভেতর বিভক্তির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বিপর্যস্ত সরকার শেষপর্যন্ত নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যে মর্লে-মিণ্টসংস্কার প্রবর্তন করে সাংবিধানিক রাজনীতির ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করেন এবং অন্যদিকে মুসলমানদের জন্যে পৃথকনির্বাচন ব্যবস্থা চালু করেন।

কিন্তু এত করেও বঙ্গভঙ্গ ঠেকানো গেল না। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলো এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলো। লর্ড কার্জন যেমন পার্লামেণ্টকে না জানিয়ে বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন, তেমনি রদ করার ব্যাপারেও পার্লামেণ্টকে জানানো হলো না।[১৭৬] এভাবে ভারতের জনসাধারণের ভেতর যুগপৎ স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত করে বঙ্গভঙ্গ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কিছুকালের জন্যে অপসারিত হলো সত্য, কিন্তু এতদ্দ্বারা সন্ত্রাসবাদী-দের বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ হলো না, বরং চলতেই থাকলো।[১৭৭]

॥ চার ॥

বঙ্গভঙ্গ রদ হলো হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের প্রবল আন্দোলনের ফলে। একথা উভয় সম্প্রদায়ই উপলব্ধি করতে পারলেন। হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেলো। পক্ষান্তরে মুসলমানরাও হতাশ হয়ে পড়লেন এবং ইংরেজের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তাঁদের ভেতর আন্দোলনের স্পৃহা জেগে ওঠলো উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সুস্থ ও উৎসাহব্যঞ্জক মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার প্রারম্ভেই প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধে নরমপন্থীরা দেশ রক্ষার নামে আবারো ইংরেজতোষণ-নীতি অবলম্বন করলেন—রমেশচন্দ্র

মজুমদার যাকে 'হাস্যাস্পদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৭৮] এই সুযোগে ইংরেজ ১৯১৫ খ্রীঃ 'ভারত রক্ষা আইন' (ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট) প্রবর্তন করে ব্যাপক দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করলো।

ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৬ খ্রীঃ 'হোমরুল লীগ' গঠন করলেন। মিসেস অ্যানি বেসান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্বশাসনের দাবি উত্থাপন করলো।[১৭৯] এই সময় দুটো বিরাট ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। একটা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধের অবসান—যা সূচিত হয়েছিলো ১৯০৭ খ্রীঃ ; অপরটি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের স্মারক হিসেবে স্বাক্ষরিত 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' (১৯১৬)। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর মুসলিম-মানসে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১২ খ্রীঃ থেকে মুসলিম লীগ প্রায় কংগ্রেসের কাছাকাছি এসে পৌঁছে। অথচ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ইংরেজ যে ভেদনীতি গ্রহণ করেছিলো তার পরিণতি হিসেবে মাত্র কয়েকবছর আগেও বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিলো।[১৮০] এসব কারণে ইংরেজ নরমপন্থীদের খুশি করার জন্যে কিছু শাসনসংস্কারের প্রস্তাব করলো। ১৯১৮ খ্রীঃ ৮ জুলাই এই প্রস্তাবগুলো 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট' নামে আত্মপ্রকাশ করে। কংগ্রেস এই রিপোর্টের উপর আলোচনার জন্যে বোম্বেতে অধিবেশন আহ্বান করে। কিন্তু এই অধিবেশনে নরমপন্থীরা অংশগ্রহণ না করে কার্যত কংগ্রেস থেকে অপসারিত হয়ে যান এবং ২৯ আগস্ট লর্ড এডউইন-মন্টেগুর পরামর্শ অনুযায়ী 'ন্যাশন্যাল লিবারেল লীগ' গঠন করেন।[১৮১]

এসব রাজনৈতিক ডামাডোলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চাপা পড়লো না। বরং তা ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকলো। গুপ্তহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতি অবিরাম চলতে

লাগলো। এই অসমসাহসী বঙ্গযুবকেরা তাঁদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের ভিত ধরে নাড়া দিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে 'ভ রতরক্ষা আইন' বলে তাঁদের দমন করার সুযোগ থাকলেও যুদ্ধের পর এই আইন বাতিল হয়ে গেলে সেই সুযোগ চলে যায়। এর বিকল্প হিসেবে রচিত হয় কুখ্যাত 'রাউলাট আইন'।[১৮৩] এই আইনের সাহায্যে সন্ত্রাসবাদীদের সাজা প্রদান করা সহজ হয়ে পড়লো। অর্থাৎ শাসন-সংস্কার ও দমননীতি একযোগে চললো। ১৯১৯ খ্রীঃ ৬ ফেব্রুযারি 'র:উলাট আইন' বিধানসভায় উত্থাপিত হলো এবং ১৮ মার্চ তা আইনে পরিণত হলো। এই আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানাওয়ালাবাগে ভারতের ইতিহাসে বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়—যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজপ্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধীজী এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করেন। এখান থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বের সূচনা।[১৮৪]

রাউলাটবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে খেলাফৎ আন্দোলনের সূচনা হলো। খেলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে মূলতঃ মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ জড়িত ছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক ঘটনাচক্রে জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করায় এই আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। যেহেতু মুসলমানদের কাছে খেলাফৎ মাননীয় মর্যাদাবহ[১৮৫] সেহেতু তুরস্কের তদানিন্তন শাসক সুলতান আবদুল হামিদ খলিফা হিসেবে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এই অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানেরা দ্বিধায় পতিত হন। একদিকে মিত্রশক্তির সপক্ষে বৃটিশ, অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে মুসলিম জগতের একমাত্র খেলাফতের দাবিদার তুরস্ক। কিন্তু যুদ্ধচলাকালীন সময়ে ইংরেজের সঙ্গে এ ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের একটা রফা হলো এই শর্তে যে, যুদ্ধশেষে তুরস্কের

কোন ক্ষতি করা হবে না।[১৮৬] কিন্তু কার্যত হলো তার উল্টোটা। যুদ্ধ শেষে ১৯২০ খ্রীঃ ১৫ মের সন্ধি মতো দেখা গেলো, গোটা তুরস্ক সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যবাদীদের ভেতর ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হলেন। গান্ধীজী এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে মুসলমানদের অসহযোগ আন্দোলনের পরামর্শ প্রদান করেন। "এই উপলক্ষ্যেই গান্ধী সর্বপ্রথম তাঁহার এই ব্রহ্মাস্ত্রের উল্লেখ করেন।"[১৮৭] ২৮ মে খেলাফৎ কমিটি কর্তৃক তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমনিতে অন্য একটি কারণে এই দিনে জনমত বিক্ষুব্ধ ছিলো। এই দিন (২৮ মে) জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে হাণ্টারের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিলো, যাতে জনমত প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে।[১৮৮] অতএব এই উত্তপ্ত অবস্থায় ১ ও ২ জুন কেন্দ্রীয় খেলাফৎ কমিটির ডাকে হিন্দু-মুসলমানদের এক মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১ আগস্ট এই কমিটি সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী পূর্ণ হরতাল অ'হ্বান করে।[১৮৯] যুদ্ধে ইংরেজের সাহায্য করায় গান্ধীজী যেসব পদক পেয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে তিনি সেগুলো পরিত্যাগ করেন।[১৯০] ১৯২০ খ্রীঃ ৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত খেলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কেউ এই আন্দোলনে 'এক-জাতীয়ত্বে'র বদলে "বিপন্ন প্রতিবেশীর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন" লক্ষ্য করেছেন,[১৯১] কেউবা এই আন্দোলনকে "মুসলমান-তোষণনীতি" বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৯২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই আন্দোলন সমর্থন করেননি। কারণ তিনি মনে করেন, "এমনতরো মিলনের উপলক্ষ্যটা কখনোই স্থায়ী হতে পারে না।"[১৯৩] এমনকি শরৎচন্দ্রের মতো উদার ও সহনশীল লেখকও এই আন্দোলন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়,

অসত্য।"[১৯৪] এই প্রবন্ধে খেলাফৎ আন্দোলনবিরোধিতার নামে তিনি এমন সব উক্তি করেছেন যা অনেকের কাছেই আপত্তিকর মনে হতে পারে। কেননা "হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই।"[১৯৫] —জাতীয় মন্তব্যের সঙ্গে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে কথিত বঙ্কিমচন্দ্রের "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে",[১৯৬] অথবা "আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই মঙ্গল"[১৯৭]—জাতীয় মন্তব্যের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আসলে কি ব্যাপারখানা তাই? একে কি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডির বাইরে বিশ্লেষণ করা যায় না? মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের যে ডাক দিয়েছিলেন তাতে কি মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি ও দমননীতির প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়নি? এই প্রশ্নগুলোর জবাব ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।[১৯৮] পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তাঁর আত্ম-জীবনীতে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন[১৯৯] তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

এসব হলো এই আন্দোলনের বাস্তব দিক। কিন্তু এসব দিক দিয়ে এর সার্থকতা বিচার করা যাবে না। কারণ খেলাফৎ মুসলমান-দের জন্যে যত মর্যাদাপূর্ণ প্রথাই হোক না কেন[২০০] আধুনিক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রথা সমর্থনের কোন যুক্তি নেই। কারণ এই প্রথা সমর্থন করা মানে পেছনের দিকে ফিরে তাকানো, যাকে কোন অর্থেই সুস্থ লক্ষণ বলা যায় না। এই প্রথা সম্পর্কে তুরস্কের জনসাধারণের ভেতর যত দুর্বলতাই থাক না কেন পরবর্তীকালে মোস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে এই প্রথার বিলুপ্তি[২০১] —তাদের ভেতর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার উত্তরণ সূচিত করে। কিন্তু তথাপি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের অতীত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক এই আন্দোলনের প্রতি

সমর্থনকে বিজ্ঞ পদক্ষেপ বলেই মনে হয়। আজ যাঁরা এই আন্দোলনের নেতৃত্বপ্রদানকে হিন্দু-মুসলিমবিভেদের কারণ বলে উল্লেখ করে দেশবিভাগের জন্যে (বঙ্গদেশ) দায়ী করেছেন,[২০২] তাঁরা ভুলে গেছেন যে, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এই বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিলো।

১৯১৮ খ্রীঃ যেসব নরমপন্থী কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁরা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে যে সংস্কার সূচিত হয় তার আওতায় ১৯২১ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়যুক্ত হয়ে মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছিলেন।

এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে (১৯২২ খ্রীঃ ৫ ফেব্রুয়ারী) গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরা গ্রামে হিংসাত্মক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হওয়ায় গান্ধীজী ১২ ফেব্রুয়ারি বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্যকরী সংসদের সভায় অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেয়।[২০৩] ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটে।[২০৪] এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯২২ খ্রীঃ গয়া কংগ্রেসে নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।[২০৫] গয়াতে ১৯২২ খ্রীঃ ৩১ ডিসেম্বর পণ্ডিত মতিলাল নেহরুসহ চিত্তরঞ্জন দাস 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠন করলেন।[২০৬] "প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচি নিয়ে স্বরাজ্য পার্টির অভ্যুদয় হয় ১৯২৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে।"[২০৭] এই পার্টি কংগ্রেসের ভেতর থেকে কাউন্সিল প্রবেশের আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯২৩ খ্রীঃ 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রকাশ করে। এই প্যাক্ট অনুসারে, জনসংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন পরিষদে আসনসহ "সমস্ত সরকারী পদের শতকরা ৫৫ ভাগ পাবেন মুসলিম

সম্প্রদায়।"[২০৮] ১৯২৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে নরমপন্থীদের পরাজিত করে স্বরাজ্য পার্টি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করে।[২০৯] কাউন্সিল অধিবেশনে ১৯২৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে খান বাহাদুর মশাররফ হোসেন এক প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট অনুযায়ী ঘোষিত সংখ্যা-সীমায় না আসা পর্যন্ত শতকরা আশি ভাগ চাকরী মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত রাখার দাবি জানান।[২১০] এই প্রস্তাব এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। শেষপর্যন্ত এই জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করেন যে, "স্বরাজ আইন অর্জনের পরই হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট কার্যকর হবে।"[২১১]

স্বরাজ্য দলের মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু মুসলিম সম্পর্কোন্নয়নের যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত উভয় সম্প্রদায়ের অনমনীয় মনোভাবের দরুণ হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে এবং পরিণামে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত হয়। উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্ম-সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানকল্পে বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। "শুদ্ধিসভা, হিন্দুসভা, হিন্দুমিশন, হিন্দু সংগঠন, বিভিন্ন আঞ্জুমান, খেলাফৎ কমিটি, তনজীম কমিটি, তবলীগ, জমিয়ৎ-ই-উলামা"[২১২] ইত্যাদি এই আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয় এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলে জলসিঞ্চন করে। এই সময় কোন কোন স্থানে স্থানীয় কৃষকেরাই দাঙ্গাহাঙ্গামার পুরোভাগে থেকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের লোকদের প্ররোচিত করতে থাকে। অমলেন্দু দে এই সময় অনুষ্ঠিত এজাতীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রসঙ্গে বলেছেন, "হিন্দু ও কংগ্রেস পরিচালিত কাগজে এই দাঙ্গাকে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই দাঙ্গার মূল ছিল অর্থনৈতিক। প্রায় সব মহাজনই ছিল হিন্দু। যে অল্পসংখ্যক মুসলমান মহাজন ছিল তাদের বাড়ীও আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়।"[২১৩]

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব গোটা ভারতীয় রাজনীতিকেই প্রভাবিত করে। পাট একটি প্রধান বাণিজ্য-মাধ্যম হয়ে ওঠার ফলে দ্রুত একটি পাটব্যবসাকেন্দ্রিক মুসলমান-মধ্যবিত্তসমাজ গড়ে ওঠে। ফলে মুসলমানেরা আরো দৃঢ়তার সাথে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে এগিয়ে আসেন। এর ফলে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স' ও 'মুসলিম লীগ' পৃথক-নির্বাচন প্রথা ও সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারার সপক্ষে আরো জোরালোভাবে মতামত প্রকাশ করেন।[২১৪] এই সময় রচিত হয় কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নার ঐতিহাসিক 'চোদ্দ দফা'। এভাবে মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন দাশের ঐক্যপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দুটো সম্প্রদায় পরস্পরবিরোধী পথে এগিয়ে যায়।

এই সংসদীয় রাজনীতির গোলকধাঁধায় বঙ্গদেশের বিপ্লবীরা প্রভাবিত না হয়ে নিজ নিজ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন। রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতির মাধ্যমে তাঁরা এদেশের সুপ্ত মানুষের মনে আবেগ সঞ্চার করেন এবং তাঁদের দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণের আহ্বান জানান। এই সময় বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে।

১৯৩০ খ্রীঃ ১ জানুয়ারি রাভি নদীর তীরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে[২১৫] স্বাধীনতার যে অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাই বাস্তবে রূপলাভ করার দুর্বার বাসনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩০ খ্রীঃ ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম শহর দখলের মাধ্যমে। এইদিন চট্টগ্রাম দখল করে 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সচকিত করে দেন।

এখান থেকেই সূচনা হয় ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথযাত্রা।

পাদটীকা

১ নরহরি কবিরাজ, 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা' (কলকাতা, ১৯৫৭) ৪৩।

২ গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (কলকাতা, ১৯৪৭) ৫৩।

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' (কলকাতা' ১৩৭৯) ২৭।

৪ Ram Gopal, 'Indian Muslims : A Political History' (Bombay, 1964) 14.

৫ মীর মশাররফ হোসেন, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', মশাররফ রচনা-সম্ভার, প্রথম খণ্ড, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত (ঢাকা, ১৯৭৬) ত্রিংশ তরঙ্গ, ৫৩০।

৬ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা' (দ্বি-স . কলকাতা, ১৯৬৭) ২৪। Sufia Ahmed, 'Muslim Cammunity in Bengal' (Dacca, 1974) 106, "Friction between the landlord tenants did not assume a Communal colour until 20th century"

৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৪৭।

৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'সিরাজুদ্দৌলা' (চতুর্থ-স .কলকাতা, ১৩২৩) ১৯৮- ২২।

৯ প্যারীচাঁদ মিত্র, 'রামকমল সেন' [অনূদিত] (কলকাতা, ১৯৬৪) ৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৩৪৫। R. C. Majumder, 'History of Mediaeval Bengal (1st ed. reprinted ; Calcutta) 144.

১০ Ram Gopal, 'How the British Occupied Bengal' (Bombay, 1963) 356-57.

১১ Muin ud Din Ahmed Khan, 'Fara' idi Movement' (Karachi, 1965) Introduction, Chapter II, p. XXXII.

১২ Azizur Rahman Mallick, 'British Policy and the Muslims in Bengal' (2nd ed. Dacca 1977) 76.

১৩ A. R. Mallick, op. cit. 80 ; M. A. Khan, op. cit., 13.

১৪ A. R. Mallick, op. cit., 80.

১৫ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (ঢাকা, ১৯৬৪) ৪৭।

১৬ M. A. Khan, op. cit., 105.

১৭ অমলেন্দু দে, 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' (কলকাতা, ১৯৭৪) ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৭, ৭৮ ৭৯ সংখ্যক পৃষ্ঠাসমূহ।

১৮ নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন", 'নবীনচন্দ্র রচনাবলী', প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৮১) ৫০২।

১৯ প্রাগুক্ত, ৫০৫।

২০ M. A. Khan, op. cit., 104 : "Dudu Miyan added a new feature, giving a socio-economic bias to the movement".

২১ মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯৭৬) ৮৭।

২২ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, ' ভারতে ওহাবী আন্দোলন", 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯৭৪) ১২১।

২৩ প্রাগুক্ত, ১২২।

২৪ আবদুল মওদুদ, 'ওহাবী আন্দোলন' (ঢাকা, ১৯৬৯) ১২৩।

২৫ আ. ম. হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, ১৩০।

২৬ স্যার সৈয়দ আহমদ খান, 'রচনাবলী' [অনুবাদ] (ঢাকা, ১৯৬৮) ২৪। আ. ম. হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, ১৩০।

২৭ A R. Mallick, op. cit., 110 "Tariqa-i-Muhammadiyah—the order of Muhammad".

২৮ A. R. Mallick, op. cit., 118.

২৯ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১.৪। Aziz Ahmed, 'Islamic Modernism in India and Pakistan' (London, 1967) 20.

৩০ W. C. Smith, 'Modern Islam in India'. (2nd ed., Lahore, 1963) 1.

৩১ আ. ম. হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, ১১৯।

৩২ প্রাগুক্ত, ১১৭। W. C. Smith, op. cit., 1.

৩৩ S. M. Ikramuddin, 'Modern Muslim India and the Birth of Pakistan' (2nd ed., Lahore 1965) 23-24.

৩৪ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, ১১৮। A. R. Mallick, op. cit., 124.

৩৫ A. R. Mallick, op. cit., 123.

৩৬ Ibid, 122-23.

৩৭ আ. ম. হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, ১৩৩। আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, ১৬।

৩৮ A. R. Mallick, op. cit., 89. M. A. Khan, 'Titumir and his followers' (Dacca, 1977) 10.

৩৯ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১০১।

৪০ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, 'শহীদ তিতুমীর' (ঢাকা, ১৩৬৮) ৪৯। A. R. Mallick op. cit., 91.

৪১ স্বপন বসু, 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস' (কলকাতা, ১৯৭৫) ২৯৫।

৪২ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১ ৪।

৪৩ A. R. Mallick, op. cit. 91.

৪৪ নরহরি কবিরাজ, প্রাগুক্ত, ৭৬।

৪৫ A. R. Mallick, op. cit. 92.

৪৬ Ibid, 93.

৪৭ Ibid, 94.

৪৮ Ibid, 95.

৪৯ স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, ২৯৫।

৫০ A. R. Mallick, op. cit., 101.

৫১ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, ১২৫।

৫২ বদরুদ্দীন উমর, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' (ঢাকা, ১৯৭৪) ১৯।

৫৩ মুহম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, ৯৪।

৫৪ Amit Sen, 'Notes on Bengal Renaissance' (2nd ed., Cal. 1975) 51.

৫৫ Ibid.

৫৬ সুশীলকুমার গুপ্ত, 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নব জাগরণ' (কলকাতা, ১৩৬৬) ২৫৩।

৫৭ গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, ৫৫।

৫৮ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (দ্বি-স ; ঢাকা, ১৯৬৯) ৮।

৫৯ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ৫১। কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, ৫৯।

৬০ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "সামাজিক প্রবন্ধ" 'ভূদেব রচনা-সম্ভার' (তৃ-স ; কলকাতা,

৬১ P. E. Roberts, 'History of British India (3rd ed., London,

1670) 366. ফজলে হক খানের আবাদী, '১৮৫৭ আযাদী আন্দোলন' [অনুবাদ] (ঢাকা, ১৯৬৮) ৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়. ভারতে জাতীয় আন্দোলন' (তৃ-স . কলকাতা, ১৯৬৮) ২৭।

৬২ নরহরি কবিরাজ, প্রাগুক্ত, ৮৩।

৬৩ K. K. Aziz, 'Britain and Muslim India' (London, 1963) 25.

৬৪ Ram Gopal, 'Indian Muslims', 26 : "Sir Syed was one of those Muslims who had at great personal risk and in spite of their having been condemned by learned doctors of Islam, rendered in valuable help to the British during the Great Revolt of 1857".

৬৫ স্যার সৈয়দ আহমদ খান, 'রচনাবলী' [অনুবাদ] (ঢাকা, ১৯৬৮) ১৮।

৬৬ রজনীকান্ত গুপ্ত, 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, (কলকাতা, ১৮৯৩) ৭৩-৭৫

৬৭ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' (চতুর্থ-স : কলকাতা, ১৯৬১) ১৯৯।

৬৮ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' (দ্বি-স : কলকাতা, ১৩৮২) ২০১। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৩৭৮) ৩২২।

৬৯ S. M. Ikramuddun, op. cit., 32 : "Syed Ahmed's grief at what he saw was boundless. He felt that India was no place for a self-respecting Muslim and wanted to retire from service and settled in Egypt".

৭০ Ram Gopal, 'How the British Occupied Bengal'. 356-57 এই গ্রন্থে রাম গোপাল এইচ. বেভারিজ, স্যার চার্লস ডেলকী, চার্লস বল, মণ্টগোমারী প্রমুখ লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে এই দমননীতির বিবরণী প্রদান করেছেন।

৭২ Md. Inamul Hoque, 'A Short History of Muslim Rule in Indo-Pakistan' (Chittagong, 1970) 446.

৭৩ "উমরে দরাজ মাঙ্গ কে লায়ে থে চারদিন
দো আরজু মে' কাট গেয়ে দো ইন্তেজার মে'।

দিন জিন্দেগী কে খতম হুয়ে শাম হোগেয়ী,
ফায়লা কে পাঁও সোয়েঙ্গে কানজে মাজার মে'।

কিতনা হ্ায় বদনসীব জাফার দফন কে লিয়ে,
দো গজ জমী ভী মিল না সেকি কোয়ে এয়ার মে' ' ;

অর্থাৎ ঃ দীর্ঘ বয়সের একভাগ কাটলো আকাঙ্ক্ষায়, বাকিভাগ প্রতীক্ষায়। জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, এখন কবরের অভ্যন্তরে শুয়ে পড়তে হবে। দুর্ভাগা জাফর, তার ভাগ্যে বন্ধুদের ভেতর সমাধিস্থ হবার জন্যে দু গজ জমিও জুটলোনা।

৭৫ Anil Seal, 'The Emergence of Indian Nationalism' (London, 1971) 2 : "The armed challenge proved that the Indians could not turn the British out of the force ; not because the foreigners were the stronger, but because they were more united".

৭৬ K. K. Datta, 'Alivardi and his Times' (2nd ed., Calcutta, 1963) 94 ; Iswari Prasad, 'India in the Eighteenth Century' (Allahabad, 1973) 92.

৭৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২৪। বদরুদ্দীন উমর', "আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ", 'সাম্প্রদায়িকতা' (ঢাকা ১৯৬৬) ৪।

৭৮ নরহরি কবিরাজ, প্রাগুক্ত ২০০।

৭৯ প্রাগুক্ত ৮৭।

৮০ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ৫১।

৮১ P. E. Roberts, op. cit., 381 : "The Mutiny was exploited alike to revive the vanished glories of the Mughal Empire – the foe of all Hindu principalities–and to re-establish the power of the Maratha Peshwa–the hereditary rebel against Mughal authority".

৮২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২৫।

৮৩ R. C. Majumder, 'Glimps of Bengal in the Nineteenth Century' (Calcutta, 1960) 18 : "In those days there was no conception of India as a country. There were Bengalis, Hindustani, Sikhs, Rajputs and Marathas, but no Indian".

৮৪ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ৫০।

৮৫ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রাগুক্ত, ৩৮৩ ঃ [উদ্ধৃতি] "He entered the city

with 200 Europeans, and 500 sepoys,—the inhabitants, who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands ; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they could have done it with sticks and stones". Clive's evidence.

৮৬ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, ২২৩।

৮৭ মিহির আচার্য, 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা' (কলকাতা, ১৯৭৭) ৬৩।

৮৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, ১৯৯।

৮৯ দ্রষ্টব্য : "Hundred and fifty years ago it was the Bengalees who betrayed the country to their foreign enemies. The Bengalees of the twentieth century certainly owe it to atone for that great sin. It will be the duty of Bengalee men and women to revive the lost glory of India. How best to accomplish that end is Bengal's great problem." Subhas Bose : Mission of Life (Quoted in Leonard A Gordon's 'The Nationalist Movement', 1974) 235.

৯০ S. M. Ikramuddin, op. cit., 29.

৯১ সরদার ফজলুল করিম, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস : অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকার", 'বিচিত্রা' (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৭) ১৮।

৯২ S. M. Ikramuddin, op. cit., 29 : "In the India Office, the book was translated, noted upon, discussed and became starting point for many reforms, e. g. the appointment of Indians to the Legislative Council, which began almost within a year of the publication of the Book."

৯৩ বিপিনচন্দ্র পাল, "হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র", 'বঙ্গবাণী' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) : "সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির এই দেশের উপর দাবী-দাওয়া আছে ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই জন্য কেশবচন্দ্রের

ব্রাহ্মবিবাহ বিধির (১৮৭২) প্রতিবাদ করেন, আর সেই স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই নবগোপাল হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা করেন।"

৯৪ চারুচন্দ্র দত্ত, 'পুরনো কথা', প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৬৯) ৬৭।

৯৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৭২।

৯৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রথম খণ্ড (চতুর্থ-স ; কলকাতা, ১৩৭৭) ২৭০। Amit Sen, op. cit., 59.

৯৭ শেখ ওসমান আলি, "কংগ্রেস ও মুসলিম জাতি", 'হাফেজ', ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' (ঢাকা, ১৯৭০) ২০৬ঃ "ক্রমে মুসলমানগণ নয়ন উন্মীলন করিতেছেন, তাই এবার কংগ্রেসে চল্লিশজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

৯৮ Sufia Ahmed, op. cit., Appendix c. 388.

৯৯ স্যার সৈয়দ আহমদঃ এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' পত্রিকায় লিখিত পত্র, (২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) 'স্যার সৈয়দ আহমদের পত্রাবলী' [অনুবাদ] (ঢাকা, ১৯৬৭) ৩০৮।

১০০ Anil Seal, op. cit., 335 : "Aligarh exherted Muslims to reaffirm their loyalty to the British who were described as Khalifatullah, or the representatives of God on earth."

১০১ স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ১০-১২-১৮৮৮ খ্রীঃ নিয়াজ মুহম্মদ খানকে লিখিত পত্র। 'পত্রাবলী', প্রাগুক্ত ২০২।

১০২ স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ২৪-৮-১৮৯৮ তারিখে সৈয়দ মুহম্মদ বোখারীকে লিখিত পত্র। প্রাগুক্ত, ১৬০।

১০৩ স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ২২-৯-১৮৮৮ তারিখে এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' পত্রিকায় লিখিত পত্র। প্রাগুক্ত, ৩০২-৩০৩।

১০৪ সেকস্‌পীয়র কর্তৃক স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে লিখিত পত্রঃ "This is the first occasion, when I have heard you speak about the progress of the Muslims alone. Before this you were always keen about the welfare for your country men in general." Quoted by S. M. Ikramuddin, (op, cit., 36).

১০৫ S. M. Ikramuddin, op. cit., 47 : "He was a great champion of Hindu-Muslim unity ··Out of regard for Hindus, he

prohibited slaughter of cow's within the College Premises."

১০৬ Ibid, 48 : ' He made it clear that it be a poor India, in which only Hindus or only Muslims flourished and the other community was left behind".

১০৭ ১৮৮৪ খ্রীঃ ২৭ জানুয়ারি গুরুদাসপুরে এক ভাষণে স্যার সৈয়দ আহ্মদ খানের বক্তব্য : Remember that the words Hindu and Mahomedan are only meant for religious distinction otherwise all persons, whether Hindu or Mahomedan or even Christians who reside in this country, are all in this particular belonging to one and the same nation." (Quoted from G. A. Natesan's 'Eminent Musalmans' by Anil Seal, op. cit., 319-320.

১০৮ ১৮৮৪ খ্রীঃ ২৮ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌর মুসলিম সমাবেশে স্যার সৈয়দ আহ্মদের ভাষণের অংশ : "Now, I ask you, have Mahomedans attained to such a position as regards higher English education, which is necessary for higher appointments as to put them on a level with Hindus or not ? Most certainly not. Now, I take Mahomedans and the Hindus of our province together, and ask whether they are able to compete with the Bengalis or not ? Most certainly not. When this is the case how can competitive examinations be introduced into our country. Think for a moment what would be the result if all appointments were given by competitive examination. Over all races, not only over Mahomedans but over Rajas of high position and the brave Rajputs who have not forgotten the swords of their ancestors, would be placed as ruler a Bengali who at sight of a table knife would crawl under his chair. There would remain no part of the country in which we should see at the tables of justice and authority any face except those of Bengalis. I am delighted to see the Bengalis making progress, but the question is—what would be the

result on the administration of the country ? Do you think that the Rajput and the fiery Pathan, who are not afraid of being hanged or of encountering the swords of the police or the bayenets of the army, could remain in peace under the Bengalis ? This would be the outcome of the proposal if accepted. Terefore if any of you—men of good position, Raises, men of middle classes, men of noble family to whom God has given sentiments of honour—if you accept that the country should grown under the yoke of Bengali rule and its people lick the Bengali shoes, then in the name of God : jump into the train, sit down and be off to Madras". Quoted in 'Political Awakening in India' edited by John R. Mclane (New Jersey, 1970) 44-45.

১০৯ Anil Seal, op. cit., 324 : "Syed urged them to stand aloof from Congress, which was a movement run by Bengalis for Bengalis."

১১০ "The Bengalee Babus now rule public opnion from Peshawar to Chittagong". Quoted from Sir Henry Cotton's 'New India' by Sir Surendrnath Benerjea, 'A Nation in Making, (Calcutta, 1963) 47.

১১১ S. N. Banerjea, op. cit., 72.

১১২ Ibid. 75 : Anil Seal, op. cit., 49.

১১৩ আবু জাফর শামসুদ্দীন : নওয়াব আবদুল লতিফের 'মুসলিম বাঙ্গালা ঃ আমার যুগে' গ্রন্থের ভূমিকা। (ঢাকা, ১৯৬৮), দুই।

১১৪ স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক মুহসিন উল মুলককে লিখিত পত্র। 'পত্রাবলী' প্রাগুক্ত ১৮।

১১৫ বিনয় ঘোষ, 'বাঙলার নবজাগৃতি' (কলকাতা, ১৩৫৫) ৯৮। এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন ইউরোপীয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বিষয়টির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১১৬ John R. McLane (ed.), op. cit., 46.

১১৭ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা, ১৯৭৫) ১।

১১৮ প্রাগুক্ত, ৫।

১১৯ Amit Sen, op. cit., 62 ; "In 1897 he [A. K. Dutta] protested against the rule of the congress being confined to the annual three days "tamasha".

১২০ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন', ৭৭।

.২১ প্রাগুক্ত।

১২২ রমেশচন্দ্র মজুমদাব, প্রাগুক্ত. ২৪।

১২৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খণ্ড (চতুর্থ-স ; কলকাতা, ১৯৭৭) ১৪৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ২২। Ram Gopal, 'Indian Muslims', 91.

১২৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ২৫। Abul Kalam Azad, 'India Wins Freedom', (Calcutta, 1959 4. Sufia Ahmed, op. cit., 236.

১২৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ২৬। Percival Spear, 'Oxford History of Modern India', (London, 1955), 315 : "The Hindu West was neatly balanced by the Muslim east."

১২৬ Sufia Ahmed, op. cit., 236 : "Besides these advantages the whole of the tea industry (with exception of the Darjeeling gardens) and the greater portion of the jute growing area would be brought under single administration".

১২৭ Ibid, 232.

১২৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ২৪।

১২৯ Hussainur Rahman, 'Hindu -Muslim Relations in Bengal', (Bombay, 1974), 16.

১৩০ S. N. Banerjea, op. cit., 171

১৩১ Ibid, 171.

১৩২ Ibid, 172.

১৩৩ Ibid, 172-73.

১৩৪ Ibid, 174.

১৩৫ B. B. Misra, 'The Indian Middle Class' (London, 1961) 395.

১৩৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ৩৪।

১৩৭ প্রাগুক্ত।

১৩৮ প্রাগুক্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' ৯৭। S. N. Banerjea, op. cit., 197.

১৩৯ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত ৩৩।

১৪০ Amalesh Tripathi, 'The Extremist Challenge' (Calcutta, 1967) XI : "The terrorist were all extremist, but not all extremists were terrorist".

১৪১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ৪০।

১৪২ প্রাগুক্ত, ২৮।

১৪৩ প্রাগুক্ত, ৩১।

১৪৪ Amit Sen, op. cit., 72.

১৪৫ Sufia Ahmed, op. cit., 248-49 : "Mahomedan Friend's Union Association in public meeting record firm but respectful protest against the proposal of partitioning Bengal as prejudicial to interest of Dacca Mahomedan Community and as seriously hampering them of many advantages, for example Mohsin fund". (The Muslim Chronicle, 30th January, 1904).

১৪৬ Ibid, 249 : "Amir Hossain, Secretary of the Central Muhammadan Association had been directed by the Committee to state that in their opinion a readjustment of the territorial limits of Bengal was neither necessary nor desirable. My committee are of opinion that no portion of Bengali-speaking race should be separated from Bengal without the clearest necessity for such separation and they think that in the present case such necessity does not exist".

১৪৭ Hussainur Rahman, op. cit., 29.

১৪৮ Sufia Ahmed, op. cit., 254-55 : "I may tell you at once that, it is not correct that the Mussalmans of Eastern Bengal, as

a body are in favour of the partition of Bengal. The real fact is that, it is only a few leading Mahomedans who for their own purposes, supported the measure. To suppert partition is to lay an axe at our feet ; for partition means an anormous cost and the people are not able to bear this heavy burden. (১৯০৬ খ্রীঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সভায় খাজা আতিকুল্লাহর ভাষণের অংশ) সুফিয়া আহমদ খাজা নাজিমুদ্দীন ও খাজা শাহাবুদ্দীনের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, খাজা আতিকুল্লাহ নাকি খাজা সলিমুল্লাহর সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন (২৫৬ পৃঃ)। পরে বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সভায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন (২৫৬ পৃঃ)। অবশ্য প্রথম দিকে খাজা সলিমুল্লাহও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য ঃ Ram Gopal. op. cit., 92.)

১৪৯ Amit Sen, op. cit., 75.

১৫০ একিনুদ্দীন আহমদ, "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ", 'নবনূর', আশ্বিন ১৩২২। উদ্ধৃত, মুস্তফা নূরেউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৯৭।

১৫১ প্রাগুক্ত। আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' (ঢাকা, ১৯৬৯) ৯৯।

১৫২ খায়েরন্নেসা, "স্বদেশানুরাগ", উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১০০।

১৫৩ Sufia Ahmed, op. cit., 248.

১৫৪ Hussainul Rahman, op. cit., 30.

১৫৫ Amit Sen, op. cit., 75.

১৫৬ মুস্তফা নূরেউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ২০২।

১৫৭ S. N. Banerjea, op. cit., 193 : "It was a self-denying ordinance.'

১৫৮ মোহাম্মদ আজিজুল হক, 'বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা [অনুবাদ] (ঢাকা, ১৯৬৯) ৪৯।

১৫৯ মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা, "স্বদেশী আন্দোলন", 'নবনূর', কার্তিক, ১৩২২। মুস্তফা নুরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৯৪-১৯৫।

১৬০ এবনে মাআজ, ' ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ও মুসলমান জাতির কর্ত্তব্য", ইসলাম-প্রচারক', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, মুস্তফা নুরউল ইসলাম প্রাগুক্ত, ০০।

১৬১ কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত। উদ্ধৃত, অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ২৫২-৫৩।

১৬২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত. ১:৬।

১৬৩ "জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ", 'ইসলাম-প্রচারক', ফাল্গুন, ১৩১৩. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৯৯।

১৬৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড। (কলকাতা, ১৩৬৮) ১৪৫।

১৬৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ১০৯।

১৬৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন', ২৭৫-৭৬।

১৬৬ Abul Kalam Azad, op. cit., "In those days the revolutionary groups were recruited exclusively from the Hindu Middle class. In fact all revolutionary groups were then actively anti-Muslim".

১৬৮ গণেশ ঘোষ, "ভূমিকা", অনন্ত সিংহের 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ', ২য় খণ্ড (২৪ পরগণা, ১৯৬৮) সাত।

১৬৯ মুজফফর আহমদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" (ঢাকা, ১৯৭৭), ৮৯।

১৭০ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, ২৫৩।

১৭১ মুজফফর আহমদ, প্রাগুক্ত, ৯১ ঃ "আমি কিন্তু ধর্মানুশাসিত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে দোষ দিইনা এই কারণে যে তার আগে মুসলমানরাও তো এই রকমই করেছিল। তাঁরাও চেয়েছিলেন মুসলিম রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।"

১৭২ Amit Sen, op. cit., 76.

১৭৩ Ram Gopal, op. cit., 100.

১৭৪ Ibid, 97.

১৭৫ Ibid, 102.

১৭৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ১৫৯।

১৭৭ Jogesh Chandra Bagal, "Congress in Bengal", Atul Chandra Gupta (ed.) Studies in the Bengal Renaissance (Calcutta, 1958) 181.

১৭৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ১৬৪।

১৭৯ প্রাগুক্ত, ১৭২।

১৮০ প্রাগুক্ত, ১৫৬।

১৮১ প্রাগুক্ত, ১৭৫।

১৮২ প্রাগুক্ত, ১৭৫। Joges Chandra Bagal, op. cit., 185.

১৮৩ "The Purport of this legislation was to empower the goverr-ment to arrest any and every person on suspicion and keep him in detentiou for an unlimited period". Jogesh Chandra Bagal, op. cit., 185.

১৮৪ Amit Sen, op. cit , 79.

১৮৫ শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, 'ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ' (ঢাকা, ১৯৭৭) ১৯২। এই গ্রন্থে খেলাফৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ফকীহর (মুসলিম আইনজ্ঞ) মতামত উদ্ধৃত করে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে।

১৮৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ১৮১।

১৮৭ প্রাগুক্ত, ১৮৬।

১৮৮ প্রাগুক্ত, ।

১৮৯ প্রাগুক্ত।

১৯০ প্রাগুক্ত, ১৮৬।

১৯১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১৬০।

১৯২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ১৮১।

১৯৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড (কলকাতা, ১৩৬৫) ৩৫৪।

১৯৪ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা", রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড (দ্বি-স, কলকাতা) ৪৭৩।

১৯৫ প্রাগুক্ত, ৪৭৫।

১৯৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সীতারাম" বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (সংসদ, সপ্তম-প্র, কলিকাতা, ১৩৮৪) ৮৭৬।

১৯৭ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "ভারতকলঙ্ক", প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড (সংসদ তৃ-মু, ১৩৭১) ২৩৯।

১৯৮ "Gandhi was a practical man. He saw that the khilafat question had created an unprecidented awakending amoug the Muslisms, am awakening which they prepared to pour into nationalism and into a struggle which would eventually

develop into a freedom Movement. The obvious aim of any practical politician would be to establish Hindu-Muslim unity, which India had not known since the Revolt of 1857; the alternative of rejecting the khilafat sentiment as a non-political religious affair and unworthy of association with the anti-British struggle whose ultimate aim was self-government, would mean creating schisms wider then ever known before". Ram Gopal, 'Indian Muslims'. 141.

১৯৯ "Nationalism and a vague but intense country-wide idealism sought to bring together all these various, and sometimes mutually contradictory, discontent, and succeeded to a remarkable degree. And, yet this nationalism itself was a composit force, and behind it could be distinguished a Hindu nationalism, a Muslim nationalism partly looking beyond the frontiers of India, and what was more in consonance with the sprit of the times, an Indian nationalism. For the time being they overlapped and all pulled together. It was Hindu-Musalman-ki Jai everywhere. It was remarkable how Gandhiji seemed to cast a spell on all classes and groups of people and draw them into one motley crowd struggling in one direction". Jawaharlal Nehru, An. 'Autobiography,. (Indian ed., New Delhi, 1962) 75.

২০০ শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, ৭৪।

২০১ Yahyah ArMazani, op. cit., 273.

২০২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ১৮১।

২০৩ প্রাগুক্ত, ২৪১।

২০৪ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ৩১১।

২০৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ২৪২।

২০৬ প্রাগুক্ত।

২০৭ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ৩১১।

২০৮ প্রাগুক্ত, ৩৩২।

২০৯ প্রাগুক্ত, ৩১১।

২১০ প্রাগুক্ত, ৩১৩।

২১১ প্রাগুক্ত।

২১২ প্রাগুক্ত, ৩১৭।

২১৩ প্রাগুক্ত, ৩১৯-৩২০।

২১৪ প্রাগুক্ত, ৩২০।

২১৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ৩২৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ এক ॥

মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে।[১] এই বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে কতিপয় অনুশাসনেরই ফল—যা ইসলামের আদিযুগ থেকে চলে আসছিলো। কিন্তু ইসলাম ধর্মের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নপ্রকার প্রশাসনিক জটিলতার দরুণ এতে নতুন নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকেই এই রদবদলের সূচনা।[২] এই সময় রাষ্ট্র ও সমাজের অভ্যন্তরে আরবদের প্রাধান্য ও বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও[৩] চারিদিকের বিজয়াভিযান তাকে সহঅবস্থানে বাধ্য করে এবং কখনো কখনো স্থানীয় লোকাচার ও সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করে। এজাতীয় আপোষ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাকে করতে হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিভক্তি এই আপোষেরই ফল।[৪] অবশ্য এই আপোষ অনেকাংশেই স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে সংগঠিত হয়েছে। একারণে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

পরবর্তীকালে যেসব স্থানে ইসলামের প্রভূত সংস্কার সাধিত হয় তার ভেতর ইরানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫] ইরানের প্রভাবে বলীয়ান হয়ে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে এবং "এশিয়ার মুসলিম সভ্যতার ক্লাসিকাল মডেল হিসাবে মধ্যযুগীয় ভারতে অনুকৃত হয়ে অপ্রতিহত বিজয়াভিযান চালিয়ে যায়।"[৬] ভারতের বিশাল জনসংখ্যার সাথে ইসলাম ধর্ম বা সমাজের তেমন কোন সম্পর্কই ছিলো না। এখানে এসে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে তাকে কাজ চালাতে হয়। এজন্য তাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করতে হয় সমন্বয় ধারা।

ইসলাম ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ব্যাপক গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে তার আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপক ধর্মান্তরণের কাজ চলে। এই ধর্মান্তরণের পেছনে একদিকে যেমন শাসক ও ধর্মপ্রচারকদের ভয়ভীতি ও জবরদস্তি কার্যকর ছিলো[৭] তেমনি ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাবও এক্ষেত্রে প্রচুর জলসিঞ্চন করেছে।[৮] কারণ "ইসলামের মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধ মানুষে মানুষে সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৯] তবু এত কিছু সত্ত্বেও সম্রাট আকবরকে (১৫৪২-১৬৩৫) যেমন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সমন্বয়ের প্রয়োজনে নতুন ধর্ম চালু করতে হয়েছে,[১০] তেমনি সম্রাট ঔরঙ্গজীবকে (১৬১৮-১৭০৭) ধর্মীয় অনুশাসনে আরো ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি প্রদান করার জন্যে এমন সব কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে যা পরবর্তীকালে মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিশুদ্ধ টলিয়ে দিয়েছিলো।[১১] এসবই ইসলামের প্রভাবপ্রতিপত্তির স্বাক্ষর।

সর্বভারতীয় পর্যায়ে ইসলামের এই রূপ বঙ্গদেশেও পড়বে তা স্বাভাবিক। তবু এখানে ইসলামের চেহারা তুলনামূলকভাবে ভিন্নরূপ। কারণ এখানেই ইসলামকে সর্বাধিক আপোষের ভেতর দিয়ে প্রসার লাভ করতে হয়েছে।[১২]

ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি ১২০২ খ্রীঃ[১৩] প্রথম রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করেন। তখন থেকেই বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আধিপত্যের সূচনা হলেও মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরা বহু পূর্বে বঙ্গদেশে এসেছিলেন[১৪] রাজশাহির পাহাড়পুরে খলিফা হারুন অল রশীদের (৭৮৬-৮০৯) সময়ের একটি মুদ্রাপ্রাপ্তি প্রমাণ করে যে, তার আগে কোন কোন আরব বণিকের পক্ষে ব্যবসা উপলক্ষ্যে এই দেশে আসা সম্ভব।[১৫] ব্যবসা উপলক্ষ্যে আরবেরা সর্বপ্রথম সম্ভবত চট্টগ্রামেই পদার্পণ করেন।[১৬] অতএব এদেশে মুসলমানদের অভিযান ত্রিমুখী—ব্যবসাবানিজ্য, ধর্মবিস্তার ও রাজ্য-

বিস্তার। এই কারণেই এই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি।

বঙ্গদেশে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণ কি এ নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। প্রথমদিকে এর কারণ হিসেবে ব্যাপক ধর্মান্তরণকে দায়ী করা হতো এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচার করা হতো যে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বংশধর।[১৭] শুধু বঙ্গদেশে নয়, মধ্যযুগীয় ভারতের মুসলমানদের একটা বিরাট অংশও নবদীক্ষিত মুসলমানদের বংশধর।[১৮] কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাবের নায়েব খোন্দকার মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি প্রথম এই প্রসঙ্গে বিতর্ক উত্থাপন করেন তাঁর 'দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি দাবি করেন যে অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানই পাঠান-মোঘল বংশোদ্ভূত।[১৯] তবু একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বহিরাগত বলে দাবিদার মুসলমানদের অনেকেই যেমন রাজা-রাজপুরুষদের সঙ্গে আগত ফকির দরবেশদের দ্বারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তেমনি অনেকে এদেশে এসে বাঙালী মহিলা বিয়ে করেছেন[২০] এদের ক্ষেত্রে ফকির-দরবেশদের প্রভাব কম নয়। তবু বাঙালী মুসলমানদের বেশির ভাগই যে ধর্মান্তরিত নিম্ন-বর্ণের হিন্দু এখানে কোন সন্দেহ নেই। এদের অনেকেই বংশাক্রমিক বৃত্তি যেমন পরিত্যাগ করেননি,[২১] তেমনি তাঁরা নিজেদের "আচার-বিচার ও ধর্মবিশ্বাস"ও ছাড়তে পারেননি।[২২] একারণে এসব মুসলমান সর্বদাই সামাজিকভাবে আত্মীয়তা অনুভব করতেন হিন্দুদের সঙ্গে। ফলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রেই হিন্দুদের অনুকরণ করতে থাকেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে (১৮৯৫) খোন্দকার মোহাম্মদ ফজলে রাব্বির এই গ্রন্থের ফলে মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণীচেতনার উদ্ভব হয়।[২৩] তাঁরা অনুভব করতে থাকেন, তাঁদের ধমনীতে যে রক্তধারা প্রবাহিত, তার সাথে সাধারণ রক্তধারার কোন মিল নেই। অতএব তাঁরা নিজেদের উচ্চবর্ণের মুসলমান বলে গণ্য করতে থাকলেন।

কিন্তু তাঁরা মনে করলে তো শুধু হবে না। সমাজে যে অবহেলিত শ্রেণী রয়েছেন তাঁদের অস্তিত্ব তো অস্বীকার করা যায় না। এই বাস্তব সত্যটি তাঁদের একটা দ্বন্দ্বের ভেতর নিক্ষেপ করে। এই দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ ফল হলো মুসলিম সমাজে উচ্চ ও নীচ ভাব। ফলে সবাই রাতারাতি নিজেদের পশ্চিমদেশীয় মুসলমানদের বংশধর বলে দাবি করতে থাকেন। "কোন মস্তবড় পীর, কোন্ বিখ্যাত মওলানা, কোন্ সৈয়দ বা কোন্ কোরেশ বংশের সঙ্গে তাঁদের রক্তের যোগ রয়েছে তাই উল্লেখ করে তাঁরা নিজেদের বংশকৌলিন্য ঘোষণা করেন।'[২৪] এই ধারণার সঙ্গে তাঁরা এমনও চিন্তা করতে থাকেন যে, যেসব মুসলমান এখন হীন ও অধঃপতিত হয়ে আছেন তাঁরাই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বংশধর। অতএব মুসলমান সমাজেও তাঁরা অপাংক্তেয় হয়ে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানদের ভেতর শ্রেণীচেতনার সূচনা হয়েছে মোঘল আমল থেকেই।[২৫] তবে তখন এই চেতনার পেছনে একটা অবস্থানগত অহমিকা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তাহলো শাসকের জাত হিসেবে স্বাভাবিক উচ্চমন্যতা—যাকে আজকের শ্রেণীচেতনার সঙ্গে তুলনা করা চলে। অবস্থানের গুণে তাঁরা নিজেদের দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং সেই ধারা অনুসরণ করে তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরাও নিজেদের সমাজের মধ্যে সবার উপরে বলে ধারণা করতেন। এই শ্রেণীর মুসলমানেরা নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের পদবীর সাহায্যে তাঁদের পরিচয় প্রদান করতেন। তাঁদের আয়ের একটা বিরাট উৎস ছিলো লাখেরাজ সম্পত্তি এবং শ্রেণীগুণে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে।[২৬] ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই শ্রেণীর মূলে কুঠারঘাত হানে।[২৭] রাজস্ব বিভাগে হিন্দুপ্রাধান্য আগে থেকেই ছিলো। সেই প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করে তাঁরা রাতারাতি মুসলমানদের স্থানচ্যুত করে ফেলেন।[২৮] ফলে তাঁদের জীবনে নেমে আসে দুঃসহ দারিদ্র্য। স্যার উইলিয়াম

হাণ্টার (১৮১০-১৯০০) তাঁর 'আওয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থে অত্যন্ত করুণভাবে এই স্বর্গচ্যুতির বিবরণ প্রদান করেছেন। এঁদের সম্পর্কেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন, গতকাল যাঁদের পক্ষে দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিলো, আজ তাঁদের পক্ষে ধনী হওয়া অসম্ভব।[২৯] এই শ্রেণীর লোকের দরিদ্রে পরিণত হওয়ার আরেক কারণ হলো মুসলিম উত্তরাধিকার আইন (ল অব ইনহেরিট্যান্স)।[৩০] এই আইনের ফলে সম্পত্তি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এই শ্রেণী মুসলিম সমাজজীবনে যে উত্থান-পতন ও আলোড়ন সৃষ্টি করে তা খুবই কৌতুকাবহ।

॥ দুই ॥

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই হিন্দু-মানসে জাগরণ ও সমাজ-সচেতনতার সূচনা হয়। এই জাগরণের তিনটি ধারা রয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন, এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা। এই তিনটি ধারা বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজকে গভীরভাবে আলোড়িত করে—যার প্রভাব সমকালীন মুসলিম-মানসে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

১.

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয়েছে বেসরকারী পর্যায়ে—ইংরেজি ভাষায় কথোপকথনের মাধ্যমে ইংরেজের সংস্পর্শে আসা এবং তার অধীনে চাকরীবাকরী লাভই যার মূল উদ্দেশ্য[৩১] সরকার প্রথমদিকে ইংরেজি শিক্ষার বদলে প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের প্রতিই বেশি গুরুত্বপ্রদান করেছিলেন।[৩২] কিন্তু হিন্দু সমাজের ভেতর থেকেই এ সম্পর্কে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালিত হয়। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এবং অন্যান্য বহু হিন্দু মনীষী পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রচেষ্টা চালান। ১৮১৭ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ

করে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫ ১৮৪২) ও রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) প্রচলিত ভার্ণাকুলার স্কুলগুলোর উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা চালান।[৩৩] ১৮২৩ খ্রীঃ ৩১ জুলাই লর্ড আমহার্ষ্ট 'পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন কমিটি' (জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন) গঠন করেন।[৩৪] এই সময় (১১ ডিসেম্বর, ১৮২৩) রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষার দাবি জানিয়ে লর্ড আমহার্ষ্টকে তাঁর বিখ্যাত পত্রখানা লেখেন[৩৫] এই উপলক্ষ্যে শিক্ষা নিয়ে তখন যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাই এ্যাংলিসিষ্ট-ওরিয়েন্টালিষ্ট বিতর্ক নামে পরিচিত। এই বিতর্কে দুটো বিষয়ের প্রতি গুরুতরভাবে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। তাহলো, সাধারণ মানুষের শিক্ষা এবং মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার স্বীকৃতি[৩৬] এরপরই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের এক আদেশবলে ১৮৩৫ খ্রীঃ সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজি স্বীকৃতি লাভ করে।[৩৭] ১৮৩৫ খ্রীঃ ১ জুলাই ও ২৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ খ্রীঃ ২৮ এপ্রিল উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে জনশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন।[৩৮] প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত প্রদানই ছিলো এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।[৩৯] তিনি প্রচলিত জনশিক্ষার উপর ভিত্তি করেই জাতীয় শিক্ষাসৌধ গড়ে তুলবার প্রস্তাব করেন।'[৪০] কিন্তু অ্যাডামের প্রস্তাব বাস্তবে কার্যকর হয়নি। এরপর জনশিক্ষার ব্যাপারে ফ্রেডরিক হ্যালিডে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চেষ্টা চালান। কিন্তু এঁদের প্রচেষ্টায় জনশিক্ষার কথা থাকলেও শিক্ষার বাহন হিসেবে বাঙলার কথা তেমন প্রতিধ্বনিত হয়নি[৪১] —যদিও এঁদের অনেকেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে ডিরোজিওর শিষ্যদের ভেতর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের একটা প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিলো এবং তাঁরা সেভাবে প্রচারণাও চালিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেরই মাতৃভাষা চর্চায় সুনাম অর্জন তার

প্রমাণ। ভার্ণাকুলার এডুকেশন অবহেলিত হওয়া যে এদেশবাসীর পক্ষে ভালো নয় একথার প্রতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনও বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[৪২]

এরপর ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৪ আগষ্ট রেভারেণ্ড লঙ গভর্ণর জেনারেল স্যার জন লরেন্সের নিকট একটি নোট প্রেরণ করেন। তাতে ভার্ণাকুলার এডুকেশনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় এবং মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।[৪৩] এই রিপোর্টে রেভারেণ্ড লঙ বঙ্গদেশের গোটা সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। তিনি সরকারী স্কুল কলেজের ছাত্রদের বেতন বাড়িয়ে সেই অর্থে ভার্ণাকুলার এডুকেশনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ প্রদান করেন।[৪৪] কিন্তু শিক্ষিত ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা এর বিরোধিতা করেন।[৪৫] উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,[৪৬] মানিকতলার রাজেন্দ্রলাল মিত্র,[৪৭] বৃটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর[৪৮] প্রমুখ এই বিরোধীদের ভেতর অন্যতম। এভাবে শিক্ষিত ও বিত্তশালী হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে ভার্ণাকুলার এডুকেশন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের ভেতর শিক্ষার আলো বিতরিত হয়নি। তবে ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট শিক্ষিত শ্রেণী (এ্যালিট) গড়ে ওঠে—যাঁরা পরবর্তীকালে বিভিন্নপ্রকার সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

২.

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজ একযোগে পরিচালিত হয়েছিলো। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রীঃ "অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কারপ্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি" নিয়ে তাঁর 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন।[৪৯] রাজা উদার মানসিকতায় প্রায় সব ধর্মের প্রভাব স্বীকার করেছেন, সব ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন, সমালোচনা করেছেন এবং অবস্থাবিশেষে গ্রহণ-বর্জন করেছেন,[৫০] কিন্তু তিনি নিজেকে কোনদিন একটি নতুন ধর্মের

প্রবর্তক হিসেবে দাবি করেননি।[৫১] এই সভা মূলত নতুন ধর্মান্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। তিনি ১৮৩৯ খ্রীঃ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন। এর পেছনে বহুলাংশে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিই কাজ করেছে।[৫২] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রাহ্ম ধর্মের বিকাশে কেশবচন্দ্র সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৫০ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ১৮৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সমাজের আচার্যের পদে বহাল থাকেন। কিন্তু এই ধর্মে অচিরেই একটা মতভেদের সূচনা হয়। ১৮৬৪ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র সেনের দল 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়ে নতুন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহর্ষির দল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। এখান থেকেই ব্রাহ্মসমাজের সাথে হিন্দুধর্মের মৌলিক পার্থক্যের সূচনা। কেশবচন্দ্র সেনের দল ব্রাহ্মবিবাহবিধিকে কেন্দ্র করে নিজেদের হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন[৫৩] এবং সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক প্রবন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, "হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার মাত্র মনে করি"।[৫৪] কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন বেশিদিন এই মনোভাব অটুট রাখতে পারেননি। প্রখর ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক ঐতিহ্যবোধ তাঁর এই মনোভাবকে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়।[৫৫] এর ফলেই ১৮৭৭ খ্রীঃ সৃষ্টি হলো 'নববিধান'। অবশ্য পরবর্তীকালে যেভাবেই হোক না কেন[৫৬] হিন্দুমতে কন্যার বিয়ে দিয়ে[৫৭] কেশবচন্দ্র ধর্মের গোটা ভিত্তিটাতেই আঘাত দিয়ে বসলেন। কিন্তু তিনি সেই প্রতারণার কথা স্বীকার না করায় সমাজ আবারো ভেঙ্গে যায়।

"উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে সনাতন হিন্দুধর্মের ঘোরতর দুদিন।"[৫৮] একদিকে যুক্তিবাদের প্রাবল্যে এই ধর্ম ভেসে যাচ্ছিলো,

অন্যদিকে এই ধর্মের অনুসারীরা সমাজের বিত্তবান হিসেবে এমনসব কদাচারে লিপ্ত ছিলেন যে তাঁদের কোন দিক দিয়েই আদর্শ পুরুষ বলা যায় না। এঁরা মুখে সনাতন ধর্মের বুলি আওড়াতেন সত্য, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অধর্মের চূড়ান্ত করতেন। পূজার সময় সাহেবদের খুশী করার জন্যে পরিবেশিত হতো নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়।[৫৯] এমন কি এসব অনুষ্ঠানে বাঈজীও আমদানী করা হতো[৬০] এসব রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আচরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'কলকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫); প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮); কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পঁ্যাচার নকশা'(১৮৬১) জাতীয় গ্রন্থে। তাঁরা ধর্মের নামে হিন্দু সমাজের এজাতীয় আচরণকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলেছেন।

১৮৩০ খ্রীঃ ১৭ জানুয়ারী এঁদের উদ্যোগে 'ধর্ম্মসভা' স্থাপিত হয়। এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য 'সতীদাহ প্রথা-বিরোধী' আইনের বিরুদ্ধে আপীল করা[৬১] এই আপীলে ধর্ম্মসভা পরাজিত হয়ে নিজেদের কাজ আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে সীমিত করে ফেললো।[৬২] ফলে এই সভা শেষপর্যন্ত কিছু অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। রক্ষণশীল দলের নেতা হিসেবে রামকমল সেন, রাজা রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের ভেতর রাজা রাধাকান্ত দেবই সর্বাপেক্ষা কর্মঠ ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্ববিরোধিতা তাঁর মজ্জাগত।

৩.

এ দুটি পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে নব্যবাঙলার মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনও দানা বেঁধে ওঠে। নব্যবাঙলার যে আন্দোলন সমস্ত বাঙালীর মন মানসকে একটা অপরিসীম সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে দিয়েছিলো তার প্রবর্তক হলেন হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯

-১৮৩১)। তিনি "বঙ্গের নবযুগের প্রবর্ত্তক।"[৬৩] সমস্ত বঙ্গদেশ যখন প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাতে বিভিন্নপ্রকার বিকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন "ইয়ং বেঙ্গল দল তাঁর কাছে নবযুগের নতুন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন। ভোজসভার নাচ গান-হল্লা থেকে দূরে পটলডাঙার কলেজগৃহে, ডিরোজিওর বৈঠকখানায়, বেকন-লক-হিউমের জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন নিয়ে বিতর্কসভা বসছে।"[৪] বাবু সংস্কৃতি যখন জৌলুসের উত্তুঙ্গে তখন ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদান করেন (১৮২৬) এবং তাঁর ভাবধারায় কলেজের ছাত্রদের প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে যেসব ব্যক্তি নব্যবাঙলার এই আন্দোলনকে গভীরতা ও সজীবতা প্রদান করেছিলেন তাঁরা বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত। তাঁরা সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে নিজেদের নিয়োজিত করলেন। বিদ্যানুশীলন ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা বুদ্ধিকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি প্রদান করে সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করলেন। এজন্যে আমাদের সমাজসংস্কৃতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অসামান্য। একালের প্রতিটি বুদ্ধিজীবী এঁদের সম্পর্কে সচেতন। কারণ "বাঙলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁরা ধূমকেতু নন, আশ্চর্য জ্যোতিষ্ক। এঁদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা ও বৃটিশ র‍্যাডিকেলদের ধারণা একসঙ্গে জ্বলে উঠেছিল।"[৬৫] এই কৃতিপুরুষবৃন্দ সে যুগে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা বিস্ময়কর। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা কোন বিশেষ ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন না। এঁদের ভেতর মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮০৩-১৮৫৮) বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন,[৬৬] তেমনি শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০) বা রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮) ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৬৭] অনুরূপ প্যারীচাঁদ মিত্রও (১৮১৩-১৮৮৩) শেষজীবনে "থিয়োসফির দিকে ঝোঁকেন এবং

পিতামহ গঙ্গাধর প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দিরের বিগ্রহ-সেবায়" আত্মনিয়োগ করেন।[৬৮] এছাড়া দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৮৯৫), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮) প্রমুখ শেষপর্যন্ত সনাতন হিন্দুধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে একমাত্র রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০) শেষপর্যন্ত যুক্তির পথে অবিচল ছিলেন।[৬৯]

৪.

ঊনবিংশ শতাব্দীর যেসব সংস্কার আন্দোলন হিন্দুমানসে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে সেগুলো হলো সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথাবিরোধী আন্দোলন, এবং স্ত্রীশিক্ষা।

হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসলেও বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই প্রথা ব্যাপক রূপ লাভ করে।[৭০] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গদেশের চারিদিকে এই প্রথা ছড়িয়ে পড়ে। তবে কলকাতার আশে পাশেই সর্বাধিক সহমরণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।[৭১] সতী হওয়ার পেছনে যেসব কারণ প্ররোচনা যোগাতো সেগুলো হলো অক্ষয় স্বর্গলাভ[৭২], বংশমর্যাদা রক্ষা, স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধার করার বাসনা, নিকৃষ্ট জীব হয়ে জন্মগ্রহণ করার আশঙ্কা[৭৩] ইত্যাদি। এছাড়া কিছু সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণও কাজ করতো। সগুলো হলো, বৈধব্যযন্ত্রণা, ভরণ-পোষণের সমস্যা, বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার[৭৪] ইত্যাদি। অনেক সময় অর্থপ্রাপ্তির লোভে ব্রাহ্মণেরাও বিধবাদের সহমরণে প্ররোচিত করতেন অথবা বৃদ্ধ স্বামীরা স্ত্রীর কাছ থেকে সহমরণের অঙ্গীকার আদায় করতেন।[৭৫] এসব কারণে কখনো কখনো জোর করে স্ত্রীদের সহমরণে বাধ্য করা হতো। তারা যাতে পালাতে না পারেন সেজন্যে হাতপা বেঁধে চিতায় তোলা হতো।[৭৬] অনেক সময় বহু সতী অসহ্য যন্ত্রণায় চিতা

থেকে পালিয়ে যেতেন, অথবা চিতা দেখে ভয়ে সতী হতে অস্বীকার করতেন।[৭৭] কখনো কখনো কেউ নির্জলা আকর্ষণের জন্যে অথবা প্রেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে সতী হতেন এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে।[৭৮] গর্ভবতী, অল্পবয়স্কা অথবা ভরণপোষণে অক্ষম শিশুর মাতা সতী হবার যোগ্য নন, বা কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে সহমরণের জন্যে উত্তেজিত করাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ[৭৯]

সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্যে বহু চেষ্টা চলেছে। সুলতানী আমলে কোন কোন শাসক এই প্রথা নিষিদ্ধকরণে সচেষ্ট ছিলেন।[৮০] মধ্যযুগে সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর এই প্রথা বিলোপ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।[৮১] আধুনিক যুগে ১৮০৫ থেকে ১৮২৯ খ্রীঃ পর্যন্ত এই প্রথা নিয়ে বহু আলোচনা-সমালোচনা হয়। লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড হেষ্টিংস, লর্ড আমহার্ষ্ট প্রমুখ এই প্রথার বিরুদ্ধে নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেন। এঁদের সময় বিভিন্নস্থানে জোর করে সতী করার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা চলে। এছাড়া রাজা রাম-রায়ের নেতৃত্বে এই প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সংগঠিত হয়। অবশেষে ১৮২৯ খ্রীঃ ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অন্য-দিকে রক্ষণশীলদের তরফ থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্যে 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই আইনের বিরুদ্ধে বিলেতে আপীল করা হয়। কিন্তু সে আপীলও অগ্রাহ্য হয়ে যায় (১৮৩২)।

বিধবা বিবাহ কখন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বলা কঠিন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজের উপর তলার লোকদের ভেতর বিধবা বিবাহ অল্পবেশি চালু ছিলো।[৮২] পুরাণে এবং বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে তার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমন কি বাঙালীর চিরপরিচিত মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতেও তার নজির

দুর্লভ নয়।[৮৩] অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে মুসলিম অভিযান সংগঠিত হয় এবং সম্ভবত তখন থেকে উচ্চবর্ণের ভেতর বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত কড়াকড়ি বেড়ে যায়। প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী আল বেরুনি একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজে এই প্রথার কড়াকড়ি লক্ষ্য করেছেন।[৮৪] তথাপি সমাজের কাছে যাঁদের কোন জবাবদিহি করতে হয় না, তাঁরা কখনো কখনো প্রয়োজনে পারিবারিক গণ্ডিতে বিধবা বিবাহ প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন।[৮৫] ১৭৫৬ খ্রীঃ রাজা রাজবল্লভ তাঁর বিধবা কন্যার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি।[৮৬] উনবিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলন আরো জোরদার হয় এবং অলোকসামান্য ব্যক্তিপ্রতিভা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে অনেকের এই আন্দোলনে যোগদান করার কারণ যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তনের ফল তা একপ্রকার জোর করে বলা যায়। কারণ তার আগেই রাজা রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা এবং নব্যবাঙলার বিদ্রোহীদের মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রসার সমগ্র সমাজ-জীবনে নানাপ্রকার জটিল সমস্যার ঝড় তুলেছিলো। এই ঝড়ের মুখে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক এবং এর ন্যূনতম প্রকাশের স্বাক্ষর। কারণ এর চেয়ে জটিল সমস্যা তখন এই যুবকদের পদতলে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছিলো। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত মনোভাব জানা না গেলেও[৮৭] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি।[৮৮] মহর্ষির এজাতীয় দ্বিধাজড়িত মনোভাব উপবীত ত্যাগের সময়ও লক্ষ্য করা গেছে।[৮৯]

১৮৫৪ খ্রীঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁর অক্লান্ত কর্মপ্রেরণার ছোঁয়া পেয়ে এই আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করে এবং পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লোক তাঁকে উপন্যাসে মূর্খ বললেও[৯০] তাঁর সংস্কার

আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৯১] সম্ভবত এই প্রতিভা সম্পর্কে সকলেই সচেতন ছিলেন। কারণ সমসাময়িক কালে এমন কোন সমস্যা ছিলো না, যার প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। একারণে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিলো রূপকথার মতো। "শিক্ষিত সমাজ বিদ্যাসাগরের ভাষা অথবা জীবনের কোন প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন।"[৯২] বিদ্যাসাগরের এই সমর্থন শুধু শহরের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিলো।

অবশেষে ১৮৫৬ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসীর আমলে 'বিধবা-বিবাহ আইন' পাশ হয়। কিন্তু আইন ও সামাজিক অনুশাসন সর্বদা এক ধারায় চলেনা। এর ভেতর মাঝেমধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং সেই বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট আইনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উপর। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার পর তার কার্যকরিতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠলো, প্রশ্ন ওঠলো এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে লিখিত হতে থাকলো নাটক-প্রহসন-কবিতা ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর নিজে এজাতীয় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে লিখতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্য যা দান করে গেছেন তা অপরিশোধ্য।[৯৩]

অবশেষে তাঁকেই এই আইন কার্যকর করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো। যার ফল এদেশে সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ সংগঠন। বিনয় ঘোষ এই দিনটিকে "বাংলার ও ভারতের সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে স্মরণীয়" বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৪] বিধবা বিবাহ কার্যকর করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।[৯৫]

বহুবিবাহ প্রথার জন্যে মূলত দায়ী কৌলিন্য প্রথা। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথা[৯৬] সমাজজীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো তার জের উনবিংশ শতাব্দীর শেষনাগাদ সক্রিয় ছিলো। রাম-

মোহন পন্থী, ইয়ং বেঙ্গলসহ সাধারণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সবাই এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় কুলীন মেয়ে উদ্ধারের নামে কোন্ ব্রাহ্মণ কতজন বিয়ে করেছেন তারও তালিকা জনসমক্ষে প্রচারিত হয়েছিলো।[৯৭] যেসব মনীষী বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা হলেন রমাপ্রসাদ রায় (১৮১৭-১৮৬২), রেভারেণ্ড, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। এছাড় বহু পত্র-পত্রিকাও এই আন্দোলনের সপক্ষে লেখনী পরিচালনা করেন। সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বহু আবেদন পেশ করা হয়। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিপ্লবের ফলে সরকার এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে উৎসাহী বা সাহসী হয়নি।[৯৮]

স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তখন ব্যাপক আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন রক্ষণশীল বলে কথিত রাজা রাধাকান্ত দেব। এছাড়া ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) ১৮৪৮ খ্রীঃ বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে এসে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন এবং 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' (১৮৪৯) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখ্যপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) প্রমুখ।[৯৯]

॥ তিন ॥

১৮৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের চেয়ে বেশি ছিলো।[১০০] কিন্তু ১৮৮১ খ্রীঃ মুসলমানের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বেড়ে যায়।[১০১] এরপর থেকেই এদেশে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা চলে এবং মুসলমানদের ভেতর শ্রেণীচেতনার সূত্রপাত হয়—যার মূলে রয়েছে খোন্দকার ফজলে রাব্বির একটি গ্রন্থ একথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান

সমাজে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিলো তার জের চলতে থাকে দীর্ঘকাল। এই অর্থ নৈতিক বিপর্যয় মুসলিম সমাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করে ফেলে। একদিকে অর্থ ও শিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত মুসলিম-সম্প্রদায়—যাঁদের অনেকে নিজেদের বংশমূল ভুলে গিয়ে অর্থের জোরে 'আশরাফ' শ্রেণীভুক্ত হতে চেষ্টা করেন, অপরদিকে দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণ 'আতরাফ' হিসেবে সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েন। অনেকক্ষেত্রে এই শ্রেণীভুক্তি চলে মিথ্যা দাবির উপর—যেকথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। অর্থশালী আতরাফেরা অর্থের বিনিময়ে আশরাফ শ্রেণীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের 'আশরাফ' বলে দাবি করতে থাকেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ 'নবাব' পরিবারের উত্থান এইভাবেই হয়েছে। ঢাকার নবাব 'খাজা'[১০২] আলিমুল্লাহ যেদিন থেকে নিজেকে 'আশরাফ' মুসলমান হিসেবে পরিচয় প্রদান করার ব্যবস্থা করলেন, সেদিনই ঢাকার প্রকৃত 'আশরাফ' বলে পরিচিত "শহরের সেরা আমীর" মীর কুতুবউদ্দীন তাঁর বিষয়সম্পত্তি জলের দামে বিক্রি করে ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।[১০৩] আশরাফ শ্রেণীতে উত্তরণের এই প্রচেষ্টা অধিকতর কার্যকর হয় শহরে।[১০৪] কারণ শহরের সামাজিক গণ্ডি এত সীমিত যে তাদের আবিষ্কার করাই অনেকক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়তো। পক্ষান্তরে গ্রামে সবাইকে বেঁচে থাকতে হতো সমাজকে কেন্দ্র করে—যেখানে সবাই পরস্পরের নাড়ীনক্ষত্র সম্পর্কে পর্যন্ত অবহিত।

এই শ্রেণীভেদ প্রথার সঙ্গে হিন্দুদের শ্রেণীভেদ প্রথার পার্থক্য মৌলিক। মুসলিম সমাজে এই শ্রেণীবিভক্তি ইসলামের আদিযুগ থেকেই চলে আসছে—যা হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর কোরেশ-দের ভেতর খেলাফৎ সীমাবদ্ধ থাকার দাবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।[১০৫] মুসলমানদের এই শ্রেণীভেদ প্রথার ভিত্তিমূল অর্থ-নৈতিক বৈষম্য, হিন্দুদের মতো রক্তের বিশুদ্ধতা নয়। একারণে

হযরত মোহাম্মদও এজাতীয় বিভাগ অনুমোদন করেননি। ফলে তিনি 'রযীল' শব্দের স্থলে 'জঈফ' ব্যবহার করতেন।[১০৬] তবে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদনীতি অনেকক্ষেত্রেই এই প্রথার মূলে জলসিঞ্চন করেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

এই সময় মুসলমানদের ভেতর শিক্ষার আলো পৌঁছুতে শুরু করেছে। ফলে তাঁরাও হিন্দুদের অনুকরণে বিভিন্ন প্রকার সংস্কার-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় যেসব সমস্যা নিয়ে বাঙালী মুসলমানেরা সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন সেগুলো হলো অবরোধ প্রথা, নারীর সমানাধিকার, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহ উৎসবে ব্যয়-বাহুল্য, পণপ্রথা, তালাক, পরিবার-পরিকল্পনা, এবং ধর্মীয় কুসংস্কার।

পর্দাপ্রথা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলে। কেউ কেউ এই প্রথাকে নারী সমাজের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেন এবং তাঁরা মনে করেন "অন্তঃপুর বাসে তাহাদের মর্য্যাদা ও সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বাজারাদিতে বা বাহিরের শ্রমসাধ্য কার্য্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহা করিতে হয় না।"[১০৭] কেউবা যুক্তির সাহায্যে প্রথাটিকে উপস্থাপিত করেছেন এবং বর্তমান অবস্থার আলোকে তাতে খানিকটা সংস্কারের পরামর্শ প্রদান করেছেন।[১০৮] কেউ অন্যান্য মুসলিম দেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে এই প্রথাকে হিন্দুদের প্রভাব বলে বর্ণনা করেছেন,[১০৯] আবার কেউবা অযৌক্তিক-ভাবে এই প্রথাটিকে কঠোর ব্যঙ্গে জর্জরিত করে তুলেছেন।[১১০] একজন লেখক এই প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং মুসলমান বলে 'পরিচিত' সবাইকে "এই অনিষ্টকর অবরোধ প্রথা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর" হতে আহ্বান জানিয়েছেন।[১১১] জনৈক সম্পাদকের মতে "এছলাম মুছলমানকে পর্দ্দা

সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়াছে এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার আদেশ ও আদর্শ হইতে আমরা স্ত্রীলোকদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখার কোন প্রমাণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও—আজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। ···ভারতবর্ষের বাহিরে আর কুত্রাপি এই শ্রেণীর জল্লাদী পর্দ্দার প্রচলন নাই।"[১১২] এই ক্ষেত্রে মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই যুক্তিসঙ্গত ও উদার। তিনি মনে করেন "অবরোধের বাহির হইলেই নারীর চরিত্রে পতন হয় এ বিশ্বাস যেমন আমরা করি না, তেমনি এবিশ্বাসও আমাদের নাই যে, আমাদের নারীগণ মাঠে ময়দানে, রেলে ষ্টিমারে ও থিয়েটারে বাইস্কোপে ছুটাছুটি করিযা বেড়াইলেই মুছলমান দিন দিন দুই চারি হাত উঁচু হইয়া যাইবে"[১১৩] কেউ মনে করেন, "এদেশের সামাজিক জীবন যখন অনুন্নত তখন পর্দ্দা মানিয়া না চলিলে জাতীয় মর্য্যাদা কিছুতেই রক্ষিত হইতে পারে না। যতদিন দেশের পুরুষেরা উপযুক্ত শিক্ষিত না হয় ততদিন ইহার ব্যতিক্রম এরূপ সঙ্গত নহে"[১১৪] তেমনি কেউ আবার স্বাস্থ্য-জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে "খোলা হাওয়া ও আলোর অভাবে" মুসলমান মেয়েরা যক্ষ্মারোগে ভুগছেন এবং "এই স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা যে সন্তান প্রসব করেছেন তারা স্বভাবতঃই হীনস্বাস্থ্য নিয়ে এসে জাতিকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে।"[১১৫]

পর্দাপ্রথা সম্পর্কে মুসলিম-মানসে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাকে কোনমতেই একপেশে আখ্যা দেওয়া যায় না। এসময় বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তা মুসলিম বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পর্দাপ্রথার সঙ্গে জড়িত আর একটি বিষয় হলো নারীর সমানাধিকার। এক্ষেত্রেও মুসলিম মনীষীদের মতামত বিভিন্নপ্রকার। কেউ ইসলাম ধর্মের বর্তমান দুর্দশার জন্যে নারী জাতির প্রতি অসম্মানকে দায়ী করেছেন,[১১৬] কেউবা

নারীর স্বাধীনতাকে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে বর্ণনা করেছেন।[১১৭] এক্ষেত্রে স্পষ্ট দাবি জানিয়েছেন মিসেস এম রহমান —"আমরা চাই—আমাদের ইসলামদত্ত সম্মান স্বাধীনতা, চাই ইসলামদত্ত অধিকার।"[১১৮] এসব দাবির ক্ষেত্রে সবাই ধর্ম ও ধর্মানুশাসনকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন।

বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কেও মুসলিম-মানসে নানাপ্রকার প্রশ্ন উঠেছে। ইসলাম ধর্মে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। তবু হিন্দু সমাজ ধর্মের সংস্পর্শে এসে তা অসামাজিক কাজে পরিণত হয়েছিলো।[১১৯] এ কারণে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রমুখ সংস্কারক এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছেন।[১২০] কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা বিধবা বিবাহ দিয়েও এই আত্মঘাতী প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।[১২১] সৈয়দ আহমদ তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১২২] এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইসলামের "প্রেরিত পুরুষ স্বয়ং বিধবা বিবাহ করিয়া স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে এবিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।"[১২৩] এসব কারণে এসময়ে বিধবা বিবাহের সপক্ষে জোরদার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিলো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু আলোচনা-সমালোচনাও হয়েছে।

বাল্যবিবাহকে "সমাজদেহের মারাত্মক রোগ" আখ্যা দিয়ে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এই প্রথার মূল উচ্ছেদ করার দাবি জানিয়েছেন।[১২৪] এই প্রবন্ধে তিনি "বাল্যবিবাহপ্রথা স্বাস্থ্যনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়" বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৫] এই প্রথাকে স্ত্রীশিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১২৬] এই মতামত সম্পূর্ণভাবে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপ বহুবিবাহেরও বিরোধিতা করা হয়েছে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত মোহাম্মদ কর্তৃক প্রদত্ত একাধিক বিবাহের বিধান সমর্থন করেও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার

অযৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা চলেছে।[১২৭] বহুবিবাহ প্রথার মূলে যে শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে বলে দাবি করা হয়, কাজী ইমদাদুল হক তা অস্বীকার করে এতদ্দারা "শাস্ত্রবিধানসমূহের বিকৃত অর্থকারী একদল স্বার্থপর পুরুষানুক্রমিক পুরোহিত ধর্ম্মের নামে সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া বহু কালাবধি আপন স্বার্থসিদ্ধি করিয়া আসিতেছেন" বলে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন।[১২৮]

এছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানে জাঁকজমক ও জৌলুস প্রদর্শনের জন্যে যে অপব্যয় হয় তার কঠোর সমালোচনা করে অনেকে পত্র-পত্রিকায় লেখনী পরিচালনা করেন।[১২৯] তাঁরা বিষয়গুলোকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণ করেছেন।[১৩০] একটি পত্রিকা বিবাহের পণপ্রথাকে হিন্দুসমাজের অনুকরণ মনে করে এই প্রথা সম্পর্কে সাবধান হওয়ার জন্যে দেশবাসীকে আহ্বান জানান।[১৩১] এছাড়াও এই সময় তালাকপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে আলোচনা-সমালোচনা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য এই কুপ্রথা সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা।[১৩২] মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এই অধিকার (তালাক) প্রয়োগকে "একটি ঘৃণিত বেদআৎ ও অশাস্ত্রীয় ব্যভিচার" বলে উল্লেখ করে এর যুক্তিসঙ্গত দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে "মিশরের অনুকরণে বিবাহ সংক্রান্ত আইনের সংস্কার সাধনের আহ্বান জানিয়েছেন[১৩৩]

এছাড়াও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এই সময় মুসলিম সমাজ বিশেষ সচেতনার পরিচয় প্রদান করেন। এই কুসংস্কারগুলো গড়ে ওঠেছে মূলত ধর্মীয় বিতর্ককে কেন্দ্র করে কারণ এই সময় ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিতর্ক শেষপর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা ধর্মীয় কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়। 'হানাফী', 'লা-মজহাবী', 'কাদিয়ানী', 'শিয়া', 'সুন্নি' ইত্যাদি বিভিন্ন 'ফেরকা'র আবির্ভাব এই বিতর্কজনিত কুসংস্কারেরই বহিঃপ্রকাশ। তদুপরি রয়েছে কবর

পূজা, মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য বিশেষ ধরনের প্রার্থনা, মৌলুদ, দরুদ ইত্যাদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। এসব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে আলেম সমাজ। তাঁরা "হানাফী মোহাম্মদীর মধ্যে ঝগড়া লাগান, মৌলুদের কেয়াম, মৃতজনের ফাতেহা, আমিন, ছুরা ফাতেহা, রফে এদায়েন ইত্যাদি মতভেদজনিত মছলা লইয়া তর্ক বাহাছ ও দলাদলি সৃষ্টি" করেন।[১৩৪] মাওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরী এই আলেম-কুলের তীব্র সমালোচনা করে তাঁদের কার্যকলাপকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলেছেন। তাঁর মতে "বঙ্গদেশে বেহার ও হিন্দুস্থানের মৌলানা নামধারী একদল লোক আছেন—ধর্ম্মভীরু বাঙ্গালী মোছলমান পাল্‌কী, বজরা, পাগড়ী ও আবা কাবা দেখিলেই মুগ্ধ হয়। ঐসকল নামধারী মৌলানাগণের মধ্যে শতকরা অর্দ্ধেক লোক ষোল আনা মূর্খ, আরবীতে নামটা পর্য্যন্ত দস্তখত করিতে জানেনা শতকরা ৩০ জন সামান্য আরবীতে জ্ঞান রাখে।"[১৩৫] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় মুসলমানদের মধ্যে এই দলাদলি ভারতের অন্যান্য স্থানেও প্রভুত পরিমাণে পরিলক্ষিত হতো। এই দলাদলির দরুন কোন এক সময় লালাশঙ্কর ভাই নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে আহমদাবাদ আঞ্জুমান-ই-ইসলামের সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়েছিলো।[১৩৬]

এই সময় সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। ১৮৯১ খ্রীঃ 'নুরল ইমান' নামে একখানা প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায়।[১৩৭] "কোরাণ শরীফের আজ্ঞা, হাদিছ শরীফের উপদেশ ও এছলাম ধর্ম্মের মর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত" এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম।[১৩৮] এছাড়া ১৯০৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি'। এই সমিতির সঙ্গে যেসব ব্যক্তি জড়িত ছিলেন তাঁরা মৌলবী আবদুল মজিদ চৌধুরী, মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, মুনসী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, মৌলবী আবদুল হামিদ, মৌলবী নওশের আলী খান ইউস-

ফজ্লী প্রমুখ [১৩৯] "অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানব সমাজের মধ্যে পবিত্রতম সত্য সনাতন ইসলাম ধর্ম্ম-ভাস্করের অত্যুজ্জল স্বর্গীয় রশ্মির বিকীর্ণতা সাধন, ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মীদিগের অযথা আক্রমণ হইতে ইসলাম ধর্ম্ম ও মোসলেম সমাজের রক্ষা বিধান" ইত্যাদি এই সমিতির উদ্দেশ্য।[১৪০] 'আঞ্জুমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামে একখানা প্রতিষ্ঠানও এই সময় গঠিত হয়। এই সমিতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের ভেতর মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'আল-এসলাম'।[১৪১] এছাড়া 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি' (১৯১১) নামক প্রতিষ্ঠানও এসময় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ হলেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, চৌধুরী মোহাম্মদ এয়াকুব আলি প্রমুখ। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো তার নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। ১৯২৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে এই প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'শিখা' [১৪২] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মূলমন্ত্র ছিলো "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"[১৪৩] 'শিখার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান তাবৎ প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণা এবং ঘুনেধরা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী এত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো যে, "ধীরেধীরে একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো"[১৪৪] শুধু তাই নয়, তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এর অধিবেশন নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো।[১৪৫] শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রে এর সদস্যরা অপরিসীম

ঔদার্যের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। এছাড়া মাতৃভাষা প্রসঙ্গে সেদিন যে তুমুল বিতর্ক সূচিত হয়েছিলো সে সম্পর্কেও সমিতি বাঙলা ভাষার সপক্ষে জোরালো মতামত প্রদান করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের কিছু মৌলিক বিষয়ের উপরও তাঁরা নতুন করে আলোক-সম্পাত করেন। এই সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ বলছেন, "আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন তা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ; অন্ততঃ তাকে উত্তরাধিকারসূত্রে যেভাবে লাভ করেছি তার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অপবাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্পষ্ট ভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয়রূপে বিধৃত ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিত কলার চর্চ্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমা-বদ্ধ থাকে কোরাণ ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা। এই সমস্ত কথাই আমাদের নূতন করে ভেবে দেখতে হবে, ভেবে দেখতে হবে, মুসলমান সমাজের মানুষদের কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতায় এই ভাবে যে অনেক খানি নূতন রকমের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করা হয়েছে এতে করে কি সত্যকার কল্যাণ লাভ হয়েছে ?"[১৪৬] এই উদ্ধৃতি পাঠ করলেই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মৌল উদ্দেশ্য বুঝা যাবে। এ জাতীয় কথা সেদিন কি পরিমাণ বৈপ্লবিক ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো তা আজ অনুমানও করা যাবে না। এই আন্দোলনের সঙ্গে সেদিন যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আনোয়ারুল কাদীর, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ। এই "প্রতিষ্ঠানটির নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হইলেও কার্য্যতঃ ইহা সাম্প্রদায়িক নহে" বলে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে তার সম্পাদক জানিয়েছেন।[১৪৭]

পাদটীকা

১ আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, "ইসলাম ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা", 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯৭৪) ২০।

২ Yahya Armajani. 'Middle East Past and Present' (New Jersey, 1970) 69.

৩ Ibid, 57.

৪ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (দ্বি-স ; ঢাকা, ১৯৬৯) ৫৫।

৫ আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, "মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ : নগর ও রাষ্ট্র", প্রাগুক্ত, ৪৬।

৬ প্রাগুক্ত।

৭ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বি-স ; কলকাতা, ১৯৭১) ২৯।

৮ প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড (তৃ-স , কলকাতা, ১৯৭০) ২৪৬ : "ইসলামের প্রবল ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যাদর্শের ফলে হিন্দুসমাজের অবজ্ঞেয় জনসাধারণের একটা বড় অংশ অতি দ্রুত মুসলমান হইয়া যায়।" মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (দ্বি-মু ; ঢাকা, ১৯৬৫) ৪৯। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "সামাজিক প্রবন্ধ", ভূদেব-রচনা সম্ভার (তৃ-স , কলকাতা, ১৩৭৫) ২৭।

৯ আবুল হাশিম, "সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ", 'ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ' (দ্বি-প্র , ঢাকা) ৫১।

১০ V. D. Mahajan, 'The Muslim Rule in India' (Delhi, 1962), 2nd Part, 77.

১১ Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib', Vol. I & II (Bombay, 1973) 1.

১২ A. R. Mallick, 'British Policy & the Muslims in Bengal' (2nd ed. Dacca, 1977) 3.

১৩ R. C. Majumder, 'History of Mediaeval India' (Calcutta, 1974) 1. আবদুল করিমের মতে ১২০৩ খ্রীঃ শেষ দিকে অথবা ১২০৪ খ্রীঃ প্রথম দিকে এই আক্রমণ সংগঠিত হয়। দ্রষ্টব্য : আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯৭৭) ৮১।

১৪ মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, ৪।

১৫ প্রাগুক্ত।

১৬ Abdul Karim, 'Social History of the Muslims in Bengal' (Dacca, 1959) 17.

১৭ অমলেন্দু দে, 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' (কলকাতা, ১৯৭৫) ১৬৭-৬৮। তিনি বিভিন্ন ইংরেজের লেখা থেকে এর সপক্ষে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১২।

১৮ ইউসুফ হোসেন, 'মধ্যযুগের পাক-ভারতীয় সংস্কৃতি' ফারুক মাহমুদ অনূদিত, (ঢাকা, ১৯৬৭) ১৪৪।

১৯ Khondkar Fazli Rubbee, 'The Origin of the Musalmans of Bengal' (2nd ed., Dacca, 1970) 17, 18 & 37.

২০ Qazi Abdul Wadud, "The Musalmans of Bengal", 'Studies in the Bengal Renaissance' (ed.) Atul Chandra Gupta (Calcutta, 1958) 461.

২১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, (দ্বি-স , কলকাতা, ১৩৮০) ২৩৭।

২২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০।

২৩ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১৬৮।

২৪ প্রাগুক্ত।

২৫ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, "বাংলার মুসলমান", প্রাগুক্ত ১৫৪।

২৬ মুহম্মদ আবদুর রহিম, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯৭৬) ৩১

২৭ প্রাগুক্ত।

২৮ গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (কলকাতা, ১৯৪৭) ৫৩।

২৯ W. W. Hunter, 'Indian Musalmans' (Dacca, 1975) 141.

৩০ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১৭০।

৩১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা ১৩৭৮) ১২০।

৩২ প্রাগুক্ত, ১২৮। Sufia Ahmed, 'Muslim Community in Bengal' (Dacca, 1974) 6.

৩৩ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১৯ ।

৩৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ১৩৩। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার উচ্চশিক্ষা' (কলকাতা, ১৩৬০) ৯-১০।

৩৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ১২৯। যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাগুক্ত, ১০।

৩৬ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১১৪।

৩৭ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত ১৩০

৩৮ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১১৫।

৩৯ যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাগুক্ত, ২৮

৪০ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ..৫।

৪১ প্রাগুক্ত, ২০১।

৪২ যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাগুক্ত, ৮.

৪৩ অমলেন্দু দে প্রাগুক্ত, ১৮৯।

৪৪ প্রাগুক্ত, ১৯০

৪৫ প্রাগুক্ত।

৪৬ প্রাগুক্ত।

৪৭ প্রাগুক্ত, ১৯২।

৪৮ প্রাগুক্ত, ১৯৩।

৪৯ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (দ্বি-স, কলকাতা, ১৯৫.) ৫০।

৫০ কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ' (কলকাতা, ১৯৬৩) ১৯।

৫১ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি' (কলকাতা, ১৯৭১) ১০৫।

৫২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত (চতুর্থ-স; কলকাতা, ১৯৬১) ১৯।

৫৩ কাজী আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত। উদ্ধৃত। : "The term Hindu does not include Brahmo."

৫৪ রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (চতুর্থ-স, কলকাতা, ১৯৬১) ৫৪।

৫৫ বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (লেংম্যান-স, কলকাতা, ১৯৭৩) ৩০৭।

৫৬ বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বছর' (কলকাতা, ১৯৬২) ২৭৪।

৫৭ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত' (সিগনেট-স, কলকাতা, ১৩৫১) ১৪৭।

৫৮ স্বপন বসু, 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস' কলকাতা ১৯৭৫) ১০৭।

৫৯ 'সংবাদ প্রভাকর' ১০।০১।১৮৫৪ উদ্ধৃত, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র',

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৬২) ৪৩৪।

৬০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড (চতুর্থ-মু ; কলকাতা, ১৩৭৭) ১২১।

৬১ প্রাগুক্ত, ২৬৬।

৬২ স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, ১১১।

৬৩ শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ৮৩

৬৪ বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, ৪২।

৬৫ গোপাল হালদার, 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বি-স , কলকাতা, ১৩৭২) ১৫০।

৬৬ শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, ১০৭।

৬৭ প্রাগুক্ত, ১২।

৬৮ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' (কলকাতা, ১৯৭৬) ২৮৭।

৬৯ স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, ১০৫।

৭০ প্রাগুক্ত, ১২১।

৭১ বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (কলকাতা, ১৯৬৮) ২৪২।

৭২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২৫০।

৭৩ স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, ১২৩।

৭৪ বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, ২৩১।

৭৫ স্বপন বসু প্রাগুক্ত, ১২৩-২৪।

৭৬ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (পঞ্চম-স , কলকাতা, ১৩৭৯) ১৮০।

৭৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, ২৫৮।

৭৮ প্রাগুক্ত, ২৫১।

৭৯ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১৭২।

৮০ Muqaddesur Rahman., "The Custom of Widow-Burning in India", 'Journal of the Bangladesh Itihas Samiti' (Vol. II, 1973) 115.

৮১ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, "সতীদাহ প্রথা", 'ভারতকোষ' পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৮০) ৫৩৩।

৮২ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি', ৫৭।

৮৩ প্রাগুক্ত, ৫৫-৫৭।

৮৪ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব' (ঢাকা, ১৯৭৪) ৪১৮।

৮৫ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৬২।

৮৬ বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', ২৪১। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৫৯।

৮৭ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৫৯।

৮৮ রাজনারায়ণ বসু, প্রাগুক্ত, ৬৫। বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, ৩০৪। যোগেশচন্দ্র বাগল জানাচ্ছেন যে, মহর্ষির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র এক সভায় "হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার আবেদন" সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্রষ্টব্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' ৪৮১-৮২।

৮৯ শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, ২২৪।

৯০ বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর মুখ দিয়ে এই উক্তি করেছেন। দ্রষ্টব্য, সংসদ সংস্করণ রচনাবলী, (সপ্তম-প্র : কলকাতা, ১৩৮৪) ২৭৯।

৯১ "Bengali Literature", Rachanavali', Vol. III (Calcutta, 1969) 109 : "His exertions in the cause of the Hindu widows, the noble courage with which he, a pandit and a professor, first advocated their cause, the patient research and indefatingable industry with which he sought to maintain it, his largehearted benevolence, and his labours in the couse of vernacular education—all these thing combine to place him in the front rank of the benefactors of his country."

৯২ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' "কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা", (দ্বি-স ; কলকাতা, ১৩৭৩) ৩১৩।

৯৩ দ্রষ্টব্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর'।

৯৪ বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, ২৬৫।

৯৫ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' (চতুর্থবার কলকাতা, ১৩২০) ২৭৫।

৯৬ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা' (কলকাতা) ৩৯৯। নীহাররঞ্জন রায় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তনকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। দ্রষ্টব্য, নীহাররঞ্জন

রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস' আদি পর্ব (কলকাতা, ১৩৬৫) ২৬৪।

৯৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার", 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৬৯) ৭২-৪৯।

৯৮ বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, ২৭২।

৯৯ স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, ১৭৪।

১০০ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১৭৩।

১০১ প্রাগুক্ত, ১৭৪ঃ হিন্দু ১৭, ২৫৪, ১২০ এবং মুসলমান ১৭, ৮৬৩, ৪১১।

১০২ নবাবদের 'খাজা' উপাধি (?) সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম বলছেন "আবদুল্লাহর মৃত্যুর (১৭৯৬) পর তাঁর পুত্র হাফিজুল্লাহ কয়েকজন আর্মেনিয়ানের সঙ্গে একটি যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এদের নাম কোজা জোহানেস, কোজা ডাকোস্তা, কোজা মাইকেল। কোজাদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন বলে লোকেরা হাফিজুল্লাহ নিজেও তাঁর নামের আগে 'কোজা' ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই কোজাই পরে খাজায় রূপান্তরিত হয়।" দ্রষ্টব্য, সিরাজুল ইসলাম, "নবাব পরিবারের উত্থান ও পতন", 'বিচিত্রা' (ঢাকা ১৮ আগষ্ট, ১৯৭৮) ২০। 'খাজা' হাফিজুল্লাহর ছোট ভাই 'খাজা' আলিমুল্লাহ, তাঁর পুত্র 'খাজা' আবদুল গনি (গনি মিয়া); তাঁর পুত্র 'খাজা' আহসানুল্লাহ, তাঁর পুত্র 'খাজা' সলিমুল্লাহ 'নবাব বাহাদুর'।

১০৩ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ২৩।

১০৪ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১৭১।

১০৫ S. A. Q. Husaini, 'Arab Administration' (2nd. ed., Lahore, 1956) 30.

১০৬ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'মোস্তাফা চরিত' (চতুর্থ-স ঢাকা, ১৯৭৫) ৮১৬ ('রযীল' শব্দের অর্থ নীচ এবং 'জঈফ' শব্দের অর্থ দুর্বল। রযীলের সঙ্গে 'আতরাফে'র মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।)

১০৭ আলাউদ্দীন আহমদ, "ইসলাম-দর্শন", 'ইসলাম-প্রচারক' (চৈত্র-বৈশাখ, ১৩০৯-১০) মুস্তফা নূরউল ইসলাম 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' (ঢাকা, ১৯৭৭) ৮৭।

১০৮ মোহাম্মদ কে চাঁদ "মোসলেম রমণীর পর্দা প্রবন্ধ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য", 'ইসলাম-প্রচারক', ৮ম বর্ষ দশম সংখ্যা। উদ্ধৃত, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৮৯।

১০৯ মৌলভী এ, লোহানী "ইসলামে নারী" 'তবলীগ' শ্রাবণ, ১৩৩৪। উদ্ধৃত, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৯২।

১১০ মোহাম্মদ গোলেম হোসেন, "ইসলামে পর্দ্দাতত্ত্ব" ইসলাম-দর্শন', কার্তিক, ১৩২৯। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৯০।

১১১ সিরাজী, "স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা", 'আল-এসলাম' মাঘ, ১৩২৩। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৯০।

১১২ "আলোচনা—সংবাদপত্রে মাহলা চিত্র" সম্পাদকীয়, মাসিক মোহাম্মদী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম. প্রাগুক্ত, ৯১।

১১৩ প্রাগুক্ত।

১১৪ সাহাদত আলী খাঁ, "ইসলামে পর্দ্দা-প্রথা", 'মোয়াজ্জিন', কার্তিক, ১৩৩৫ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৯২।

১১৫ খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহমদ, "ইসলাম ও মুসলমান". 'সওগাত' চৈত্র, ১৩৩৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৯৩।

১১৬ এস এ আলী, "রমণী", 'প্রচারক, মাঘ, ১৩০৬ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৭৫।

১১৭ "মুসলিম নারীর মূল্য", 'সওগাত' ভাদ্র, ১৩৩৬ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৭৬।

১১৮ মিসেস এম রহমান, "পর্দ্দা বনাম প্রবঞ্চনা", 'সওগাত', প্রাগুক্ত, : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৭৬।

১১৯ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৫৭।

১২০ A. R. Mallick, op. cit., 110.

১২১ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৫৭।

১২২ A. R. Mallick, op. cit., 110.

১২৩ মহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ, "মোসলেম সমাজ সংস্কার", 'কোহিনূর', আষাঢ় ১৩০৫ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৮২।

১২৪ এছলামাবাদী, "সমাজ সংস্কার" আল-এসলাম' (আশ্বিন, ১৩২৬) ২৯৯।

১২৫ প্রাগুক্ত।

১২৬ সিরাজী 'নারী জাতির দুর্গতি", 'আল-এসলাম' ভাদ্র, ১৩২৫।

১২৭ শেখ জমিরুদ্দীন, "মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার", 'ইসলাম-প্রচারক' শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৮২।

১২৮ মৌলভী ইমদাদুল হক, "বহুবিবাহ", 'নবনূর', অগ্রহায়ণ, ১৩১২ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৮৩।

১২৯ এছলামাবাদী, 'আল-এসলাম' আশ্বিন, ১৩২৩।

১৩০ প্রাগুক্ত।

১৩১ "বিবাহে বরপণ", সম্পাদকীয়, 'সাম্যবাদী' আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩৩১ : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৮৫।

১৩২ মোহাম্মদ কে চাঁদ, "তালাক বা মোসলেম স্ত্রীবর্জ্জন", 'ইসলাম-প্রচারক', ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৮৫।

১৩৩ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার", 'মাসিক মোহাম্মদী' পৌষ, ১৩৩৪ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৮৬।

১৩৪ ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, "সাহিত্যের গতি", 'আল-এসলাম', (শ্রাবণ, ১৩২৭)

১৩৫ প্রাগুক্ত।

১৩৬ চারুচন্দ্র দত্ত, 'পুরানো কথা' দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা. ১৩৭৩) ৫২।

১৩৭ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৩২।

১৩৮ "নূরল ইমানের বলবৃদ্ধি", 'ইসলাম-প্রচারক', আশ্বিন, ১২৯৮ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৩২।

১৩৯ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৩৩।

১৪০ মোহাম্মদ রওশন আলি চৌধুরী, "বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি", 'ইসলাম-প্রচারক' ; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৩৩।

১৪১ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' (ঢাকা, ১৯৬৯) ১৩৬।

১৪২ প্রাগুক্ত, ৪৭২।

১৪৩ আবদুল হক, 'সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ' (দ্বি-স ; ঢাকা, ১৯৭৬) ১৩৪

১৪৪ আবুল ফজল, 'রেখাচিত্র' (চট্টগ্রাম, ১৯৬৫) ১৫৫।

১৪৫ কাজী আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, ১৯৪। আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, ১৫৫।

১৪৬ কাজী আবদুল ওদুদ, "বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা", শিখা' প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩ চৈত্র ; আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত।

১৪৭ "তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী", 'শিখা' তৃতীয় বর্ষ (১৯২৯) ; আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ৪৮৮।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ এক ॥

সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান রক্ষণশীল ও পরস্পরবিরোধী। ইসলামের আদি যুগে দর্শনকে বিদেশী বিজ্ঞান হিসেবে অনুৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।[১] তবু মুসলিম মনীষীগণ দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। কথাগুলো ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি তাবৎ বিষয় সম্পর্কে প্রযোজ্য। তবে ইসলামের আদিযুগে কাব্যচর্চা, শিল্পকলা ও সঙ্গীতই ছিলো সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয়।

কবি ও কবিতার প্রতি হযরত মোহাম্মদের বিরাগ ছিলো, তবে গল্পবলার (Story telling) প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিলো।[২] কোরআন শরিফের ভাষার কাব্যময়তা ও সঙ্গীতধর্মিতা আরবদের সাহিত্য-প্রীতিকে যে প্রভূত পরিমাণে উজ্জীবিত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোরআনের পরই এই সমাজে প্রাক্ইসলামীযুগের কাব্য-সাহিত্য তুলনামূলকভাবে বেশি সমাদর পেয়েছিলো।[৩] এটিও তাঁদের সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শন। শিল্পকলা সম্পর্কে ইসলামে কিছু সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্থাপত্য ছাড়া প্রায় সবরকমের শিল্পচর্চাকে ইসলাম অনুৎসাহী করেছে।[৪] অথচ এক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন যাই থাকনা কেন, মুসলিম বিশ্বে শিল্পকলার চর্চা হয়েছে ব্যাপক। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষা ও ললিতকলা চর্চার ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর। প্রাণীর ছবি আঁকার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা থাকা স্বত্বেও খলিফা মোতাসেম বিল্লাহ তাঁর প্রাসাদের দেওয়ালে নগ্ন ছবি অংকন করেছিলেন।[৫] সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে ইসলামের বিধান পরস্পরবিরোধী। একারণে ধর্মের দোহাই দিয়ে সঙ্গীতচর্চা কখনো নিন্দিত হয়েছে[৬], কখনো বা সমর্থিত।[৭] তবে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীত সর্বদাই অনুমোদিত।[৮] সমস্ত

মুসলিম জগতে এই বিভক্তি বিস্তৃত। হযরত মোহাম্মদ সঙ্গীত পসন্দ করতেন না,[৯] তবে তাঁর উপস্থিতিতে কখনো কখনো গান গাওয়া হয়েছে।[১০] কিন্তু উমাইয়া আব্বাসীয় খলিফাদের অনেকে সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। শুধু তাই নয়, হযরত মোহাম্মদের বংশধরদের কেউ কেউ সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। হযরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের কন্যা সুকাইনার গৃহে প্রতিনিয়ত যে জলসা বসতো তাতে সঙ্গীতচর্চাও হতো[১১]

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা পারস্যে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেন। পারস্যে এই নতুন ধর্ম ও জীবনধারা এত গভীর-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, "নিজে ইরানী হয়েও দশ শতকের আল-বিরুনী ফার্সি ভাষায় প্রশংসা শোনার চেয়ে আরবী ভাষায় নিন্দা শোনাও শ্রেয় মনে করতেন।"[১২] কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আব্বাসীয় যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে পারস্যসংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সূচনা হয়—যার উৎকৃষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ফেরদৌসির 'শাহনামা' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ফেরদৌসি ইচ্ছে করেই আরবি শব্দ বর্জন করেছিলেন।[১৩] এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া একেবারে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত—যেখানে খলিফা হযরত ওমরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিলো।[১৪]

খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে প্রবেশকালে এই ধর্মের উপর পারস্যসংস্কৃতির ছাপ এত গভীরভাবে পড়েছিল যে, ভারতের গোটা মুসলমান শাসন কাঠামোটাই এই প্রভাবের আওতায় এসে গিয়েছিলো।[১৫] এই পরিবর্তন একযোগে চলতে থাকে। এই ক্ষেত্রে ফারসিভাষা সহজ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাঙলাদেশে এই ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। বঙ্গদেশেও রাজভাষা হিসেবে ফারসির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ছোঁয়া পেয়ে বাঙলা ভাষা যথার্থ অর্থে তার রূপলাভ করে[১৬] এবং

রাজদরবারে সমাদৃত হয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় মধ্যযুগের বিরাট সাহিত্যধারা—যা যুগপৎ হিন্দু-মুসলিম অবদানে পরিপূর্ণ।[১৭] এই সাহিত্যধারায় ধর্মীয় চিন্তাচেতনা যেমন প্রতিফলিত হচ্ছিলো, তেমনি তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে ধর্মনিরপেক্ষ কাব্যধারাও সৃষ্টি হয়েছিলো। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরব করার বিষয় শুধু মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, কাব্যের প্রাণমূলে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা প্রবর্তনেও। বাঙলার মুসলিম সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০) পর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সময়কে "মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অন্তর্বর্তী ক্রান্তিকাল বলে গণ্য" করা যায়।[১৮] রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যে গণজীবনে যে হতাশা নেমে আসে তা সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যরসবঞ্চিত হয়ে পড়েন। এই সময়ের আসল রূপটি কবিওয়ালা ও মিশ্রভাষারীতির কাব্যকারদের রচনায় যথাযথ ধরা পড়েছে।[১৯] বিশেষভাবে আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানি শব্দমিশ্রিত ভাষায় লিখিত সাহিত্যকেই মিশ্রভাষারীতির সাহিত্য বলা হয়।[২০] কাব্যসাহিত্যে আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার হিন্দু কবিদের দ্বারা আগে থেকে সূচনা হলেও[২১] এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় মিশ্রভাষারীতির কাব্যে।[২২] সে হিসেবে এই কাব্যধারাকে হিন্দুরচিত কাব্যের অনুকৃতি আখ্যা দেওয়া যায়।[২৩] এই কাব্যধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকা অবস্থাতেই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সংঘর্ষ মুসলমান সাহিত্যিকদের মূল জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় মুসলিম সমাজ তা থেকে বহু দূরে সরে পড়েন। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ, তাঁরা প্রচলিত শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়েন। অথচ সেদিনও মুসলিম শাসকেরা বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ ও পাঠাগার

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।[২৪]

॥ দুই ॥

বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। ১৮১৭খ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৩৫ খ্রীঃ ইংরেজিকে চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা বলে ঘোষণা করার পর থেকেই হিন্দুদের অগ্রগতি তরান্বিত হয়। এই সময় মুসলমানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েন। এই অনগ্রসরতা তাঁদের সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

শিক্ষাক্ষেত্র মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ দুটো। একটা হলো, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত সংস্কার— যার প্রেরণামূল কয়েকশ বছর ভারত শাসন করার অহমিকা।[২৫] কারণ "মুসলমানদের নিকট ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হওয়ার অর্থ ছিল, তাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নতুন বিদেশী ব্যবস্থার নিকট প্রতিরোধহীন আত্মসমপণ।'[২৬] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনের পেছনে কাজ করেছে শাহ আবদুল আযিযের একটা ফতোয়া।[২৭] সেই ফতোয়ায় প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বলা হলেও পরোক্ষভাবে তা ইংরেজি শিক্ষাকেও অনুৎসাহিত করছে। ফলে যাঁরাই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা স্বাভাবিক।[২৮] এর পেছনে যুগপৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাত্যাভিমান কাজ করেছে তা বুঝা যায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, যে শাহ আবদুল আযিযকে আমরা মুসলমানদের ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে আখ্যায়িত করে থাকি তিনি কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। উপরন্তু তিনি মুসলমানদের জন্যে ইংরেজি শিক্ষা জায়েয বলে ফতোয়া জারি করেছিলেন।[২৯] শাহ আবদুল আযিযের এই ফতোয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মুসলিম আশরাফ শ্রেণীর

ভেতর তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতির নামে ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের আশঙ্কা সম্পর্কিত আভাস এই ফতোয়ায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। অতএব এই দেশের উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারে ইংরেজি শিক্ষাবর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। ওয়াহবি আন্দোলন ছাড়াও তার বাইরে ইংরেজি শিক্ষাবিরোধী প্রচারণা চলা অস্বাভাবিক নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার দ্বিতীয় কারণ হলো দারিদ্র। এর জন্যে ঢালাওভাবে ইংরেজকে দায়ী করা হয়। কারণ তারাই নাকি মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ থেকে অপসারণ করে হিন্দুদের পুনর্বাসন করেছিলেন। এই নির্বাসন-পুনর্বাসনের পটভূমিকা সৃষ্টি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের ফলে রাতারাতি মুসলমান জমিদারদের উৎখাত করে হিন্দু আমলারা গোটা জমিদারীর মালিক হয়ে বসেন।[৩০] উইলিয়ম হান্টার মুসলিম বিক্ষোভের কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে এই দুর্দশাজনিত হতাশাকেই দায়ী করেছেন[৩১] অবশ্য এর অন্য একটা দিকও রয়েছে। হান্টার সাহেবের এই প্রতিবেদনে ইংরেজের "ডিভাইড এণ্ড রোল" নীতিও প্রতিফলিত। কারণ, এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হয় (১৮৭২) তখন একদিকে মুসলিম-মানসে উত্থিত বিক্ষোভ প্রশমিত হতে চলেছে এবং কয়েকজন মুসলিম মনীষীর উদ্যোগে এসব বিক্ষোভের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে; অন্যদিকে হিন্দু-মানসে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে, যাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার কতিপয় অধ্যায় তাঁদের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। এগুলো হলো প্রধানত জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম, ইতিহাসচেতনা ইত্যাদি। তবু উচ্চপদে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে একথা ঠিক। কিন্তু এর সূচনা হয়েছে মুসলমান আমল থেকে।[৩২] এই মুসলিম উৎখাতের ইতিবৃত্ত আমরা একেবারেই অনুধাবন করতে চেষ্টা করি না; ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম-মানসে এই বিবর্তনের ছাপ তুলনামূলক

ভাবে ক্ষীণ—নেই বললেই চলে। অর্থাৎ ইংরেজের সর্বগ্রাসী শাসন-প্রণালীর ফলে আমরা অতীতের কথা একপ্রকার ভুলেই বসে আছি। তবু বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার জন্যে এক-মাত্র দারিদ্রই দায়ী, এই সিদ্ধান্তে আসার আগে কথাটা একবার ভেবে দেখতে হবে। কারণ ইংরেজি শিক্ষা বিকাশের সময় বঙ্গ-দেশের সর্বত্রই যে মুসলিম সমাজ দরিদ্র ছিলেন, এমন কথা অনুমান করা ঠিক হবে না।

১৭৫৭ খ্রীঃ বঙ্গদেশ ইংরেজের করায়ত্ত হয়। এরপর ১৭৭২খ্রীঃ ওয়াসিমউদ্দীন নামে জনৈক ব্যক্তি সরকারী সাহায্যে হুগলীতে এক খানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিতে শুধু আরবি ও ফারসি শিক্ষা দেওয়া হতো।[৩৩] ১৭৮০ খ্রীঃ মুসলিম জনসাধারণের অনুরোধে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৩৪] এই মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য যদিও কতিপয় আমলা সৃষ্টি করা[৩৫], তবু এই মাদ্রাসা থেকেই "বাঙলাদেশে নগরকেন্দ্রিক মুসলমানদের শিক্ষার সূচনা।"[৩৬] সরকার শুধু মাদ্রাসাই প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, এই প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেন চাকরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।[৩৭] এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বহু ছাত্র পাশ করে বেরিয়েছেন এবং তাঁরা বিভিন্ন-প্রকার সরকারী কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অন্তত ১৮১৭খ্রীঃ আইন আদালতের ভাষা ইংরেজি চালু না করা পর্যন্ত বিচার-বিভাগীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানেরা নিয়োজিত ছিলেন। শুধু তাই নয় "১৮১১ সালে কলকাতার উকিলদের যে তালিকা দেখি তাতে দেখা যায় ১৬ জন উকিলের মধ্যে ১৪ জন মুসলমান।"[৩৮] তাঁদের আর্থিক অবস্থা নিশ্চয়ই ভালো ছিলো। এসব আমলা ও উকিলদের সন্তানেরা কোথায় গেলেন? "১৮৬৫ সালেও ৫০% উকিল মুসলমান। কিন্তু তারপর থেকে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া শুরু হল। এর প্রধান কারণ, ইংরেজি শিক্ষার দিকে এই শিক্ষিত মুসল-

মানেরা একেবারেই ঝুঁকলোনা''[৩৯] —দুয়েকটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম ছাড়া।[৪০] অথচ মজার কথা হলো এই সময় স্কুল-কলেজ পরিচালনায় মুসলমানদেরও ভূমিকা ছিলো।[৪১] এমনকি "১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটিতে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন।''[৪২]

অতএব একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এসময় বিপুল সংখ্যক মুসলমান শুধু গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে ইংরেজি পড়েননি। কারণ তখন মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনের যুগ। আর যেকোন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই তার সমর্থকেরা সাধারণত আশাবাদী। হয়তো এসব আন্দোলন সম্পর্কেও মুসলমানের এত বেশি আশাবাদী ছিলেন যে, তাঁরা এর বাইরে ভবিষ্যতের কথা চিন্তাই করেননি। উচ্চপদস্থ বহু মুসলমান সরকারী আমলাও যে এসব আন্দোলনে জড়িত ছিলেন তার প্রমাণও রয়েছে।[৪৩] নগরকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এসব আমলাদের ক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্গতিহীনতার কথা আসে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে হিন্দুদের ভেতরও প্রথমদিকে সংস্কার ছিলো।[৪৪] উপরন্তু অনেকক্ষেত্রে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে এবং প্রচলিত পেশা ত্যাগের ভয়ে বহু বিত্তশালী হিন্দুও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন[৪৫] কিন্তু হিন্দু সমাজের সৌভাগ্য যে, এই সমাজ এমন কিছু অলোকসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর পরিচর্যা লাভ করেছিলো, যাঁরা কোন প্রকার সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা বা ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নিজ কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হননি। হিন্দু সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক হিন্দু কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা হবার গৌরব পরিত্যাগ করা[৪৬] তার প্রমাণ কিন্তু মুসলিম সমাজ সেরকম ব্যক্তির সেবালাভে বঞ্চিত হয়েছিলো। নচেৎ ফারসি ভাষার বিলুপ্তিতে হিন্দুরাও কম ক্ষতিগ্রস্থ হননি। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় এই প্রতিক্রিয়ার তুলনা করেছেন "বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত

অথবা উপার্জ্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়' তার সঙ্গে[৪৭] উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর প্রসিদ্ধ রিপোর্টে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পরিদর্শিত বঙ্গদেশের পাঁচটি জেলার ৭২৫টি ফারসি স্কুলের ৩৪৭৯জন ছাত্রের ভেতর ১৪১৭ জন মুসলমান, বাকি ২০৬২ জন হিন্দু[৪৮]

অতএব ফারসি ভাষার অবলুপ্তিতে শুধু মুসলমানেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন একথার পেছনে কোন বাস্তব সত্য নিহিত নেই। সেজন্য একে এককভাবে মুসলমানদের ক্ষোভ ও ক্ষতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক।

অতএব দারিদ্রকে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা বলা ঠিক হবে না। কারণ হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী যেদিন ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছিলেন, সেদিন মুসলমানদের অনেকেরই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার শক্তি ও সঙ্গতি ছিলো। আসলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগহীনতাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুর্দশার কারণ[৪৯]—যার পেছনে কাজ করেছে উল্লিখিত সংস্কার ও অহমিকা। মীর মশারফ হোসেনের পিতা একজন বিত্তশালী বংশের সন্তান হলেও মাতৃভাষা চর্চা করেননি[৫০] তাঁরা ইংরেজি ভাষাচর্চাকে ধর্মবিরোধী কাজ মনে করতেন[৫১] শুধু তাই নয়, মীর সাহেব সেকালের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, গ্রামের লোক লেখাপড়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করতেন না।[৫২] অতএব এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই সঙ্গত যে, ''ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে যে অভিযান সেটা প্রায় সর্বতোভাবে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত এবং সেজন্যেই এদেশে সাধারণ ভাবে মুসলমানদের শিক্ষাগত অনগ্রসরতার দায়িত্ব তাদেরই সর্বাপেক্ষা বেশী।[৫৩]

তবে মুসলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতার পেছনে দারিদ্রকে একটা অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ কলকাতাকেন্দ্রিক

শিক্ষাব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের যত আপত্তিই থাকনা কেন, এর বাইরে বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী যে বিশাল দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মুসলমান বাস করতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে তাঁদের "উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মত এত আপত্তি ছিলনা।"[৫৪] কিন্তু তাঁদের সামনে দারিদ্রের যে ভয়ঙ্কর দানব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিলো তাকে অতিক্রম করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এরা অশিক্ষিত কৃষকশ্রেণী। তবু এঁদের ক্ষেত্রে দারিদ্র যেমন সত্য, তেমনি উপর-তলার মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্যে ক্রমাগত দাবিও কম বাধা সৃষ্টি করেনি।[৫৫] উপরন্তু এই দারিদ্রজনিত বাধার কথা হিন্দু জনসাধারণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তবু রামতনু লাহিড়ী ইংরেজি শিক্ষার জন্যে যেরূপ ডেভিড হেয়ারের পালকির পেছনে ছুটেছিলেন[৫৬], অথবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেরূপ দারিদ্রের ভেতর লালিত-পালিত হয়েও[৫৭] লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগবশত পায়ে হেঁটে কলকাতা এসেছিলেন এবং পরের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখেছেন[৫৮], তেমনটি মুসলিম সমাজে কয়জন পাওয়া যাবে?

অবশ্য পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং আর্থিক প্রতিকূলতার দরুন হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারেননি তা সত্য।[৫৯] কারণ এই অঞ্চলটি ছিলো তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। সমসাময়িককালে লিখিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দেখলেই তা অনুমান করা যায়। বিশপ হেবর তাঁর স্মৃতিকথায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন।[৬০]

১৮২৯ খ্রীঃ কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো এ্যারাবিক বিভাগ খোলা হয় এবং এই বিভাগের জন্যে একজন ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ছাত্ররা ভালো ফল করে।[৬১] সেই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মুসলিম ছাত্রদের ভেতর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বাড়তে থাকে।[৬২] মুসলিম শিক্ষার এই

অগ্রগতিতে সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানেরা তেমন অংশগ্রহণ করেননি—যাঁরা করেছিলেন তাঁরা নিম্নবিত্তের সন্তান।[৬৩] এই সময় একদিকে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, আবদুল করিম প্রমুখের আবির্ভাব হয়, অন্যদিকে সরকারী সাহায্য-সহযোগিতায় মুসলিম শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়। এতদিন মোহসিন ফাণ্ডের টাকা সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়িত হচ্ছিলো। মোহসিন ফাণ্ডের টাকা শুধু মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়িত হবে এমন কথা হাজি মোহাম্মদ মোহসিন উইলে উল্লেখ না করলেও[৬৪] নওয়াব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহিতে মুসলিম ছাত্রদের জন্যে মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। এই সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো সর্বসম্প্রদায়ের উপযোগী করে প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠা। এই ক্ষেত্রেও নওয়াব আবদুল লতিফের যথেষ্ট দান রয়েছে। তাঁর উদ্যোগে মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু "শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ছিল রীতিমত রক্ষণশীল।"[৬৫] একারণে "সমাজের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে" তিনি বা তার সোসাইটি "বিশেষ কোন যোগ সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না"।[৬৬] তাঁর তুলনায় ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের সৈয়দ আমির আলিকে অনেক বেশি অগ্রসর বলে মনে হয়। অন্যথায় তিনি বা তাঁর অনুসারীদের পক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবধারা উপেক্ষা করা সম্ভব হতো না।[৬৭] ১৮৮১ খ্রীঃ হাণ্টার কমিশনের কাছে এক স্মারকলিপিতে তাঁর দল হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ও রাজশাহির মাদ্রাসাগুলো তুলে দিয়ে কলকাতায় শুধু মুসলমানদের জন্যে একখানা ইংরেজি কলেজ খোলার দাবি জানান।[৬৮] কিন্তু নওয়াব আবদুল লতিফ তার বিরোধিতা করেন।[৬৯] রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সৈয়দ আমির আলি, নওয়াব আবদুল লতিফ তো বটেই, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের চেয়েও উদার ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন।[৭০]

॥ তিন ॥

এভাবে বহুদিনের অবসাদ কাটিয়ে মুসলমান সমাজ নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু এই অবস্থাটিকে সংহত করার আগেই তাঁরা মাতৃভাষা নিয়ে একটা নিদারুণ সংকটে পতিত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ হান্টার কমিশনের সময় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফ বঙ্গদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, উচ্চশ্রেণীর (আশরাফ) মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু এবং নিম্নশ্রেণীর (আতরাফ) মুসলমানদের মাতৃভাষা বাঙলা।[৭১] এই জটিলতার ফলে মুসলমানদের ভেতর যে মাতৃভাষ-বিতর্কের সুচনা হয় তার জের বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

এই বিতর্কের মূলে প্রধানত অনুপ্রেরণা জোগায় মুসলমানদের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন সভাসমিতি। এই পত্র-পত্রিকা ও সভাসমিতিকে অবলম্বন করে মুসলমান সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদগণ এই বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং জোরালোভাবে নিজ নিজ বক্তব্য প্রদান করেন। সবাই বাঙলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলে ঘৃণা না করে নিজেদের করে নেবার আহ্বান জানান।[৭২] তাদের সুস্পষ্ট মতামত হলো মুসলমানদের "পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন" তাঁরা বাঙালী এবং তাদের মাতৃভাষা বাঙলা।[৭৩] মাওলানা আকরম খাঁর মতে, "দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। "বাঙ্গালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দ্দু না বাঙ্গালা?" এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত।"— কারণ তিনি মনে করেন, "বঙ্গের মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাই তাহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইবে।"[৭৪] শুধু তাই নয় তিনি কোরআনের বাণী উদ্ধৃত করে দাবি

করেছেন, "মাতৃভাষার সেবা করা প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও আমাদের আলেমগণ ধর্ম্মের হিসাবেই মাতৃভাষার সেবা করিতে বাধ্য।'[৭৫] সৈয়দ এমদাদ আলি যুক্তির অবতারণা করে মাতৃভাষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা হিসেবে বাঙলার উপর অধিকার রয়েছে বলে দাবি করেছেন।[৭৬] একজন লেখক ব্যঙ্গের মাধ্যমে "মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষ উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া কিম্বা বাঙ্গালা জানিনা বা ভুলিয়া গিয়াছি, এরূপ বলা'কে একটা মারাত্মক রোগ বলে অভিহিত করেছেন।[৭৭] শুধু তাই নয় কেউ বাঙলা চর্চা না করার ফলস্বরূপ "বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রতি যে পরিবর্দ্ধমান টান অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার বেগ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে" বলে যেমন আশংকা প্রকাশ করেছেন,[৭৮] তেমনি কেউবা "বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে মুসলমানদের ঔদাস্যই তাহাদের পতনের আর এক মুখীভূত কারণ" বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৯] যাঁরা "বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর"[৮০] তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে এসময় অনেকেই সংবাদপত্রে লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের একজন উর্দু বাদ দিলে জনসাধারণের "জাতীয়তা বৃদ্ধির অনিষ্ট" হবে না বলে যেমন মনে করেন,[৮১] তেমনি অন্য একজন "বাঙ্গালার মাটি হইতে উর্দ্দুকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না" বলেও দ্ব্যর্থহীন মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৮২] এক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলমানদের একটা বিরাট অংশের যথার্থ অনুভূতি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের একটা বাক্যে ফুটে ওঠেছে। তিনি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, "গৃহের পার্শ্বের উর্দ্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী মোসলমানের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগে না"[৮৩]

এই সময় বাঙলাদেশের মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ এই

বিতর্কে বাঙলাভাষার পক্ষে রায় প্রদান করে উর্দুকে প্রত্যাখান করলেও মুসলমানদের জন্যে উর্দু ফারসি ও আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অনেকে উর্দুকে একেবারে নির্বাসনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে অল্পবিস্তর এই ভাষা অনুশীলনের পরামর্শ প্রদান করেন[৮৪], —যদিও "উর্দ্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে।"[৮৫] এ সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণা হলো, "আরবী এবং উর্দ্দুকে বাদ দিয়া বাঙলায় বাঙ্গালী মুসলমানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইবে না", অতএব "আরবীকেই জাতীয় ভাষার পদে বরণ করিতে হইবে।"[৮৬] শুধু তাই নয় "মুসলমানের জাতীয় ভাষা যে আরবী, একথা ভুলিলে মুছলমানের সর্ব্বনাশ হইবে।"[৮৭] এই বিতর্কের একটা অশুভ ফল হলো, পারস্পরিক ভাব আদান প্রদানের দোহাই পেড়ে আরবি হরফে বাঙলা লেখার প্রস্তাব প্রদান।[৮৮]

মাতৃভাষা ও জাতীয়ভাষা বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা বানান ও শব্দ নিয়েও তুমুল বিতর্কের সূচনা হয়। এই বিতর্কের একটা বৈশিষ্ট্য হলো সবাই এই ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতি। মাওলানা আকরম খাঁর মতে, "পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে সম্যকরূপে উপলব্ধি হইবে যে, পার্সী-আরবীবহুল উর্দ্দু বা সংস্কৃত শব্দ পরিপূর্ণ হিন্দি ইহাদের মধ্যে কোনটাই আমাদের রাষ্ট্রভাষার আসনে বসিবার অধিকারী নহে—রাষ্ট্রের আসনে বসিবে দু'য়ের মাঝামাঝি জনসাধারণের কথার ভাষা।"[৮৯] শেখ হবিবর রহমান "মুসলমানী ভাব ও শব্দ" বাঙলা ভাষায় ঢুকানোর ব্যাপারে কোন আপত্তি না করলেও তিনি অভিধান ঘেঁটে আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহারের বিরোধী।[৯০] এই প্রসঙ্গে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মত প্রকাশ করেছেন, "কোন বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার করিলেই যে, তাহা হিন্দুদিগের ভয়ে বা তাহাদের মন যোগাইবার জন্য করা হয় এইরূপ অনুমানের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।"[৯১] তিনি "যাবতীয়

বাঙ্গালা শব্দ [illegible] ব্যবহারের পক্ষে।"[৯২] অনেকে শুধু আরবী ফারসী শব্দ [illegible] করে ভাষার মধ্যে "মুসলমানী ভাব ও মুসলমানী আদর্শ প্রচার" করা[৯৩] অথব "বাঙ্গাল সাহিত্যের মধ্যে একটা ইসলামী সত্বা বা spirit আনয়ন" করার[৯৪] পক্ষপাতি ; তবে "লক্ষ্যহীনভাবে" মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতি নন।[৯৫] এই বিতর্কের সার কথা বলেছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, "খোদা, পয়গম্বর, বেহেশ্‌ত, দোখজ, ফেরেশ্‌তা, নমাজ রোজা প্রভৃতি পারসী শব্দ যদি ব্যবহার করিতে আপত্তি না থাকে, তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন ? পানি, চাচা, নানা, দাদা, ফুফু প্রভৃতি শব্দ গুলি ত হিন্দী বা রাজপুতানী। ইহাদের জন্য এত মারামারি কেন ?"[৯৬]

মাতৃভাষা বিতর্কে এসময়কার মুসলমানদের ভেতর শুধু যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো তা নয়, অনেকে এ প্রসঙ্গে খানিকটা বিভ্রান্তিকর অবস্থায়ও পড়েছিলেন। কারণ তাঁদের পক্ষে মাতৃভাষা হিসেবে বাঙলা পরিত্যাগ করা যেমন সম্ভব ছিলোনা, তেমনি ফারসি-উর্দুর মায়া কাটিয়ে ওঠাও সম্ভব হয়নি। অথচ এতগুলো ভাষা শেখা যে মুসলমান ছাত্রদের জন্যে খুব শুভ ফলদায়ক নয় সেটিও তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।[৯৭] একারণে এ ব্যাপারে অনেকের ভেতর পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনার উদয় হয়েছিলো। মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, সৈয়দ এমদাদ আলি, মাওলানা ফরবোখ আহমদ নেজামপুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রমুখ স্বনামখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকও এই পরস্পরবিরোধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। বহি-রাগত ধর্মের সঙ্গে দেশী ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালাতে গিয়েই তাঁরা এই অবস্থার শিকারে পরিণত হন।

॥ চার ॥

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার কারণ যাই থাক না কেন জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিন্দুরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়ান।[১৮] এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম ধাক্কা (মাতৃভাষা-বিরোধ) কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বাঙলা সাহিত্যের দিকে। এখানে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের শিল্পসাহিত্যক্ষেত্রে বিধৃত মুসলিমবিদ্বেষ একটা বিরাট প্রতিবন্ধক হিসাবে দণ্ডায়মান। এই বিদ্বেষ মূলত উদগীর্ণ হয়েছে ভারতবর্ষে কয়েশ বছরের মুসলিম শাসনকে কেন্দ্র করে। ফলে সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম সমাজ এই প্রচারণার বিরুদ্ধে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। যদিও এর বহিপ্রকাশ ঘটে বিকৃত অনুকরণজনিত স্থূল সৃষ্টিকর্মের ভেতর দিয়ে, তবু বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়—যাকে অনেকক্ষেত্রেই যুক্তিপূর্ণ আখ্যা দেওয়া যায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'ই (১৮৫৭) প্রথম হিন্দু পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীর প্রেমের চিত্র অংকন করা হয়। কিন্তু মুসলমানদের দৃষ্টি এই গ্রন্থের প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয়নি। এর কারণ তাঁদের অজ্ঞতাও হতে পারে, আবার মুসলিম শাসন সম্পর্কে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উদার ও সহনশীল মনোভাবের[১৯] প্রতি সম্মান প্রদর্শনও হতে পারে। অথবা সামগ্রিকভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা কম বলেই হয়তো তাঁর রচনার প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে ভূদেব বাবুর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র তেমন পার্থক্য নেই। উপরন্তু ভূদেব বাবুর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র শক্তিশালী লেখক বলে তাঁর গ্রন্থের শিল্পমূল্যও অনেক বেশি। তবু মুসলিম লেখকদের হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি।

মোহাম্মদ হবিবর রহমান, ওসমান, কৎলু খাঁ ও বীরেন্দ্র সিংহের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে বীরেন্দ্র-বিমলার অবৈধ

সম্পর্কের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১০০] আবদুল মালেক চৌধুরী তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রের ভেতর আয়েষা, দলনী বেগম রোশেনারা, জাহানারা, জেবুন্নিসা সম্পর্কে আলোচনা করে দেখিয়েছেন "অমর লেখনীপ্রসূত উদ্ভট কল্পনাবিজড়িত প্রত্যেক মুসলমান রমণীই বাঙ্গালার আবহাওয়ার গুণে এমনই কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা অতীব দুঃসাধ্য।'[১০১] অথচ এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতিশোভিত বাঙলাদেশের আবহাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মসমর্পণপ্রবণতা প্রশংসা অর্জন করতে পারতো। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মীর কাসিম, তকির্খাঁ প্রমুখ চরিত্রের বিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১০২] তাঁর ধারণা মুসলিম-বিদ্বেষ বঙ্কিমচন্দ্রের হাড়ে হাড়ে বিজড়িত।[১০৩] বঙ্কিমচন্দ্রের এজাতীয় রচনার জন্যে "তিনি যে চিরকাল এক বৃহৎ সম্প্রদায়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকিবেন" এমন সন্দেহ করেছেন মোহাম্মদ আবদুল হাকিম।[১০৪]

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রে আরও গভীর। তিনি লক্ষ্য করেছেন, "কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শিষ্যান শিষ্য হারাণ, নরান, মধু, যদু চুণীরাম পুঁটিরাম, পাঁচুরাম, পর্য্যন্ত" প্রায় সব সাহিত্যিক "অসূর্য্যম্পশ্যা বাদশাজাদীগণকেও হেরেমের নিভৃত কক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া গাজাখুরী-কল্পনা বলে কাহাকেও বা পার্ব্বত্যমুষিক নারীহন্তা, নরপিশাচ শিবাজীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী, কাহাকেও বা শুকরভোজী রাজপুতের প্রেমাভিলাষিনী, কাহাকেও বা হিন্দু গোলামের চরণে সেবিকারূপে চিত্রিত এবং থিয়েটারে অভিনয় করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিতেছেন।" একারণে তাঁর সিদ্ধান্ত হলো "প্রত্যেক লেখকই এক একটি মুসলমান শত্রু দ্বিতীয় বঙ্কিম বা দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র।"[১০৫] শিরাজী শুধু যে হিন্দু লেখকদের সম্পর্কে তাঁর মনের ক্ষোভ প্রকাশ

করেছেন তা নয়, তিনি তাঁর রচিত উপন্যাসের অনেকগুলোতেই মুসলিম বীরের সঙ্গে হিন্দু রমণীর প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন।[১০৬] তিনি মীর মশাররফ হোসেনকে "বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ" মনে করেন।[১০৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শিরাজীর রাজনৈতিক মতামত তুলনামূলকভাবে উদার। "কংগ্রেসী রাজনীতিকে তিনি মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্যার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গঠিত হয়, তিনি তাতে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন"।[১০৮] ইসমাইল হোসেন শিরাজী সম্পর্কে স্থানান্তরে আলোচনা করা হবে।

এপর্যায়ে যেসব শিল্পী এবং তাঁদের শিল্পকর্ম মুসলমানদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে সেগুলো হলো কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু' কাব্য; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী'; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্ত', 'বিবিধ প্রবন্ধ'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুরাশা', 'গীতাঞ্জলি'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দুর্গাদাস', 'সাজাহান,' 'নুরজাহান', 'মেবার পতন' ইত্যাদি।

অবশ্য এসব আলোচনায় মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন সৈয়দ এমদাদ আলি এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রশংসা করে বলেছেন, "তাঁহার শেষ জীবনে যে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষার প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। উহা বুঝিতে কাহাকেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।"[১০৯] গোলাম মোস্তফা লক্ষ্য করেছেন, "কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতি-কবিতায় যে ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করেছেন, তাহার সহিত ইসলামের সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে-কোন মুসলমান অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। বাংলা ভাষার আর কোন কবি এমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই। শুধু বাংলা ভাষা কেন, জগতের কোন অমুসলমান কবির হাত দিয়াই এমন লেখা বাহির হয় নাই। ...বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যে কোথাও

আমরা ইসলাম বিদ্বেষ খুঁজিয়া পাই নাই বরং তাঁহার লেখায় এত ইসলামী ভাব ও আদর্শ আছে যে তাঁহাকে অনায়াসে মুসলমান বলা চলে।"[১১০] শাহাদৎ হোসেন নাট্যকার গীরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রশংসা করেছেন।[১১১]

এই সময় মুসলিম পত্র-পত্রিকা শুধু যে হিন্দু লেখকদের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেছিলেন তা নয়, এসব পত্রিকায় কখনো কখনো মুসলিম লেখকদের সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। এসব সব সমালোচনার প্রধান শিকার ছিলেন কায়কোবাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম। কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ফজলুর রহমান খাঁ লক্ষ্য করেছেন, "মুসলমান কবি আসুরিক শক্তি ব্যতীত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অন্য শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হন নাই।"[১১২] মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির অভিযোগ, "আদিরসের আতিশয্যে সমস্ত কাব্যখানাই এত রসিয়া রহিয়াছে যে, অন্যসব লেখার দাগ মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ...মহাশ্মশানের সকল উপমার প্রশংসা করা যাইতে পারে না। বহু উপমা হিন্দু দেবতার কাহিনী হইতে গৃহীত।"[১১৩] যত বিতর্কমূলক হোকনা কেন সৈয়দ এমদাদ আলীর বক্তব্যে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রয়েছে। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন, কায়কোবাদ "এই সুবিপুল কাব্যে হিন্দু-মুসলমানকে এক মিলনক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারেন নাই।" —তবে তিনি মনে করেন, কায়কোবাদ "কবি—খাঁটি কবি।"[১১৪] মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এই মহাকাব্যের নাম সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। কারণ "শ্মশান বলিতে হিন্দুর 'চিতাভূমি' বা মড়া পোড়াইবার স্থানই বুঝায়।"[১১৫] পক্ষান্তরে আবুল কালাম শামসুদ্দীন মনে করেন, এটি একটি প্রথম শ্রেণীর কাব্য কিন্তু "এখনো বাঙ্গালী মুসলমান কাব্য রসাস্বাদনে অভ্যস্থ নহেন,—নৈতিক উপদেশের গভীর নিনাদে এখনো তাঁহাদের কর্ণ বধির হইয়া আছে,

কাব্যের মধুর ঝঙ্কার এখনো তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ লাভ করেন নাই" বলেই তাঁরা কাব্যটির উপযুক্ত সমাদর করতে পারছে না।[১১৬]

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও তৎকালীন পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য করা হয়। মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ মনে করেন, "এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। ...খোদাদ্রোহী নরাধম নাস্তিকদিগকেও পরাজিত করিয়াছে।"[১১৭] সৈয়দ এমদাদ আলীর ধারণা হলো, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় "দু' একটি মোছলমানী শব্দ থাকিলেও উহার ভিতরের সব জিনিসটা, হিন্দু মতে বলিতে গেলে, উহার কাঠামো হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের সাজ-সজ্জা পর্য্যন্ত সবই, হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত।"[১১৮] এসব লেখার সারবস্তু বলতে কিছু নেই। শুধু ধর্ম আর সংস্কৃতির নামে সাধারণ পাঠকের মনে ঘৃণা উদ্রেক করাই এর উদ্দেশ্য। তাঁর জাতীয় প্রেরণামূলক প্রায় সব কবিতাই ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ তাঁর কবিতার প্রশংসাও করেছেন এবং তার অন্তস্থিত প্রাণশক্তি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। যেমন আবুল কালাম শাম-সুদ্দীন উপলব্ধি করতে পেরেছেন, "নজরুল ইসলাম বাঙ্গালার জাতীয় কবি। জাতির বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙ্গালী জাতি। সুতরাং এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিতে হইলে রচনায় ইসলামী এবং হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় প্রকাশভঙ্গীর ছাপই দিতে হইবে, নতুবা রচনা সহজ ও সুন্দর হইবে না।"[১১৯] শুধু তাই নয় 'মোযাজ্জিন' পত্রিকার সম্পাদক নজরুল ইসলামের সংবর্ধনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট, ছন্দনৈপুণ্য, শব্দচয়ন চাতুর্য্য ও উদ্দাম উদ্দীপনায় বিচ্ছুরিত বহ্নিশিখা বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে।"[১২০] এমন কি জনৈক লেখক নজরুল কর্তৃক হিন্দু মহিলা বিয়ে করার প্রশংসা করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন

"ইহাতে হিন্দু মোছলেম প্রীতির অদূরবর্ত্তী উজ্জ্বল ভবিষ্যতই সূচিত হইতেছে।"[১২১]

শুধু ব্যক্তি সম্পর্কেই নয়, এই সময় পত্রপত্রিকায় গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী উপন্যাসকে "গাঁজার দম দিয়া একটি গল্পের স্রোত বহাইয়া" দেওয়া বলে ব্যঙ্গ করেছেন,[১২২] কেউবা "মুসলমানের উপন্যাস ও নাটকের ভিতর একটা মুসলমানী গন্ধ" প্রত্যাশা করেছেন।[১২৩] গোলাম মোস্তফা মনে করেন, "গল্প উপন্যাসের যদি সেরূপ কিছু মূল্যই না থাকিবে তবে বোধ হয় আজ আমরা এত শীঘ্র হিন্দুদের জাতীয় জাগরণ দেখিতে পাইতাম না।"[১২৪] নাটক অভিনয়ের যেমন সমালোচনা করা হয়েছে,[১২৫] তেমনি অতীতের ইতিহাসকে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরার দাবিও বেশ সোচ্চার।[১২৬] এই সময়কার পত্র-পত্রিকায় নাটক ও থিয়েটারের সমালোচনা বেশ হয়েছে। এছাড়া এসময় বাঙলা সাহিত্যে হিন্দুমুসলিম অবদানও অনেকের হাতে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ধারাদ্বয় "বঙ্গসাহিত্যের গঙ্গা যমুনা রূপী দুই ধারা" বলে উল্লিখিত হয়েছে।[১২৭] কারণ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন "বঙ্গভাষা দেবভাষা সংস্কৃতের দুহিতা হইলেও মুসলমান-ধাত্রীর ক্রোড়াশ্রয়েই ইহা প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।"[১২৮]

* * *

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিলো তা আজ মুলত দুটো কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত, কলকাতার বাইরে যে বৃহত্তর জনসমষ্টি জীবনের বিপুল কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত, এই নবজাগরণে তাঁদের কোন ভূমিকা নেই। এমনকি নবজাগরণের নায়কদের সৃষ্টিকর্মেও তাঁরা অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যার দিক দিয়ে বঙ্গদেশের (Bengal proper) বৃহত্তর সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা তো নয়ই, এমনকি তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকৃত। অতএব একে অনেকে নবজাগরণ বলতে চান না।

নবজাগরণের সংজ্ঞা নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও বলা যায় এই বক্তব্যে সত্যতা রয়েছে। কারণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে বঙ্গদেশের বিপুল জন-প্রবাহের সঙ্গে এদের যোগহীনতা অনস্বীকার্য।

মুসলিম সম্প্রদায়ের কর্মধারায় সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রেও কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য। ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনে সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনসাধারণ যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে নেতৃত্বের হাত বদলের ফলে গোটা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পৌর-হিত্য এমনসব লোকের হাতে চলে গিয়েছিলো যাঁদের জনসাধারণের প্রতিনিধি তা বলা যায়ই না, বরং বৃহত্তর মুসলিম গণজীবনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কহীন বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সমগ্র ভারতবর্ষে আলিগড় আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এই হাতবদল সূচিত হয়। ১৯০৬ সালে এই দলই সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্যবিধাতা হয়ে হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু প্রকৃত বিধাতার মতো তাঁরাও বহু উপর থেকে জনসাধারণকে অবলোকন করতে থাকেন। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত মুসলিম জনসাধারণকে শুধু চালের ঘুঁটি হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। বঙ্গদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সেজন্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি যত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার গণভিত্তি যাই থাকনা কেন, এসব আন্দোলনে মুসলিম জনসাধারণের কোন ভূমিকা ছিলোনা। কারণ নেপথ্যে যারাই কলকাটি ঘুরান না কেন, 'আশরাফ' মুসলমানদের অঙ্গুলি হেলনেই মুসলিম জনসাধারণ মূলত পরিচালিত হয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যে কি পরিমাণ অসহায় ছিলেন, তা বঙ্গভঙ্গের সময় নবাব খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুরের ভূমিকায় বিধৃত। প্রথমদিকে তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন। পরে সরকারের কাছ থেকে টাকা কর্জ নিয়ে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন করেছেন। নিয়তির নির্মম পরিহাস, হিন্দু মহাজনের তাগাদায় নিরাপদ আশ্রয়ের

খোঁজে সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়েও তিনি রেহাই পেলেন না, শেষে তাঁকে সরকারী প্রয়োজনেই বঙ্গভঙ্গ রদ প্রস্তাব মেনে নিতে হলো। অথচ এই সময়কার বিভিন্ন আন্দোলনে হিন্দু সমাজের সার্বিক অংশগ্রহণ এবং বিত্তবান হিন্দুদের নেতৃত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা ও সৎসাহস অভূতপূর্ব। জাতীয় কংগ্রেসের ভেতর মতভেদ এবং তজ্জনিত বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি তার প্রমাণ।

এখন ভাবতেও অবাক লাগে যে, যে হিন্দু-মুসলিম উচ্চ ও মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিয়ে শহরে তুলকালাম কাণ্ড করে বসছেন, তাঁদেরই অনুসারী সেই 'মূঢ় ম্লান মূক' জনসাধারণ পরম নিশ্চিন্তে ও নির্ভরতায় পরস্পরের ধর্ম, সমাজ ও রীতি-নীতিকে যথাযথ সম্মান করে দিনাতিপাত করছেন। মাঠে ঘাটে পরস্পরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এঁরা জারি-সারি-ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া গাইছেন, একই আকাশের চাঁদোয়ায় তাঁরা পরস্পরের সুখ ও দুঃখের অংশীদার হিসেবে স্ব স্ব আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করছেন। এই সময়কার মুসলিম জনসাধারণের প্রকৃত ভূমিকা তথা তাঁদের ধর্ম প্রেরণা, জীবনীশক্তি ও সবলসরলতা দুটো জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়ে গেছে। এর একটা হলো, সৈয়দ-শেখ-গাজি-খান বাহাদুরের দুর্মর আভিজাত্য—যা সর্বদাই নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, অন্যটি সদ্যগুরুত্বপ্রাপ্ত পাট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গজিয়েওঠা মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী—যাঁরা বৈষম্য সত্ত্বেও সর্বক্ষেত্রেই আভিজাত্যের ধ্বজাধারীদের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন মুখে শ্রেণীহীন সমাজের বুলি আওড়িয়ে। অতএব এই পর্বে মুসলমান বলতে সর্বদাই এঁদের বুঝতে হবে। তবু মুসলিম-মানসে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা কম কথা নয়। এই পর্বের সার্বিক মূল্যায়ণে একথা মনে রাখতে হবে।

পাদটীকা

১ Yahya Armajani, 'Middle East Past and Present' (New Jarsey, 1970) 108 : "To the early Muslim mind, philosophy was a "foreign Science" and as such it was a challenge to Islamic theology".

২ Yahya Armajani, op. cit., 115. কবিতার প্রতি হযরত মোহাম্মদের এই মনোভাব সত্য হলেও একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামের আদিযুগে আরবে ব্যাপক কাব্যচর্চা হতো এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও তর্কবিতর্কে কবিতার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। একারণে অনেকে কবিতার মাধ্যমে ইসলামধর্ম ও হযরত মোহাম্মদকে সমর্থন প্রদান করতেন। যেসব কবি ইসলামের পক্ষে কাব্য-রচনা করতেন তাঁদের ভেতর হাসান বিন সাবেতের নাম বিশ্ববিখ্যাত।

৩ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, "মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ", 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯৭৪) ৩২।

৪ Yahya Armajani, op. cit., 117.

৫ Ibid, 118.

৬ মাওলানা রূহুল আমিন, "গীতবাদ্য হারাম হইবার প্রমাণ", ইসলাম-নূর ; ফাল্গুন, ১৩৩২, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' (ঢাকা, ১৯৭৭) ৯৯।

৭ মোহাম্মদ আক্রম খাঁ, "সমস্যা ও সমাধান", মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৩৫। মুস্তফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১০০।

৮ ইমাম গাজ্জালী, 'কিমিয়ায়ে সাআদাত', দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা, ১৯৭৪) ২১৯।

৯ Yahya Armajani, op. cit., 72 : "A profession denounced by the Prophet."

১০ ইমাম গাজ্জালী, প্রাগুক্ত, ২১৭।

১১ Yahya Armajani, op. cit., 72 : Syed Ameer Ali, 'History of the Saracens' (London, 1955) 202.

১২ আ. ম. হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, ৪১।

১৩ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, 'পারস্য প্রতিভা' (ষষ্ঠ-স , ঢাকা, ১৯৬৪) ৪।

১৪ Yahya Armajani, op. cit., 55.

১৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' (কলকাতা,

১৩৭৯) ৫ঃ "বাংলা ভাষা তার রূপ পেল ইসলামের আসার পর ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের ছোঁয়াচ লেগে।"

১৭ মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (দ্বি-স ; ঢাকা ১৯৬৫) ৫৩-৫৪

১৮ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (ঢাকা, ১৯৬৩) ১১৫।

১৯ প্রাগুক্ত।

২০ প্রাগুক্ত, ১১৭।

২১ Qazi Abdul Mannan, 'The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal' (2nd ed., Dacca, 1978) 45-50.

২২ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১১৭-১১৯। এর সপক্ষে আনিসুজ্জামান বিভিন্ন কাব্য থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

২৩ আহমদ শরীফ, "দোভাষী পুঁথির ভাষা", 'বিচিত চিন্তা' (ঢাকা, ১৯৬৮) ২০৭।

২৪ F. E. Keay, 'A History of Education in India and Pakistan', (4th ed. London, 1964) 107.

২৫ বিনয় ঘোষ, 'বাঙলার নবজাগৃতি' (কলকাতা, ১৩৫৫) ৯৮-৯৯। আবু জাফর শামসুদ্দীন, নওয়াব আবদুল লতিফের 'মুসলিম বাঙ্গালা ঃ আমার যুগে'র ভূমিকা (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা, ১৯৬৮) দুই। সৈয়দ আবদুল আগফারের পত্র 'মিহির ও সুধাকর', ৮ই পৌষ, ১৩০৬, উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' (ঢাকা, ১৯৬৯) ১৪।

২৬ মোহাম্মদ আজিজুল হক রচিত 'বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা' (অনুবাদ ঃ ঢাকা, ১৯৬৯) ১৫।

২৭ আবদুল মওদুদ, 'ওহাবী আন্দোলন' (ঢাকা, ১৯৬৯) ১২৩।

২৮ 'সোম প্রকাশ' (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৮) বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৬৬) ২৩৪।

২৯ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, "ভারতে ওহাবী আন্দোলন", প্রাগুক্ত, ২৩০।

৩০ W. W. Hunter, 'Indian Musalmans' (Dacca, 1975) 145.

৩১ Ibid, 141.

৩২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২৭। Ram Gopal, 'Indian Muslims' (Bombay, 1964) 14. ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের পূর্বপুরুষ, হবিবুল্লাহ মৃত্যুর সময় তাঁর উত্তরাধিকারী আলিমুল্লাহকে যে দুটো উপদেশ প্রদান করেছিলেন তার একটা হলো "কৃষক যেন হয় মুসলমান, তবে নায়েব গোমাস্তা

রাখবে সব হিন্দু।" দ্রষ্টব্য: সিরাজুল ইসলাম, "নবাব পরিবারের উত্থান ও পতন", বিচিত্রা, (১৮ আগষ্ট, ১৯৭৮) ২৮।

৩৩ A. R. Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal' (2nd ed. Dacca, 1977) 193.

৩৪ Qazi Abdul Wadud, 'The Musalmans of Bengal', 'Studies in the Bengal Renaissance' [ed.] Atul Chandra Gupta (Calcutta, 1958) 468.

৩৫ Abdool Luteef, "Short Account of my Humble Efforts to Promote Education, Specially among the Mahomedans", 'Nawab Bahadur Abdul Latif His writings & Related Documents' [ed] Enamul Haque (Dacca, 1968) 187

৩৬ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (দ্বি-স ; ঢাকা, ১৯৬৯) ৬১।

৩৭ A. R. Mallick, op. cit., 195 : "The Naib Nszim or the principal officer of the Native Courts of Law also instructed that whenever vacancies should arise in the Faujdari Courts, they should be filled from the students of the Madrasah upon the production of certificates from the superior to the effect that the individuals nominated by him were duly qualified for their respective appointments".

৩৮ সরদার ফজলুল করিম, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস: অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকার" বিচিত্রা (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৭) ১৬।

৩৯ প্রাগুক্ত।

৪০ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', ৩০-৩১।

৪১ সরদার ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, ১৬।

৪২ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ৩৯। 'সমাচার দর্পণ', ১১ জুলাই ও ২১ অকটোবর ১৮১৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [সংকলিত ও সম্পাদিত], 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, (চতুর্থ-মু ; কলকাতা. ১৩৭৭) ৩।

৪৩ আবদুল মওদুদ, 'ওহাবী আন্দোলন' (ঢাকা, ১৯৬৯) ১৯৭।

৪৪ 'সোম প্রকাশ', ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৮। বিনয় ঘোষ [সম্পাদিত ও সংকলিত]

প্রাগুক্ত, ২৩৫। A. R. Mallick, op. cit., 207.

৪৫ Pradip Sinha, 'Ninteenth Century Bengal' (Calcutta, 1965) 37.

৪৬ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (পঞ্চম-স ; কলকাতা, ১৩৭৯) ২১২।

৪৭ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্মজীবনচরিত' (কলকাতা) ৩৭।

৪৮ William Adam, 'Reports on the state of Education in Bengal' [ed.] Anathnath Basu (Cal 1941) 279 280, 283, 287 & 290

৪৯ মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, ৯২।

৫০ মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী' (কলকাতা, ১৩৮৪) ১৪৮।

৫১ প্রাগুক্ত।

৫২ প্রাগুক্ত, ৭৮ ঃ "বিশেষ বিদ্যার চর্চা লেখাপড়ার চর্চা ও অঞ্চলেই ছিল না। তবে কোন কোন গ্রামে গুরুমশায়ের পাঠশালা ছিল। মক্তব মাদ্রাসার নামও কেউ জানিত না। ফারসী আরবী কেহ পড়িত না। অভিভাবকেরাও প্রয়োজন মনে করিতেন না।"

৫৩ বদরুদ্দীন উমর, 'মুসলিম সংস্কৃতির সংকট' (ঢাকা, ১৯৬৭) ৪২।

৫৪ প্রাগুক্ত, ৪১।

৫৫ Sufia Ahmed, 'Muslim Community in Bengal' (Dacca, 1974) 50.

৫৬ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (দ্বি-স ; কলকাতা, ১৯৫৭) ৪৭।

৫৭ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' (চতুর্থ বার , কলকাতা, ১৩২০) ১৩।

৫৮ "বিদ্যাসাগর চরিত", 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা, ১৯৬৯) ৩৭৩-৭৫।

৫৯ Anil Seal, 'The Emergence of Indian Nationalism' (London, 1971) 60 "In eastern Bengal where Muslims were conspicucusly absent from college and high school, this was because they were poor and lowly not because they were prejudiced by their religion aginst the new learning".

৬০ A. R. Mallick, op. cit., 227.

৬১ Ibid, 215.

৬২ Anil Seal op. cit., 307.

৬৩ Abdool Luteef, op. cit., 189.

৬৪ মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, ২৭-২৮। বদরুদ্দীন উমর, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' (ঢাকা, ১৯৭৪) ৪৭।

৬৫ বদরুদ্দীন উমর, "উনিশ শতকের মুসলিম শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চা", 'সভ্যতার সংকট', ৫৮।

৬৬ কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, ৮১।

৬৭ Anil Seal, op. cit., 311 : "In their [Amir Ali and his followers] educational schemes they ignored religion".

৬৮ কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, ৭৬।

৬৯ প্রাগুক্ত। মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, ৪৩।

৭০ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ৭৫।

৭১ কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, ৭৫। মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, ৩০৩ : "মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় তখনও অতীত গৌরবের গোরস্থানে বসিয়া বাঙালী মুসলমানের ভাষা 'বাংলা' কি 'উর্দু'—সে বিচার লইয়া মশগুল। কিছুদিন পরই সমিতি পড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া, তাঁহারা বাংলার জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানদের ভাষা বাংলা নহে, 'দোভাষী-বাংলা'ও নহে, একেবারে সরাসরি উর্দু।"

৭২ "বঙ্গীয় মোসলমান ভাই বহিনের খেদমতে নূর-আল-ইমানের আপীল", 'নূর-আল-ইমান'; ১৩০৭। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩১৩।

৭৩ হামেদ আলী, "উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য", 'বাসনা', বৈশাখ, ১৩১৬ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩১৫

৭৪ মোহাম্মদ আকরম খাঁ কর্তৃক তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ : আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ২১৪।

৭৫ প্রাগুক্ত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩১৯।

৭৬ সৈয়দ এমদাদ আলী, "বাংলাভাষা ও মুসলমান", 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৩২৫ ; প্রাগুক্ত, ৩১৮।

৭৭ খাদেমোল এসলাম বঙ্গভাষী, "বাঙ্গালীর মাতৃভাষা", 'আল-এসলাম', কার্তিক, ১৩২২।

৭৮ "মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান", নবনূর', পৌষ, ১৩১০ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩১৩।

৭৯ আবদুল হক চৌধুরী, "মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতন", 'ইসলাম-প্রচারক', প্রাগুক্ত, ৩১৪।

৮০ হামেদ আলী, প্রাগুক্ত, ৩১৫।

৮১ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, "বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য", 'কোহিনূর', মাঘ ১৩২২ ; আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১৩৩।

৮২ "বাঙ্গালা ভাষার অনাদর" (সম্পাদক) 'নূর', ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩২১।

৮৩ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, "উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য", 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা', বৈশাখ, ১৩২৮ ; আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ২৪২।

৮৪ এসলামাবাদী, "বঙ্গীয় মোসলমান ও উর্দ্দু সমস্যা", 'আল-এসলাম', আশ্বিন, ১৩২৪। বশারত আলী, "উর্দ্দু-সমস্যা", প্রাগুক্ত, অগ্রাহায়ণ, ১৩২৫।

৮৫ মোহাম্মদ আকরম খাঁ কর্তৃক তৃতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ, আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ২১৮।

৮৬ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য", 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা', মাঘ, ১৩২৫ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩২৫।

৮৭ মোহাম্মদ আকরম খাঁ কর্তৃক তৃতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ, আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ২১৮।

৮৮ খাদেমোল এসলাম, "বাঙ্গালীর মাতৃভাষা", 'আল-এসলাম', অগ্রাহায়ণ, ১৩২২। এই প্রবন্ধে আরবী হরফে বাঙলার নমুনাও প্রদান করা হয়েছে।

৮৯ মোহাম্মদ আকরম খাঁ কর্তৃক তৃতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩২৭।

৯০ শেখ হবিবর রহমান, "জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান", আল-এসলাম, বৈশাখ ১৩২৩।

৯১ শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, "বঙ্গ-সাহিত্যে ইসলামী শব্দ", 'ইসলাম-দর্শন', অগ্রাহায়ণ, ১৩২৮ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩৩৫।

৯২ প্রাগুক্ত, ৩৩৬।

৯৩ সৈয়দ এমদাদ আলী, "বঙ্গভাষা ও মুসলমান", 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৩২৫, আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ২১০।

৯৪ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, "বাঙ্গালা সাহিত্যে ও মুসলমান", 'সাহিত্যিক', আশ্বিন, ১৩৩৪ , মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩৩১।

৯৫ প্রাগুক্ত।

৯৬ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক দ্বিতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ ; আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ২০৪-২০৫।

৯৭ 'মিহির ও সুধাকর' ৮ পৌষ, ১৩০৬ , আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১৪। মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত ৫৫।

৯৮ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', ৯০।

৯৯ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "সামাজিক প্রবন্ধ" 'ভূদেব রচনা-সম্ভার' (তৃ-স ; কলকাতা, ১৩৭৫) ১৪, ১৫।

১০০ মোহাম্মদ হাবিবর রহমান "ওসমান ও জগৎসিংহ", 'নবনূর', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত ৩৫১।

১০১ আবদুল মালেক চৌধুরী, "বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান লেখকের স্থান", 'আল-এসলাম', বৈশাখ, ১৩২২ , মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩৫২।

১০২ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, "সাহিত্যগুরুর বাঙ্গালী প্রীতি", 'আল-এসলাম', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ প্রাগুক্ত, ৩৫২।

১০৩ প্রাগুক্ত অগ্রাহায়ণ, ১৩২৫ : প্রাগুক্ত, ৩৫৪।

১০৪ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, "বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান", 'ইসলাম-দর্শন', ফাল্গুন, ১৩২৭ ; প্রাগুক্ত, ৩৫৪।

১০৫ সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী, "মুসলমান ও হিন্দু গ্রন্থক 'ইসলাম-প্রচারক', অগ্রাহায়ণ-পৌষ, ১৩১০ , প্রাগুক্ত, ৩৫৫-৫৬।

১০৬ 'রায়নন্দিনী'তে ঈশা খাঁ ও স্বর্ণময়ী , 'তারাবাঈ'-তে তারাবাঈ ও আফজল খাঁ ; 'নূরউদ্দীনে' নূরউদ্দীন ও বুক্সিনী।

১০৭ সিরাজী, "বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা", আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৪।

১০৮ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ৪০১-০২।

১০৯ সৈয়দ এমদাদ আলী, "বঙ্গভাষা ও মুসলমান", 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', শ্রাবণ ১৩২৫ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩৫৩।

১১০ গোলাম মুস্তফা, "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ", 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' শ্রাবণ, ১৩২৯ ; প্রাগুক্ত, ৩৬৪।

১১১ শাহাদাৎ হোসেন, "বর্ত্তমান নাট্য সাহিত্য", 'সওগাত', অগ্রাহায়ণ, ১৩২৫ ;

আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' ২৫৮।

১১২ ফজলর রহমান খাঁ, "মহাশ্মশান কাব্য", 'নবনূর', মাঘ, ১৩১২ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩৫৮।

১১৩ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "মহাশ্মশান সম্পর্কে দুই একটি কথা", 'সওগাত', শ্রাবণ, ১৩২৬ ; প্রাগুক্ত, ৩৬০।

১১৪ সৈয়দ এমদাদ আলী, "প্রতিবাদ—আমার উত্তর", 'সওগাত', কার্তিক, ১৩২৬ ; প্রাগুক্ত, ৩৬১।

১১৫ মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ, "মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় ইসলামের অবমাননা", 'ইসলাম-দর্শন', ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৭ ; প্রাগুক্ত, ৩৬২।

১১৬ আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, "মহাশ্মশান কাব্য", 'সওগাত', আষাঢ়, ১৩২৭ ; প্রাগুক্ত, ৩৫৯।

১১৭ মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, "লোকটা মুসলমান না শয়তান", 'ইসলাম দর্শন' কার্তিক, ১৩২৯ ; প্রাগুক্ত, ৩৭২।

১১৮ সৈয়দ এমদাদ আলী, "বঙ্গভাষায় মোছলেম প্রভাব", 'ছোলতান', ১৭ ফাল্গুন, ১৩৩০, প্রাগুক্ত, ৩৭৪।

১১৯ আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, "কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান", 'সওগাত', পৌষ, ১৩৩৩, প্রাগুক্ত, ৩৭৭।

১২০ 'মোয়াজ্জিন', কার্তিক, ১৩৩৫, প্রাগুক্ত, ৩৭৮।

১২১ এ. ডি. কমরুজ্জামান, "কবি নজরুল এছলাম", 'ছোলতান', ২৯ চৈত্র, ১৩৩০ ; প্রাগুক্ত, ৩৭৫।

১২২ সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন "সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন", 'নবনূর' জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ ; প্রাগুক্ত, ৩৮০।

১২৩ মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, "আমাদের (সাহিত্যিক) দরিদ্রতা", 'আল-এসলাম' জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ ; প্রাগুক্ত, ৩৮০।

১২৪ গোলাম মুস্তফা, "আনোয়ারা (সমালোচনা)", 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' বৈশাখ, ১৩২৬।

১২৫ এবনে মউজ, "মিহির ও সুধাকরের রুচিবিকার", 'ইসলাম-প্রচারক', মার্চ-এপ্রিল' ১৯০০ , প্রাগুক্ত, ৩৮৫।

১২৬ মৌলভী ইমদাদুল হক, "গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে 'প্রতাপাদিত্য", 'নবনূর', আশ্বিন, ১৩১২ প্রাগুক্ত, ৩৮৬।

১২৭ "বাঙ্গালা সাময়িকপত্রে মোসলমানের স্থান", 'বঙ্গনূর', মাঘ ১৩২৬। আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ২৭৮।

১২৮ আবদুল করিম, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব", 'নবনূর', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১, প্রাগুক্ত, ৮০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙলা উপন্যাসের ধারা ও মুসলিমপ্রয়াস

॥ এক ॥

১৮৬৫ খ্রীঃ বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস লিখিত হয়। উপন্যাস মানেই যে শুধু কাহিনী বা তার চরিত্রের সমাবেশ নয় তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার পর প্রথমবারের মতো বুঝা গেলো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন পাশ্চাত্যরীতির উপর ভিত্তি করে বাঙলা নাটকের সূত্রপাত করেছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও পাশ্চাত্য রূপরীতিরই পুনর্বিন্যাস। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করেছি, উপন্যাস অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন শিল্পরীতি হওয়া সত্ত্বেও তা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। এই জনপ্রিয়তাই সমকালীন লেখকদের উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত করার মূল কারণ। অথচ বাঙলা সাহিত্যে নিছক আখ্যায়িকাধর্মী রচনার সূত্রপাত হয়েছে আগে থেকেই। কাব্যে রচিত বিভিন্নপ্রকার ধর্ম ও তত্ত্বনির্ভর রচনা বাদ দিলেও গদ্যে কাহিনীরচনার সূত্রপাত হয়েছে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের আরো প্রায় একযুগ আগে। মিসেস হানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্স-এর যে গ্রন্থটিকে সুকুমার সেন "আকারে ও প্রকারে উপন্যাসের মত" বলে আখ্যায়িত করেছেন[১] সেটির প্রকাশকাল ১৮৫২ খ্রীঃ। অর্থাৎ 'দুর্গেশনন্দিনী'র তের বছর আগে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য যদি উপন্যাসের মূল খুঁজতে হয় তাহলে আমাদের লৌকিক কাব্য বা গাথাসাহিত্যের শরণাপন্ন হতেই হবে। তবু আমরা এত গভীরে যেতে চাই না। কিন্তু যেসব উপন্যাস বা উপাখ্যানধর্মী রচনায় বাঙলা উপন্যাসের সম্ভাবনা লুকিয়েছিলো সেগুলোকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র আগে যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার ভেতর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপখ্যানগুলোর নামও এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তবে আমরা শুধু উপখ্যান বা উপাখ্যানধর্মী রচনাগুলোর কথাই উল্লেখ করছি।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর আগে যেসব উপখ্যানধর্মী রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তাতে উপন্যাসের বীজ নিহিত থাকলেও উপন্যাসপ্রসঙ্গে তাদের আলোচনা একেবারেই গৌণ। কারণ উপন্যাসের ক্ষীণ এক-আধটু লক্ষণ ছাড়া এসব রচনায় আর কিছুই নেই। তবে যে জীবনবোধ উপন্যাসের প্রাণমূল তা এজাতীয় রচনায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এ সব রচনার ভেতর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) ও 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এজাতীয় রচনায় কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষিত না হলেও জীবনের তাবৎ গূঢ় রহস্য চিত্রিত হয়েছে—যা উপন্যাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরবর্তীকালে রচিত নীলমণি বসাকের (১৮০৮-৬৪) 'আরব্য উপন্যাস' (১৮৪৯)' 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮৫৪), 'পারস্য উপন্যাস' (১৮৫৬) বা মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর কাব্য উপন্যাস 'মধুমল্লিকা বিলাস' (১৮৪১) এই শিল্প কর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছে। এরই ভেতর প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। বাঙলা সাহিত্যে এই প্রথম একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলো যাতে তুলনামুলকভাবে উপন্যাসের লক্ষণ বেশি। তবু একে উপন্যাস না বলাই সঙ্গত। কারণ উপন্যাসের যে দৃঢ়বদ্ধ ও কেন্দ্রগত কাহিনীর প্রয়োজন ত এতে নেই। শুধু 'আলালের ঘরের দুলাল' নয়, ১৮৬৫ খ্রীঃ আগে আরো কয়েকখানা উপন্যাসধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছে—যা এই শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করেছে। সেগুলো হলো ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৯৪) 'সফল স্বপ্ন' (১৯৫৭) ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭); ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) 'সীতার বনবাস' (১৮৬০); কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'হুতোম পঁ্যাচার নকশা' (১৮৬৯); গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়-

বল্লভ' (১৮৬৩)। এর ভেতর ভূদেব বাবুর 'সফল স্বপ্ন'কে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা যায়না। তবে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা যে-কোন উপন্যাসের জন্যে মূল্যবান। কিন্তু এই গ্রন্থেও কোন কেন্দ্রীয় ঘটনা নেই।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে উপখ্যানমূলক রচনার মাধ্যমে যে রূপকল্প ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠেছিলো তা-ই পরিণতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) হাতে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে (১৮৬৫) প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'নভেল'-এর সব লক্ষণ একযোগে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলে এর পরবর্তীকালে লিখিত সবগুলো উপাখ্যান-মূলক রচনাই যে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো এমন কথা বলা যায়না। এই উক্তির সপক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪—৭৩) 'হেক্টর বধ' (১৮৬৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) অথবা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'অভেদী'র (১৮৭১) নাম উল্লেখ করা যায়। এ জাতীয় রচনার সংখ্যা খুব বেশি নেই। কারণ 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা উপন্যাসের গতি-ধারা তীব্রতা লাভ করে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'চোখের বালি'র (১৯০৩) পর তা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস হলেও প্রকৃতপক্ষে বাঙলা আধুনিক উপন্যাসের সূত্রপাত এখান থেকেই।

॥ দুই ॥

বাঙলা উপন্যাসশিল্প যখন সার্থকতার উত্তুঙ্গে তখনো মুসলিম সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়নি। শুধু তাই নয়, বাঙলা গদ্য বিকাশের পুরো অর্ধশতাব্দী পর খোন্দকার শামসুদ্দীন সিদ্দিকীর (১৮০৬-৭৫) 'উচিত শ্রবণ' প্রকাশিত হয়। ১৮৬০খ্রীঃ প্রকাশিত এই রচনাটিই মুসলিমরচিত বাঙলা গদ্যের আদি নিদর্শন।[২] শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর 'ভাবলাভ' (১৮৫৩) ও

'গুরতজান' নামে দুখানা কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। এছাড়াও, এরূপর আরো দুজন মুসলিম গদ্যশিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন, গোলাম হোসেন ও শেখ আজিমদ্দীন। কয়েকখানা নকশা ও প্রহসন রচনা করে তাঁরা প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন।[৩]

পক্ষান্তরে মধ্যযুগীয় বাঙলা কাব্যসাহিত্যে মুসলমানদের অবদান অবিসংবাদিত। কবি শাহ মুহম্মদ সগিরের 'য়ুছুফ জোলেখা' (আনুঃ ১৩৮৯-১৪০৯) মুসলিমরচিত বাঙলা আদি কাব্য। এটি শুধু যে আদিকাব্য তা নয় "ইহাই মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পার্থিব প্রেমের কাব্য।"[৪] এই কাব্যটির আনুমানিক রচনাকাল হলো চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ।[৫] কারণ এই কাব্যের বর্ণনার মাধ্যমে অনুমিত[৬] সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহর রাজত্বকাল ১৩৯১ খ্রীঃ থেকে ১৪১০ খ্রীঃ। অবশ্য কেউ কেউ এই মত সমর্থন করেন না।[৮] তাঁদের মতে শাহ মুহম্মদ সগির চতুর্দশ শতাব্দীর কবি নন। তবে জৈনুদ্দীন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি সেব্যাপারে প্রায় সব ঐতিহাসিকই একমত পোষণ করেছেন।[৯] অর্থাৎ যেখানে মুসলমানেরা চতুর্দশ শতাব্দী না হোক, পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম বাঙলা কাব্য রচনা করেছেন, সেখানে মুসলমানদের দ্বারা প্রথম বাঙলা গদ্য লিপিবদ্ধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের (১৭৫৭) পর থেকে মুসলিম-মানসে এই অবক্ষয়ে সূচনা হলেও কাব্যক্ষেত্রে তাঁদের অবদান বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে মিশ্রভাষারীতির কাব্য নামধের এই ধারাকে আনিসুজ্জামান ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতিধারার নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন। অতএব আধুনিক সাহিত্যালোচনায় এই বিস্তৃতির কথা কোনভাবেই আসে না।

॥ তিন ॥

মুসলমানদের দ্বারা প্রথম বাঙলা গদ্য (উচিত শ্রবণ : ১৮৬০) প্রকাশিত হওয়ার নয় বছর পর মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-

১৯১২) 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ প্রকাশিত এই রচনাটিই মুসলিমরচিত প্রথম উপাখ্যানধর্মী গ্রন্থ। সুকুমার সেন "মুসলমান খ্রীষ্টান" সুজাত আলীর 'দুঃখিনীকন্যা' (১৮৬৩) নামে একখানা "গদ্য আখ্যায়িকার" সন্ধান প্রদান করেছেন। কিন্তু সেই রচনা দুষ্প্রাপ্য। উপরন্তু সুজাত আলীকে মুসলমান বলে মনে করাও ঠিক হবে না।

মীর মশাররফ হোসেন 'রত্নবতী'কে "কৌতুকাবহ উপন্যাস" বলে উল্লেখ করেছেন।[১২] কিন্তু এই গ্রন্থটিকে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা যায় না যদিও মীর সাহেবের 'রত্নবতী' প্রকাশের চার বছর আগেই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করেছে, তবু রূপে-রসে ভাবে কোন দিক দিয়েই 'রত্নবতী'তে তার ছাপ নেই। 'রত্নবতী' একটি অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনুসরণে একটি নীতিকথাকে কেন্দ্র করে উপাখ্যানটি প্রণীত। এই উপাখ্যানের মাধ্যমে একটি সুপ্রচলিত প্রশ্নের সমাধান প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, "ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ ?"[১৩] লেখক কাহিনীটিকে কাল্পনিক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মনে হয়, কোন প্রচলিত লোককাহিনী থেকে তিনি এই উপাখ্যানের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

রাজকন্যা রত্নবতীকে কেন্দ্র করে একটি কহিনী লেখক গড়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু কাহিনীতে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারেননি। সাধারণ রূপকথা বা লোককাহিনীর মতো সামন্তরাল বেগে এর ঘটনাধারা এগিয়ে গেছে। এর পরিবেশ সাধারণ দেশকালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। সুদূর গুজরাট নগরের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক কোনস্থলেই বাঙলাদেশের সাধারণ পরিবেশের কথা বিস্মৃত হননি। রাজসভা, রাজ্যস্থিত বাগান ও সরোবর, পরিচারিকাদের কথোপকথন এবং রাজপুত্র-রাজকন্যার বিবাহবাসর ইত্যাদির চিত্র বাঙলাদেশের আবহে নির্মিত। এই চিত্র মধ্যযুগের

আখ্যায়িকা কাব্যের সঙ্গে বিশেষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই পরিবেশ-চেতনা মধ্যযুগের যেকোন কাব্যে—সে হিন্দুর লিখিত হোক কি মুসলমানের—লক্ষ্যযোগ্য। অবশ্য একে এজাতীয় কাব্যের প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করাই অধিকতর শ্রেয়। মিশ্রভাষারীতির কাব্যে এজাতীয় বহু কাহিনী রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেসব কাহিনীতেও কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব নেই। প্রায় সব কাহিনীই একটা অবধারিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে—যা পাশ্চাত্যরীতিতে লিখিত উপন্যাসশিল্পের পরিপন্থী। 'রত্নবতী'র কাহিনীটি গড়ে ওঠেছে অতি-প্রাকৃত চিন্তাভাবনার উপর। সরোবরের জলস্পর্শে মানুষের বানররূপ ধারণ, বা মানুষে রূপান্তর, অঙ্গুরীয়তে যথেচ্ছাপ্রাপ্তি, সন্ন্যাসীর বরে নিজ রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে যে বাস্তবের শুধু সম্পর্ক নেই তা নয়, বাস্তবে এজাতীয় ঘটনা অসম্ভবও। এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা ছাড়া এজাতীয় কাহিনীর জট খোলাও যায় না। মধ্যযুগীয় প্রায় সব কাহিনীতে এজাতীয় ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অতিপ্রাকৃতনির্ভর কাহিনীবিন্যাস মিশ্রভাষা রীতির কাব্যেই বেশি দেখা যায়।

কাহিনীটি গতানুগতিক রূপকথাজাতীয়। তবু 'রত্নবতী'র আগেও এজাতীয় কয়েকটা কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে রাজকন্যা তার বিয়ের ব্যাপারে এজাতীয় শর্ত আরোপ করেছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বিদ্যার শর্ত ছিলো, যে বিদ্যায় তাকে হারাতে পারবে তাকেই সে স্বামিত্বে বরণ করবে। মিশ্র-ভাষারীতি কাব্যে 'হাতেম তায়ী'র কাহিনীতেও রাজকুমারীর বিয়ের ব্যাপারে এরকম শর্ত আরোপের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই দুটো কাব্যের কোনটাতেই এত স্থূল শর্ত আরোপ করা হয়নি, যেমনটি 'রত্নবতী'তে হয়েছে। বিদ্যার গৌরব ছিলো তার শিক্ষার। তাই সে সেটি জাহির করতে চেয়েছে। 'হাতেম তায়ী'র নায়িকা হুসনা বাণু সাতটি সওয়ালের জবাব দাবি করেছে জ্ঞানী হবার জন্যে। এসব প্রশ্নের জবাব

সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতেমকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে তা পাঠকমাত্রই জানেন। রত্নবতীর প্রথম দিনের প্রার্থনা "বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা", দ্বিতীয় দিনের প্রার্থনা "বিংশতি সহস্র রৌপ্যমুদ্রা", পরের প্রার্থনা গজমুক্তা নির্মাণের জন্যে "একশত মুক্তা"। অবশেষে সে রাজপুত্রের অলৌকিক কৌশলের কথা অবহিত হয়ে সেই অঙ্গুরীয় প্রার্থনা করে বসলো—যা তার প্রার্থনা চরিতার্থতার উৎস। মজার কথা হলো, এই আখ্যায়িকার বহু আগে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কাব্যকারেরা যে বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দেশ্য-প্রবণতার পরিচয় প্রদান করেছেন, মীর মশাররফ হোসেন তাও পারেননি।

এই আখ্যায়িকায় কয়েকটি চরিত্র রয়েছে। সেসব চরিত্রের মাধ্যমে গড়েওঠা কাহিনীর গতি কেন্দ্রাভিমুখী—যা উপন্যাসের একটি প্রধান লক্ষণ কিন্তু যেহেতু গল্পটিতে কোনপ্রকার উপকাহিনী নেই সেহেতু ঘটনাটি জমে ওঠেনি। একই কথা এই গল্পের চরিত্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কাহিনীতে দুধরনের চরিত্র রয়েছে। একদিকে রক্ত-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ, যারা প্রকৃতির বশীভূত ; অন্যদিকে সেই সরোবরতীরস্থ অলৌকিক সন্ন্যাসী। সন্নাসীকে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মধ্যযুগে এজাতীয় চরিত্রের আমদানী ঘটে কাহিনীর গতিধারা নিয়ন্ত্রণের জন্যে। কারণ তৎকালীন লেখকেরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলে তাঁদের পক্ষে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে কাহিনীতে পরিবর্তন সূচনা করা অথবা কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো না। অতএব সেকালে এজাতীয় চরিত্র আমদানীর কারণ উপলব্ধি করা সহজ। চরিত্রগুলোতে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব নেই গোটা গ্রন্থে মাত্র দুটো চরিত্রে খানিকটা দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। এর একটা হলো মন্ত্রিপুত্র সুমন্ত, অন্যটি রাজা রত্নধ্বজ। মন্ত্রিপুত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে কোনপ্রকার নতুনত্ব নেই। কর্তব্যের আহ্বানে সে পর্যটনে বেরিয়েছে এবং বন্ধুর

প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ তাকে এই কাহিনীর কেন্দ্রমূলে স্থাপন করছে। সেই হিসেবে মন্ত্রিপুত্রের কাজকে বন্ধুবাৎসল্য আখ্যা দেওয়া অধিকতর যুক্তি সঙ্গত। তবে রাজা রত্নধ্বজের দ্বন্দ্ব বাস্তবানুগ। রত্নধ্বজের চরিত্রে দুটো পরস্পরবিরোধী চেতনা কাজ করেছে। একদিকে তিনি একমাত্র কন্যা রত্নবতীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত, অবাস্তু ও অসম্ভব জেনেও নিছক .স্নেহমমতার আকর্ষণে তাকে বাধা প্রদান করতে পারছেন না। অন্যদিকে যেসব রাজপুত্র বা রাজপুরুষ রাজকন্যার এজাতীয় কাজের শিকারে পরিণত হচ্ছে তাদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি রয়েছে অফুরন্ত। এই কারণেই তিনি প্রথমে রাজ-পুত্রকে তাঁর কন্যার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে বাধাপ্রদান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজপুত্রকে দেখে তাঁর ভেতরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তিনিও স্বভাবের বশ—যার বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে পুত্রীস্নেহ। রাণীর চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা দুর্বল। কারণ, সাধারণত এজাতীয় কাহিনীতে মায়েরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যে বিদ্যার মার ভূমিকা স্মরণ করলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। সুন্দরকে দেখে মার আকুলতা এবং মেয়ের পরিণতি দেখে উৎকণ্ঠার যে পরিচয় এই কাব্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা সত্যি অপূর্ব। ‘রত্নবতী’তে মার কোন ভূমিকা নেই। মেয়ে বানরী হয়ে যাওয়ার ফলে তাকে ধরার জন্যে সরোবরে ঝাঁপ দেওয়ার পর তিনিও বানরীতে রূপান্তরিত হলেন। এই দৃশ্যটি এত সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, মার চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যই পাঠকের চোখে পড়ে না।

‘রত্নবতী’ প্রসঙ্গে একটা কথা স্বাভাবিকভাবে মনে আসে। মীর সাহেবের এই আখ্যায়িকা রচিত হওয়ার অন্তত একযুগ আগে প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ এবং তারও কয়েক বছর আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহর কলকাতার বিভিন্ন জীবনধর্মী চিত্র সংবলিত ‘কলিকাতা কমলালয়’ ও ‘নববাবু বিলাস’ প্রকাশিত

হয়েছে। এসব রচনার পরিণতি হিসেবে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'। 'রত্নবতী'র আগে এতগুলো রচনা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও মীর সাহেব সার্থক উপন্যাস নাহোক, একটি জীবনধর্মী আখ্যায়িকা রচনা করতে পারলেন না কেন? 'রত্নবতী'র ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যে সমকালীন সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো তার প্রমাণ রয়েছে।[১৫] অতএব এই প্রসঙ্গে মীর সাহেবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অথচ অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) ও 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) দেখে তাঁর সমাজসচেতনতা সম্পর্কেও কোন সন্দেহ করা চলে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটকে' মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র (১৮৬১) এবং 'জমীদার দর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ'-এর (১৮৬০) অন্যকিছু না হোক, নামের যে প্রভাব রয়েছে তাও স্মরণ করা যেতে পারে। মীর সাহেব তার পূর্ববর্তী লেখকদের রচনা পড়েছিলেন। তবে সদ্য উদ্ভাবিত উপন্যাস-শিল্পের অন্তর্নিহিত শৈল্পিক টেকনিক ও ভাবসৌন্দর্য অবলোকন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তিনি ভালো ইংরেজি জানতেন না বলে মনে হয়।[১৬] এছাড়া মিশ্রভাষারীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণও এর জন্যে দায়ী হতে পারে।

অতএব এই নবাগত শিল্পরীতি আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকদের প্রস্তুতি ছিলো খুবই সীমিত। এই সীমিত পুঁজি পরীক্ষা-নীরিক্ষার অনুকূল নয়।

পাদটীকা

১ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, (চতুর্থ-স; কলকাতা, ১৩৬৯) ১৮১।

২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (তৃ-স; চট্টগ্রাম, ১৯৬৮) ৬০।

৩ প্রাগুক্ত, ৬২।

৪ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' তৃতীয় খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৬৬) ৬৯৫।

৫ আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য' (ঢাকা, ১৯৭৮) ৪৮। এখানে তিনি শাহ মুহম্মদ সগিরের রচনার কালসীমা ১৩৮৯-১৪০৯ বলে উল্লেখ করেছেন।

৬ মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (দ্বি-মু ; ঢাকা, ১৯৬৫) ৫৭।

৭ সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' (দ্বি-স ; কলকাতা, ১৯৬৬) বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বংশানুক্রমিক তালিকা।

৮ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ (কলকাতা, ১৯৬২) ৫৩১। আবদুল করিম 'বাংলার ইতিহাস' সুলতানী আমল, (ঢাকা, ১৯৭৭) ৫৭২।

৯ মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, ৬০। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৬৯৫। সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন জৈনুদ্দীন ষোড়শ শতাব্দীর কবি। প্রাগুক্ত, ২১৫।

১০ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (ঢাকা, ১৯৬৪) ১৬৩।

১১ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৯।

১২ Mohammad Abdul Awal, 'The Prose Works of Mir Mosarraf Hosen (Chittagong, 1975). এই গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠার পর এই উপন্যাসের নামপত্রের ফটোস্টাট কপি সন্নিবেশিত।

১৩ মীর মশাররফ হোসেন, 'রত্নবতী', প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৪ M. A. Awal, op. cit., 48.

১৫ "এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিও সমাদরের যোগ্য। ইহা একজন কৃতবিদ্য মুসলমান দ্বারা রচিত, অথচ ইহার রচনা কোন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতের বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।···কি বর্ণশুদ্ধি, কি ব্যাকরণ, কি রচনাকুশলতা, সকল বিষয়েই গ্রন্থের সাধুতা হইয়াছে ; উহার নামপত্রে যাবনিক নামটি না থাকিলে আমরা অনায়াসে গ্রন্থখানি সুশিক্ষিত বাঙালী হিন্দু দ্বারা বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতাম। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে গ্রন্থে বর্ণবিন্যাসে সুসাধু সংস্কৃত শব্দের কুত্রাপি ভ্রম হয় নাই, অথচ গ্রন্থকারের আপন নামটি বাঙ্গালায় পরিশুদ্ধ লিখিতে পারেন নাই। যাঁহারা পারস্য ও আরব্য ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে মসারফ হোসেনের পরিবর্তে মুসর্রফ হুসেন লিখিলে শুদ্ধ মুসলমানী উচ্চারণের রক্ষা হইত।" উদ্ধৃত, সুনীলকুমারমুখোপাধ্যায়,"মীর মোশাররফ হোসেনের রত্নবতীপ্রসঙ্গে", 'বাংলা

একাডেমী গবেষণা পত্রিকা' (ঢাকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৮০) ৮৩-৮৪। (রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্যসন্দর্ভ' নামক পত্রিকার ৫ম পর্বের, ৫৪ খণ্ড রূপে নির্দেশিত সংখ্যায় 'রত্নবতী' প্রসঙ্গে এই উক্তি করেন।) "We take it that the author has concealed his name under the nom de plume of a Musalman". The Calcutta Review, Vol. I. No. 99, 1870, 235.

১৬ মুনীর চৌধুরী, 'মীর-মানস' (ঢাকা, ৫৯৬০) ৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাস

প্রথম অধ্যায়

মীর মশাররফ হোসেন

॥ এক ॥

॥ ক ॥

'রত্নবতী' প্রকাশিত হবার পর মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত আখ্যায়িকামূলক রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'বিষাদ-সিন্ধু' থেকেই (১৮৮৫) মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের সূচনা। প্রকৃষ্ট শিল্পের আলোকে দেখলে এই গ্রন্থেরও বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যাবে। তবু কাহিনী, পটভূমিকা, চরিত্রনির্মাণ ইত্যাদি বিবেচনা করলে এই গ্রন্থে উপন্যাসের বহু লক্ষণ চোখে পড়তে পারে।

'বিষাদ-সিন্ধু' মোট তিনপর্বে সমাপ্ত। প্রথম পর্ব (মহরম) প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ, দ্বিতীয় পর্ব (উদ্ধার) ১৮৮৭ খ্রীঃ, এবং তৃতীয় পর্ব (এজিদ-বধ) ১৮৯১ খ্রীঃ। এর ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য রচনা অব্যাহত থাকে। তবে সমসাময়িককালে 'বিষাদ-সিন্ধু'র মতো এত বড় উপন্যাস আর ছিলো কিনা সন্দেহ।

'বিষাদ-সিন্ধু' মহররমের বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়ে লিখিত। অতএব এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক। সাহিত্যের যেসব লক্ষণকে আমরা আধুনিক আখ্যা দিয়ে থাকি, ইতিহাসচেতনা তার অন্যতম। সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। অবশ্য 'বিষাদ-সিন্ধু'র আগে বঙ্কিমচন্দ্রের যে কয়েকটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে[১] তার প্রায় সবগুলোতে ইতিহাসের ছাপ বিদ্যমান। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে যেভাবে স্থাপন করেছেন, সেভাবে মীরসাহেব করতে পারেননি। তবু মুসলিমরচিত প্রথম বাঙলা উপন্যাস যে একটা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে ওঠেছে সেটিও কম কথা নয়।

'বিষাদ-সিন্ধু' যখন ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেছে, তখন নিশ্চয়ই এর একটা উৎস আছে। সে উৎস কি? এই সম্পর্কে মীর সাহেবের মত হলো "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল।"[২] লেখক একথা বললেও উপন্যাস পাঠে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ এযাবৎ যতগুলো ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া গেছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গোটা উপন্যাসের কাঠামো ছাড়া অনেক কিছুই ইতিহাসে নেই। এজিদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সম্পর্কে সব ইতিহাস এক কথা বলে না। কারণ মুসলিম জগতে 'শিয়া' ও 'সুন্নী' বলে যে উপভাগের অস্তিত্ব রয়েছে তাদের মনোভাব অনেকক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। এই কারণে মানসিকতা বিচারে মতামতও যে পরস্পরবিরোধী হবে তা বলাই বাহুল্য। অতএব কোন ইতিহাসে এজিদ যেমন হীনচিত্রে চিত্রিত,[৩] তেমনি অন্য ইতিহাসে হয়তো তাঁর চরিত্রের বহু সদগুণও উদ্ঘাটিত হয়েছে।[৪] সেদিক দিয়ে বিচার করলে এজিদ চরিত্রের ভিত্তিও নিরূপণ করা যায় না। এজিদের বিরুদ্ধে কোন কোন ঐতিহাসিক যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার যাথার্থ যাই থাক না কেন, তাঁর চরিত্রের বহুদিক প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু যেহেতু এজিদ-হোসেন বিরোধকে আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ না করে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে করি, সেহেতু চরিত্রটির প্রতি কখনো সুবিচার করা সম্ভব হয় না। তথাপি 'বিষাদ-সিন্ধু'তে আরবি ও ফারসি কেতাবের নাম করে মীর সাহেব যা করেছেন তা আসলে মিশ্রভাষারীতি কাব্যের হুবহু অনুকরণ। কবি হেয়াত মামুদের 'জঙ্গনামা,'[৫] গরীবুল্লার 'মুক্তাল হোসেনেও'[৬] তাঁরা মীর মশাররফ হোসেনের ন্যায় আরবি-ফারসি কেতাবের দোহাই দিয়েছেন। এছাড়া 'বিষাদ-সিন্ধু'র পরবর্তী সংস্করণে বর্ণিত ইমাম হাসান ও হোসেনের হজরত মোহাম্মদের কাছ থেকে যথাক্রমে সবুজ ও লাল রঙের জামা প্রার্থনার কথাও[৭] কোন কোন পুঁথিতে দেখা

যায়[৮] এই অংশটি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে অন্যভাবে ছিলো।[৯] অতএব মীর সাহেব এসব পুঁথি থেকে শুধু কাহিনীই গ্রহণ করেননি, তার উৎসের বরাতটিও গ্রহণ করেছেন। এই কারণে একটি অতি পরিচিত ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হলেও এতে এমনসব ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে, যা শুধু অনৈতিহাসিকই নয়, অবাস্তব ও অতিপ্রাকৃতও বটে। হজরত মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী এজিদের জন্মের কুৎসিত ঘটনা, কারবালা প্রান্তরের আকাশে-বাতাসে 'হায়হোসেন' 'হায়হোসেন' রব, বৃক্ষ থেকে শোণিতধারা নির্গমণ, ইমাম হোসেনের খণ্ডিত মস্তক তাঁর দেহে পুনসংযোজন, এজিদ-হানিফার পরিণতি ইত্যাদি ঘটনা পুঁথি থেকেই আহৃত।

॥ খ ॥

আমরা 'রত্নবতী' আলোচনা করে দেখেছি, তাতে উপন্যাসের কোন লক্ষণই নেই। সেটি একটি রূপকথা জাতীয় আখ্যায়িকা। কিন্তু 'বিষাদ-সিন্ধু' কি উপন্যাস? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থটির অতি-প্রাকৃত অংশগুলোর কথা মনে ওঠে—যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা কোন উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে না। অতএব সেই দৃষ্টিতে দেখলে 'বিষাদ-সিন্ধু'কে উপন্যাস বলা যায় না। কিন্তু 'বিষাদ-সিন্ধু'তে একটা কাহিনী রয়েছে এবং সে কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহু উপকাহিনী গড়ে ওঠেছে,—যা উপন্যাসের একটি প্রধাণ লক্ষণ। অবশ্য লেখক কোন কোন ক্ষেত্রে অতিকথনের দরুন কাহিনীগুলোকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। কাহিনীর আরো একটা ত্রুটি হলো, কাহিনীটি নির্দ্বন্দ্ব। উপরন্তু কাহিনীটি বহু পরিচিত হওয়ায় এর গতি সহজ ও সচ্ছন্দ মনে হয়। লেখক কোথাও দ্বন্দ্বের মাধ্যমে কাহিনীতে গতি সঞ্চার করতে চাননি। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে লেখক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে গোটা কাহিনীটি অনুসরণ করেছেন। ফলে কোথাও এর ধর্মীয় ভাবধারা কাহিনীটিকে

বিপর্যস্ত করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে পাঠ করলে মনে হবে এই গ্রন্থটিতে ধর্মের প্রাধান্য বেশি। কিন্তু "যেদিক থেকে বিচার করিনা কেন, আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মীর মশাররফ হোসেনের মানবপ্রীতি ও শিল্পবোধ 'বিষাদ-সিন্ধু'র ধর্মীয় উদ্দেশ্য গুরুতর রূপে ব্যাহত করেছে।"[১০] এই 'মানবপ্রীতি ও শিল্পবোধ' 'বিষাদ-সিন্ধু'র অন্যান্য ত্রুটিকে আচ্ছন্ন করে তাকে একটি উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষা আবেগপ্রধান। মীর সাহেবের ভাষা এর আগেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। কিন্তু এই উপন্যাসের ভাষার কাব্যময়তা পাঠকের মনে নতুন ভাবে চমক সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসের আয়তন, বিষয়বস্তু, তার সূচনা ও পরিণতি মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তও কারবালার ঘটনা নিয়ে একটি মহাকাব্য রচনা করা যায় বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।[১১] মাইকেলের এই মতামত মীর সাহেবকে এই গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিলো কিনা বলা যায় না, তবে এতে মাইকেলের প্রভাব লক্ষ্যগোচর।

'বিষাদ-সিন্ধু' একটি চরিত্রপ্রধান উপন্যাস। তবে চরিত্রগুলোর সাধারণ গতি সমান্তরাল এবং কাহিনীর মতোই নিদ্বর্ন্দ্ব। এর একদিকে রয়েছে ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন, মোসলেম, কাসেম, আব্দুল ওহাব-জাতীয় মহৎ চরিত্র; অন্যদিকে মারোয়ান, আবজুল্লা জেয়াদ, সীমার-জাতীয় চরিত্র—যারা পাষণ্ড কুৎসিৎ ও নীচ। এসব চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই। সবগুলো চরিত্র সমান্তরাল বেগে এগিয়ে গিয়ে একটি পূর্বনির্ধারিত পরিণতি লাভ করেছে।

গোটা উপন্যাসে একটিমাত্র চরিত্র রয়েছে যাতে তাবৎ মানবিক আবেগ-অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে। সেটি এজিদ-চরিত্র। এই চরিত্রটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যে ধর্মবোধ সেদিনের রাজনৈতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তাকে নির্দ্বিধায় অতিক্রম

করে এমন একটি প্রাণস্পর্শী, আবেগময় ও বীর্যবান চরিত্র নির্মাণ করা কম কথা নয়। এই এজিদ যেন সেদিনের ইমামহন্তা এজিদ নন, তিনি একজন প্রাণবান পুরুষ—যিনি বিচক্ষণ রাজনীতিতে, দক্ষ কুটনীতিতে, কুশল ও অকুতোভয় সমরক্ষেত্রে, প্রেমিক ব্যক্তিগত জীবনে, দানশীল তাঁর প্রজাদের ক্ষেত্রে লেখকের সচেতন মানসিকতার ছাপ এই চরিত্রের সর্বত্র বিদ্যমান। এই কারণে সবার উপরে একটা তীব্র বিরহবেদনা তাঁর অন্তরকে বার বার দোলায়িত করে তাঁর সত্তাকে শুদ্ধ বিপর্যস্ত করে তোলে। এই বিপর্যয় মূলত মানবীয় এবং এর আবেদনও সর্বজনীন। মীর-মানসের এই সর্বজনীন দিকটি সমগ্র উপন্যাসের একমাত্র এজিদ-চরিত্রেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এজিদ দোষে ও গুণে মানুষ। যে প্রবল রূপতৃষ্ণা থেকে এই উপন্যাসের সূচনা, সেই রূপের অদৃশ্য আগুনের মর্মান্তিক দহনের ভেতর তার পরিসমাপ্তি। মীর মশাররফ হোসেন অত্যন্ত সচেতনভাবে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। মানবিক অনুভূতির যে ছিদ্রপথ বেয়ে ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত হয় এবং তা পরিণামে বিরাট মহীরুহের রূপ ধরে গোটা কাহিনীকে একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, তার সবগুলো লক্ষণ 'বিষাদ-সিন্ধু'তে বিদ্যমান। এজিদ একজন প্রেমিক—যেকারণে রূপের আগুনে দগ্ধ ; এজিদ একজন মানুষ যেকারণে সামগ্রিক হাসি ও কান্নাকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে এজিদ একজন দক্ষ শাসক—যিনি প্রজাপর্যায়ে সুবিচার প্রদানে বদ্ধপরিকর। শুধু তাই নয়, তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্যে নীচতা ও হীনতা অবলম্বনে পরাঙ্মুখ স্বীয় সভাসদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে উৎসাহী, যুদ্ধক্ষেত্রে একজন অকুতোভয় সৈনিক। এতগুলো মানবিক গুণ আরোপ করা হয়েছে শুধু চরিত্রটিকে মহত্ত্ব প্রদানের জন্যে। পুঁথিকারদের সঙ্গে এই লেখকের এখানেই মৌলিক পার্থক্য। এমন মানবিক আবেগ-অনুভূতি আরোপ করে একটা চরিত্রে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা

এর আগে মুসলমান শিল্পীদের পক্ষে ছিলো অকল্পনীয়।

এজিদ ছাড়া আরো দুটি চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে। এর একটা হলো ইমাম হাসানের দ্বিতীয় স্ত্রী জায়েদা। জায়েদা চরিত্রের মাধ্যমে মীর সাহেব সপত্নীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এই সপত্নীবাদ তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থে নিন্দিত হয়েছে। 'বসন্তকুমারী' নাটকের উপজীব্যও এই সপত্নীবাদ। এছাড়া তাঁর পরবর্তীকালের রচনায়ও এর ছাপ রয়েছে। কারণ তিনি নিজেও এর নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিলেন।[১২] শুধু তাই নয়, তাঁর সাহিত্য জীবনের একটা বিরাট অংশও সপত্নীবাদের অভিশাপে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিলো।[১৩] জায়েদা ইমাম হাসানকে ভালোবাসতেন। অতএব প্রথমা স্ত্রী হাসনাবাণুর প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। অথচ এতদিন তা প্রকাশ পায় নি। কিন্তু "হাসনাবাণুর ভয়ে যে আগুন এতদিন চাপা ছিল, ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশিজ্যোতিঃতেজে উত্তেজিত হইয়া সে আগুন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।"[১৪] অতএব তাঁর ভেতর একটা অপরিসীম দ্বন্দ্বের সূচনা হলো। এই দ্বন্দ্বের প্রাক্কালে মারোয়ানের দূত ময়মুনার আবির্ভাব। তাঁর কাছে জায়েদা মনের কপাট খুলে দিলেন। সুযোগ বুঝে ময়মুনা হাসানকে হত্যার জন্যে তাঁকে প্ররোচিত করলো। বিনিময়ে এজিদের পত্নিত্ব লাভ। এবার জায়েদার ভেতর এই দ্বন্দ্ব বাস্তব রূপলাভ করলো। "একদিকে রাজভোগের লোভ, অপরদিকে স্বামীর প্রণয়, এই দুটি ক্রমে ক্রমে তুলনা করিতে লাগিলেন। যদি জায়েদা হাসানের পত্নী না হইতেন, যদি জায়েদা সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত না হইতেন, তবে কি আজ জায়েদা বিবেচনা-তুলাদণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পত্তি সুখ সমুদয় একদিকে, আর স্বামীর প্রণয়, প্রাণ—ভিন্নদিকে ঝুলাইয়া পরিমাণ করিতে বসিতেন? কখনই নহে কতবার পরিবর্তন করিলেন, দুরাশা পাষাণ ভাঙ্গিয়া তুলাদণ্ড মনোমত ঠিক করিয়া অসীম সুখভার

চাপাইয়া দিলেন, তথাচ স্বামীর প্রাণর দিকেই বেশী ভারী হইল। কিন্তু জয়নাবের নাম মনে পড়িবামাত্রই পরিমাণদণ্ডের যেদিকে স্বামীর প্রাণ, সেদিকে একেবারে লঘু হইয়া উচ্চে উঠিল। হঠাৎ একদিকের লঘুতাপ্রযুক্ত রাজভোগ, ধনলাভস্পৃহা-পরিমাণ একেবারে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া জায়েদার মন ভারী করিয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বিবেচনা তুলাদণ্ড স্বামীর প্রাণের দিকে আর নীচে নামাইতে পারিলেন না।"[১৫] এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত জায়েদার শেষ সিদ্ধান্ত, "আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি। জায়েদাই যদি বঞ্চিত হইল, জায়েদাই যদি মনের আগুনে পুড়িতে থাকিল, তবে তাহার চক্ষের উপর জয়নাব সুখভোগ করিবে, তাহা কখনই হইবে না।"[১৬] কিন্তু এত জ্বালা, এত সিদ্ধান্তের ভেতরও যন্ত্রণার অবসান হলো না। হাসানকে বিষ প্রয়োগ করতে গিয়ে আবার তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত প্রেমানুভূতি দুর্বার হয়ে ওঠল। তিনি "হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে মুখ, বক্ষ, উরু ও পদতল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু পড়িলে আর সে ভাব থাকিল না। তাড়াতাড়ি বিষের পুঁটুলি খুলিয়া সোরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরক চূর্ণ ঢালিয়া দিলেন। দক্ষিণ হস্তে সোরাহীর মুখবন্ধবস্ত্রের উপর বিষ ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই বার বার বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। স্বামীর মুখপানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।"[১৭] এই কাজের প্রতিক্রিয়া তাঁর ভেতর কী ভয়ঙ্কর হবে সে সম্পর্কেও যে জায়েদা সতর্ক ছিলেন, তা বুঝতে অসুবিধে হয়না, যখন তাঁকে বলতে শুনি—"যদি জায়েদা বাঁচিয়া থাকে, তবে দেখিস জায়েদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত?"[১৮] অতএব জায়েদা চরিত্রটিও পুরোপুরিই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত। এই চরিত্রের বাস্তবভিত্তি অপরিসীম।

মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ আরেকটি চরিত্র হলো হামান। হামান এজিদের সভাসদ হলেও অন্যান্যদের মতো তিনি কুটিল ও স্বার্থপর

মন। যে কারণে এজিদের সঙ্গে অনেক সময় তাঁর মতভেদ হয়েছে এবং এই মতভেদের দরুন তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। করাগারে হামানের স্বগতোক্তি একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন, "রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ-বিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্য মধ্যে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইলেও যথাসময়ে অবশ্যই নির্ব্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবি বুঝাইলা দিলে সেই দুর্দ্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈবদুর্ব্বিপাকে রাজ্যধ্বংসের উপক্রম বোধ হইলেও নিরাশ-সাগরে ভাসিত হয় না—আশা থাকে। রাজার মজ্জা দোষে কি মন্ত্রণা অভাবে রাজ্যশাসনে অকৃতকার্য্য হইলেও আশা থাকে। মূর্খ রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশায়, মন্ত্রণাদাতাগণ অবিচার অত্যাচার নিবারণে উপদেশ না দিয়া অহরহ তোষামোদের ডালি মাথায় করিয়া প্রতি আজ্ঞা অনুমোদন করাতেই যদি রাজা প্রজায় মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা থাকে—সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর মহামূল্য রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীনতা-সূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা।"[১৯] রাজা প্রজার ভেতর পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর অনুভূতি স্বচ্ছ। কারণ তিনি জানেন, "রাজা আর রাজ্য, এই দুইটি পৃথক্ কথা—পৃথক্‌ভাব—পৃথক সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধি-দোষে অপদস্ত হউন, সৎযুক্তি সুমন্ত্রণায় অবহেলা করিয়া পর-পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্বদোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কার্য্য অনুরূপ ফল, পাপানুযায়ী শাস্তি। ...রাজা প্রজা রক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য প্রজার, রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দা মাত্রেরই।"[২০] এই অনুভূতির অন্তরালে যে একটি আধুনিক মন

তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি উজাড় করে দিয়েছে, তা বুঝতে বেগ পেতে হয়না। একারণেই এজিদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েও এজিদের জন্যে তিনি চিন্তিত এবং এজিদের পরিণতির কথা শুনে "দেখিবার মধ্যে দেখা গেল চক্ষের জল, আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল দীর্ঘ নিঃশ্বাস।"[২১] এই চরিত্রটি মীর মশাররফ হোসেনের দেশপ্রেমের স্বাক্ষর বহন করছে।

॥ গ ॥

আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি যে, 'বিষাদ-সিন্ধু' একটা ঐতিহাসিক ঘটনা-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠলেও, এর প্রেরণামূল মিশ্রভাষারীতির কাব্য। কিন্তু কাহিনীর বাইরে এই কাব্যের প্রাণমূলে পুঁথিসাহিত্যের কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র এই প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশি। মাইকেলের জীবনের সঙ্গে যেমন মীর সাহেবের জীবনের কিছুটা মিল রয়েছে, তেমনি তাঁর উল্লিখিত কাব্যের সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'র মিল রয়েছে। মাইকেল মধুসূদন যেমন হিন্দু পুরাণের একটি বহু পরিচিত ঘটনাকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন, তেমনি মীর সাহেবও মুসলিম জগতে পরিচিত একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন। রাবণ-চরিত্রের সঙ্গেও এজিদ চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। যেপ্রেম মাইকেলের কাব্যে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই প্রেমই 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রত্যক্ষ প্রেরণা। ধনে-জনে, শৌর্যে-বীর্যে, দানে-দক্ষিণায় রাবণের মতো এজিদও অদ্বিতীয়। তবু রাবণের মতো এজিদকে পরাভব স্বীকার করতে হলো। দুটো রচনাই মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। কারণ রাবণের পতনের সঙ্গে যেমন লংকার মান-সম্ভ্রম নির্ভরশীল, তেমনি এজিদের পতনের সঙ্গে দামেস্কের। একারেণেই এই দুটো নগরীর পতনকে দুটি উদ্দীপ্ত মানসিকতার পতন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে—যাতে

সজ্ঞান-জাতীয়তাবোধ আরোপিত। রাম রাবণ সম্পর্কে সাধারণ ধর্মপ্রাণ হিন্দুর এবং হোসেন-এজিদ সম্পর্কে সাধারণ ধার্মিক মুসলমানের অনুভূতি অভিন্ন। অবশেষে উভয় কবিই এই দুটি তথাকথিত ঘৃণ্য চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করে তাঁদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে উভয়ই বহিরাক্রমণ থেকে স্ব স্ব দেশ উদ্ধারের জন্যে বদ্ধপরিকর। মাইকেল সমুদ্রের প্রতি সম্বোধন করে স্বাধীনতার যে জয়গান করেছেন,[১২] মীর সাহেব সেই স্বাধীনতারই জয়গান করেছেন এজিদের বন্দী সেনাপতি হামানের স্বগতোক্তির মাধ্যমে। উভয় কাব্যই করুণ রসের ভেতর পরিণতি লাভ করেছে। মৃত মেঘনাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে জীবিত এজিদের অন্তর্ধানেরও মিল রয়েছে।

কাব্যদ্বয়ে এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পরিণতি এক নয়। রাবণের তুলনায় এজিদের পরিণতি আরো বেশি করুণ, ভয়াবহ ও শোকাবহ। রাবণের মতো এজিদও বুঝতে পেরেছিলেন, নিয়তি তার বিপক্ষে। কিন্তু রাবণ যেখানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি, সেখানে এজিদ কেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন ? এই চরিত্রের কোথাও তো এত হীনম্মন্যতা লক্ষ্য করা যায়নি। যিনি একা জীবিত থাকতেও মোহাম্মদ হানিফাকে দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করতে দিতে রাজি নন, শেষে কেন তিনি লাঙ্গুল গুটিয়ে পালালেন ? এখানে মীর মানসদ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকটিত। কারণ, মাইকেল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে হিন্দুধর্মের কোন আবেগের দ্বারা পরিচালিত না হওয়া তাঁর পক্ষে এমন কিছু নয়। কিন্তু মীরের পক্ষে সেকথা খাটে না। তাঁর ব্যক্তিগত মানসিকতা যাই হোক না কেন, তাঁর পক্ষে পারিবারিক ঐতিহ্য, পরিবেশ ও ধর্মবোধ অস্বীকার করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এই ধর্মীয় আবেগই 'বিষাদ-সিন্ধু'র শেষে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিলো। কারণ, হযরত মোহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানের ধারণা কি তা তিনি জানতেন। এই কারণেই তাঁকে

এজিদের এমন ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করতে হয়েছে, তাঁর নিজ হাতে গড়া সোনার প্রতিমা নিজ হাতেই বিসর্জন দিতে হয়েছে। এই বিসর্জনের বেদনা মোহাম্মদ হানিফার পরিণতিতে প্রত্যক্ষগোচর। মোহাম্মদ হানিফার উন্মুক্ত অসির শিকার গোটা মদিনা ও দামেস্ক হতে পারে—কিন্তু পারেনা একটি ব্যক্তি। তিনি এজিদ নামদার। অতএব "শিল্পীর অদৃশ্য মহাশক্তিই যেন নিয়তির রূপ ধারণ করে, হানিফার প্রতিহিংসা চরিতার্থতা লাভ করার প্রাকমুহূর্তে, নিজের বরপুত্র এজিদকে অন্তরীক্ষে টেনে নিয়ে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করল।"[২৩] তবু একথা অনস্বীকার্য যে, এই গ্রন্থের পরিণতিতে একজন খাঁটি মুসলমান মীর-মানসে সওয়ার হয়েছিলো—যার হাতে শিল্পী মীরের পরাভব ঘটেছে। একই অভিযোগ বঙ্কিম-চন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস সম্পর্কেও উঠেছিলো।[২৪] অবশ্য তার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়।[২৫]

।। দুই ।।

'বিষাদ-সিন্ধু'র পর মীর মশাররফ হোসেনের আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থদ্বয়ের মূল ভিত্তি মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী। তবে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' বহুলাংশে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। কাহিনীর সঙ্গে মীর সাহেবের পারিবারিক জীবনের বা সমকালীন কোন ঘটনার সম্পর্ক ভুলে যেতে পারলে এটিকে উপন্যাসও আখ্যা দেওয়া যায়—যেখানে গ্রন্থস্থিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সাধারণ নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাহ্য করে তার আলোচনা-সমালোচনা সম্ভব। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' একটি রসরচনা। তবে এতেও উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ রয়েছে।

॥ ক ॥

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র প্রথম খণ্ড ১৮৯০ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি।[২৬] উপন্যাসের

অধ্যায়গুলোকে লেখক 'তরঙ্গ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এতে সর্বমোট বিয়াল্লিশটি 'তরঙ্গ' রয়েছে। প্রত্যেকটি তরঙ্গ আলাদা শীর্ষনামযুক্ত।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' দুভাগে বিভক্ত। একভাগে মীর সাহেবের পারিবারিক জীবন, অন্যভাগে নীলকর কেনীর বিবরণ এবং ইতিহাসখ্যাত নীল বিদ্রোহের বর্ণনা। উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের ভেতর প্রথমভাগে রয়েছেন, মীর মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেন, তাঁর চাচাত বোনের জামাই সাগোলাম (সাগোলামাজ্জম) এবং তাঁর মাতা দৌলতুন্নেছা ; অপরভাগে নীলকর টি আই কেনী, জমিদার প্যারীসুন্দরী ও ভৈরববাবু। এই চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করে গোটা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র ঘটনাজাল বিস্তারিত আগেই এসব চরিত্রের বাস্তবতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মীর মোয়াজ্জম হোসেনের চরিত্র অংকনের সময় লেখক প্রচুর সচেতনতা ও সততার পরিচয় প্রদান করেছেন। কারণ মীর সাহেবের (এই অংশে 'মীর সাহেব' বলতে মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়জ্জম হোসেন বুঝতে হবে, অন্যত্র 'মীর সাহেব' অর্থ মীর মশাররফ হোসেন) ব্যক্তিগত চরিত্রের দুটো গুরুতর দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়েছে। প্রথমত. নাচ-গান ও মদ্যাসক্তি ; দ্বিতীয়ত, নীল বিদ্রোহের বিরোধিতা। মীর সাহেবের নাচগান ও মদ্যাসক্তির চিত্রটি পথিক অত্যন্ত সচেতনভাবে অংকন করেছেন। হয়তো এই জাতীয় কাজে তাঁর নীতিগত অনুমোদন ছিলো বলেই তাঁর পক্ষে অবলীলায় মীর সাহেবের ব্যক্তিগত আমোদ-ফুর্তির চিত্র সহজে অংকন করা সম্ভব হয়েছে। এই গ্রন্থে পথিক মীর সাহেবের পারিবারিক জীবনের যে চিত্র অংকন করেছেন, তা সত্যি দুর্লভ। তবে মীর সাহেবের আমোদ-আহ্লাদ স্বচক্ষে দেখার পর এবং প্রতিবেশীদের উস্কানী সত্ত্বেও দৌলতুন্নেছার ভেতর কোন

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়া সাধারণ মনস্তত্ত্ববিরোধী। অবশ্য পথিকের বর্ণনা যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা অর্থহীন। তবে মীর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা মহৎ দিক হলো সাগোলামকে ক্ষমা করা। কারণ, মীর সাহেবের সঙ্গে সাগোলাম যে ব্যবহার করেছেন, তা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। তবু মীর সাহেব কোনপ্রকার প্রতিবাদ না করে নীরবে সরে দাঁড়িয়েছেন। মীর সাহেবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হলো নীল-বিদ্রোহের বিরোধিতা। এতে কেনী সাহেবের সহিত তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বই বহুলাংশে কাজ করেছে। মীর সাহেব এসব ক্ষেত্রে কখনো কখনো দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন। এই দ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা বেশি লক্ষ্য করা গেছে কেনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে।

সাগোলাম-চরিত্রটি নীলবিদ্রোহের নায়ক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তবে পথিক তাঁর পিতার সঙ্গে শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রটিকে হীন চিত্রে চিত্রিত করেছেন। যে কারণে একটি ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থানের সপক্ষে থাকা সত্ত্বেও তিনি লেখকের সহানুভূতি হারিয়েছেন। বিসয়সম্পত্তির ব্যাপারে মীর সাহেবের দ্বন্দ্ব এবং নীল-বিদ্রোহের সময় প্রজাসাধারণের পক্ষাবলম্বনকে কেন্দ্র করে চরিত্রটিতে মানবিক আবেগ-অনুভূতি আরোপ করা যেতো। কিন্তু লেখকের একদেশদর্শী মনোভাবের দরুন তা সম্ভব হয়নি।

দৌলতুন্নেছা চরিত্রটি নির্দ্বন্দ্ব। লেখক মুসলিম বিশ্বের বহু ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নারীচরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, তাঁদের চেয়ে দৌলতুন্নেছার রূপ ও গুণ অনেক বেশি। এই গ্রন্থে তাঁর সহনশীলতার যে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে, তা পরবর্তীকালে লিখিত কোন কোন বর্ণনায় অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।[২৭] তবে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় এই চরিত্রের ভূমিকা বেশি নেই।

টি আই কেনীও একটি ঐতিহাসিক চরিত্র এই চরিত্র অংকন

করতে গিয়ে পথিক তুলনামূলকভাবে অধিকতর শিল্পসচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। যে কারণে একজন অত্যাচারী নারী-লোলুপ নীলকুঠির মালিক হওয়া সত্ত্বেও, একজন প্রজাপীড়ক হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রটি পাঠকের মনে সহানুভূতি উদ্রেক করে। চরিত্রটিকে উপন্যাসের সমতুল্য চরিত্রে রূপান্তরিত করার যথেষ্ট সুযোগ ছিলো। প্যারীসুন্দরী ও ভৈরববাবু চরিত্রও পথিক বেশ দক্ষতার সঙ্গে অংকন করেছেন। উভয়েই জমিদার এবং উভয়েই কেনীর প্রতিদ্বন্দ্বী। কেনী দুজনকেই ভয় করেন কারণ 'স্ত্রীলোকের মধ্যে প্যারীসুন্দরী —নাম করতেও ভয় হয়। আর পুরুষের মধ্যে ভৈরববাবু। ভৈরব-বাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা ফ্যাসাদে অগ্রসর হতে চাহেন না।'[২৮] এই উক্তি থেকেই চরিত্রদ্বয়ের গুরুত্ব উপলব্ধ হবে।

'বিষাদ-সিন্ধু'র মতো এই উপন্যাসেও লেখকের দেশপ্রেমের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। 'হোম-'এর গুণাগুণ প্রসঙ্গে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন, তাতে অল্পবিস্তর যেসব প্রশ্ন উঁকি মারে সেগুলো যেকোন দেশপ্রেমিকের জন্যে উপলব্ধির বিষয়। "জন্মভূমি কাহার না আদরের? উপমারহিত কাহার না ভাল বাসস্থান? জন্মভূমির জন্য কে না লালায়িত?"[২৯] এই প্রশ্ন চিরন্তন। মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম দিকের প্রায় গ্রন্থেই এই প্রশ্ন সোচ্চার।

পরিশেষে একটা কথা বলেই 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' প্রসঙ্গ শেষ করব। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এই গ্রন্থের সবগুলো চরিত্রই বাস্তব। যেহেতু "শোনা কথাই পথিকের মনের কথা"[৩০] সেহেতু হয়তো কাহিনীতে একটু রঙ লেগেছে। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি সত্য বিকৃত করেননি। এই কারণেই এটি একটি ভালো উপন্যাস হতে পারেনি। আমি 'বিষাদ-সিন্ধু'কেই মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে করি। কিন্তু শৈল্পিক দৃষ্টিতে বিচার করলে 'বিষাদ-সিন্ধু'র তুলনায় 'উদাসীন পথিকের

মনের কথা'য় উপন্যাসের লক্ষণ অনেক বেশি হবে। এই উপন্যাসের সঙ্গে পরবর্তীকালে লিখিত শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'র রূপগত সাদৃশ্য রয়েছে।

॥ খ ॥

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' লিখিত হয় ১৮৯৯ খ্রীঃ। এই গ্রন্থটি মোট বিশটি 'নথি'তে বিভক্ত। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' উপন্যাস নয়, একটি রসরচনা। এই গ্রন্থে মীর সাহেব তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন অনাচারের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। চারশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে কোন সুবিন্যাস কাহিনী না থাকলেও কতকগুলো বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র রয়েছে। চরিত্রগুলোর মাধ্যমে লেখক সমাজের মুখোস উন্মোচন করে দিয়েছেন। সমাজ ও ধর্মের সেবকেরা বিভিন্ন রঙের মুখোস পরে কিভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছেন, তারই মর্মন্তুদ বিবরণ এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ইতঃপূর্বে লিখিত 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস' 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র মতো শ্লথবদ্ধ আখ্যায়িকা। এই গ্রন্থে মীর সাহেবের তিক্ততা সংযমের বাঁধ ভেঙে ফেলেছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনাকে অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে। এছাড়া, এই গ্রন্থে কিছু কিছু অশ্লীল বর্ণনাও রয়েছে—যার শিল্পমূল্য একেবারেই কম।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র উদ্দেশ্যপ্রবণতা গ্রন্থে বর্ণিত পাত্রপাত্রী ও স্থানের নাম থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়। জমিদারের নাম সাবলোট চৌধুরী, পয়জারুন্নিসা, সোনা বিবি, মণি বিবি ইত্যাদি। জমিদার সাবলোট চৌধুরীর মোসাহেব কালোয়ার, কটা লাহিড়ী, আলকাতরা সান্যাল, ঘরভাঙ্গা সান্যাল। সোনা বিবির দাগাদারী, বেআকেল, ধড়িবাজ। মণি বিবির পক্ষে মাথা পাগলা রায়, ধামা-ধরা সরকার। গ্রন্থে বর্ণিত স্থানের নাম অরাজকপুর, যমদ্বার, কুঞ্জ-

নিকেতন, নচ্ছারপুর। থানার নাম হাতপাতা। এই গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেন ভেড়াকান্ত নামে পরিচিত।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর প্রায় সবগুলো গ্রন্থেই ইংরেজের জয়গান করেছেন। এই গ্রন্থেও তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু এই গ্রন্থে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কোর্ট-কাছারি ও থানার যে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে তা এতই ভয়াবহ যে, তার বিকট মুখব্যাদানের বিকৃত অভিব্যক্তির আড়ালে তাঁর সাধের ইংরেজ রাজত্বের সৌরভ ও গৌরব বিলীন হয়ে গেছে —যার উত্তরাধিকার আজও আমরা সযত্নে বহন করে চলেছি। এই দৃশ্যগুলো বাস্তব ও জীবন্ত হওয়ার কারণ মীর সাহেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসব বর্ণনা প্রদান করেছেন। জমিদারী হারিয়ে অন্য জমিদারের অধীনে কাজ করতে গিয়ে তিনি যে বিপর্যয় পর্যবেক্ষণ করেছেন তাই তাঁকে এজাতীয় রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। গাজী মিয়াঁতে বহু অশ্লীল দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে, সমাজ-বিগর্হিত বহু চিত্রও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু তবু লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি দাবি করছেন, "গাজী মিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে না আছে এমন কথা নাই, দুনিয়াজাহানে যাহা আছে, সংসারক্ষেত্রে যত প্রকার বৃক্ষলতা, গুল্ম-গাছা, আগাছা-পরগাছা, বিশাল রসাল, মিষ্ট কটু কষায় টক অম্লমধুর ছোটবড় সর্ব্বাঙ্গ কণ্টক, সর্ব্বাঙ্গ মধুমাখা, নয়ন মনের তৃপ্তিকর বিরক্তিকর যাহা যাহা আছে গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে তাহার অভাব নাই।"[৩১] এই গ্রন্থে লেখকের পূর্বেকার সেই উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা যায় না। যে হিন্দুর সঙ্গে সম্প্রীতির জন্য তিনি 'গো-জীবন' প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এই গ্রন্থে তাঁদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও প্ররোচনামূলক উক্তি লক্ষ্য করা যায়। একারণে একথা যথার্থ যে, "গাজী মিয়াঁ জগৎকে বর্ণনা করেছেন সমাজ-সচেতন মহৎ শিল্পীর নিরপেক্ষ বেদনাবোধ নিয়ে নয়। বর্ণকের মর্মবেদনা এমন কোন আদর্শগত বৃহত্তর জীবনের সত্য নির্মাণ করতে পারেননি, যার ক্ষয় বা বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে আমরাও মর্মাহত

বা অভিভূত হয়ে পড়তে পারি।"[৩২]

শেখ আব্দুর রহিম সম্পাদিত 'হাফেজ' পত্রিকায় মীর মশাররফ হোসেনের 'তহমিনা' নামে একখানা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো। কিন্তু তার কোন মুদ্রিত কপি পাওয়া যায়নি।

পাদটীকা

১ দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), রাজসিংহ (১৮৮২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরানী (১৮৮২)

২ মীর মশাররফ হোসেন, 'বিষাদ-সিন্ধু', প্রথম সংস্করণের "মুখবন্ধ"।

৩ Syed Ameer Ali, 'A Short History of the Saracens' (London, 1951) 83. "Yezid was both cruel and treacherous; his depraved nature knew no pity or justice".

৪ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর 'ইনসানিয়াৎ মওতকে দরওয়াজা পর' গ্রন্থে বহু ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে এজাতীয় বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যাতে এজিদের মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

৫ "পড়িনো শুনিনো ভাই আরবী ফারসী।
ইমামের কথা শুনি দুঃখ মনে বাসি॥
যতেক শুনিনো মুঞি পুস্তক বয়াতে।
বথো আছে কথো নাহি কেতাবের মতে॥
নাহি জানে আদ্য কথা নাহি জানে তত্ত্ব।
পচাল পাড়িয়া মিথ্যা ফিরয়ে সতত॥
তাহা শুনি মনে মোর দ্বিধা সর্ব্বক্ষণ।
রচিনু পুস্তক তবে জানিতে কারণ॥"

উদ্ধৃত, মুনীর চৌধুরী, 'মীর-মানস' (ঢাকা, ১৯৬৫) ৪৪।

৬ "ফারসী কেতাব ছিল মোক্তাল হোসেন। তাহা দেখি কবিতার করিনু বচন॥
রচিতে কবিতা যদি খাতা মুঝে হয়। মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়॥

বদনের ঝুট সাচ্চা আমি নাই ঠৌক। কেতাবে যেমন আছে তাহা আমি লিখি ॥
'জঙ্গনামা' (ঢাকা, ১৯৭৬) ৩-৪। (মরহুম মুনসী ইয়াকুবের নামে প্রচলিত এই পুঁথিটি আসলে গরীবুল্লার লেখা। মুনসী ইয়াকুব অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেছেন মাত্র। দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (দ্বি-স ; ঢাকা ১৯৬৫) ২২০-২১। মুনীর চৌধুরীও এর কিছু উদ্ধৃত করেছেন।

৭ 'বিষাদ-সিন্ধু' উপক্রমণিকা।

৮ 'জঙ্গনামা', প্রাগুক্ত, ৪। দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ, 'ইমাম বিজয়', আলী আহমদ সম্পাদিত। (ঢাকা, ১৯৬৯) এই গ্রন্থে হাসানের কাপড়ের রং নীল এব হোসেনের কৃষ্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১১৮।

৯ Mohammad Abdul Awal, 'The Prose Works of Mir Masa-ৎ rraf Hosen' (Chittagong, 1975) 88.

১০ মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ৪৭।

১১ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র। অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'মধুসূদন-রচনাবলী' (কলকাতা, ১৯৭৩) ইংরেজি রচনাবলী, ৩৩০।

১২ Mohammad Abdul Awal, op. cit. 31.

১৩ মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ১৮।

১৪ মহরম পর্ব্ব, সপ্তম প্রবাহ।

১৫ মহরম পর্ব্ব ; ত্রয়োদশ প্রবাহ।

১৬ প্রাগুক্ত।

১৭ মহরম পর্ব্ব ; ষোড়শ প্রবাহ।

১৮ মহরম পর্ব্ব ; সপ্তদশ প্রবাহ।

১৯ এজিদ-বধ পর্ব্ব ; প্রথম প্রবাহ।

২০ প্রাগুক্ত।

২১ প্রাগুক্ত।

২২ 'মেঘনাদবধ কাব্য' ; প্রথম সর্গ।

২৩ মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ৪৮।

২৪ অরবিন্দ পোদ্দার, 'বঙ্কিম-মানস' (চতুর্থ মু : কলকাতা, ১৯৬৬) ৭৬।

২৫ অচ্যুত গোস্বামী, 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' (কলকাতা, ১৩৬৪) ৪৬।

২৬ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, 'মীর মশাররফের গদ্যরচনা' (ঢাকা, ১৯৭৫) ৮১।

২৭ দ্রষ্টব্য, মীর মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী'।

২৮ কেনীর উক্তি : ষোড়শ তরঙ্গ।

২৯ অষ্টাদশ তরঙ্গ।

৩০ মুখবন্ধ।

৩১ 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' : ষষ্ঠ নথি।

৩২ মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ৬৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোজাম্মেল হক

মোজাম্মেল হক খুব বেশি উপন্যাস রচনা করেননি। এ যাবৎ তাঁর মাত্র দুখানা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস পাওয়া গেছে। তিনি 'রঙ্গিলা বাঈ' নামে একখানা উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, কিন্তু নানাকারণে সেটি শেষ করে যেতে পারেননি।[১] অতএব এই ক্ষেত্রে তাঁর অবদান একেবারে সীমিত। তবে উপন্যাস ছাড়া তিনি কিছু উপখ্যানধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার বেশির ভাগই আরব ও পারস্য দেশীয় লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত। এসব গ্রন্থ হলো, 'মহর্ষি মনসুর' (১৮৯৬), 'তাপস জীবনী' (১৯০০) 'শাহনামা' (১৯০১)' 'হাতেম তাই' (১৯১৯)। এসব গ্রন্থে ইতিহাস বা ধর্ম কিছুই প্রাধান্য পায়নি। তবে এগুলো রচনার সময় তিনি তৎকালে জনপ্রিয় মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই রীতি আত্মসাতের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে একজন বিশিষ্ট মুসলমান লেখকের মিল রয়েছে—তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু' নামক মিশ্রভাষারীতিকাব্যপ্রভাবিত উপন্যাস রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন।[২] এসব গ্রন্থ দেখে মনে হয়, তিনি সুফীবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন—যদিও তার মূল আজো অনাবিস্কৃত।[৩] তাঁর রচনার ভাষারীতি সেদিন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। এসব রচনার প্রাণমূলে মিশ্রভাষারীতিকাব্যের প্রভাব থাকলেও তিনি বিশুদ্ধ বাঙলায় তাঁর লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই সমান্তরাল। একারণেই সমসাময়িককালের পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রশংসিত হয়েছিলো। এই প্রশংসাই তাঁকে মুসলিম গদ্যলেখকদের ভেতর বিশিষ্ট স্থান প্রদান করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সার্বিক মানসিকতা বিচার করলেও মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গে মোজাম্মেল হকের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

মোজাম্মেল হকের 'জোহরা' ১৯১৭ সালে লিখিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে[৪]—তাঁর মৃত্যুর দুবছর পর। এই উপন্যাসে মোজাম্মেল হক তৎকালীন মুসলিম সমাজের নানাপ্রকার সমস্যা ফুটিয়ে তুলেছেন। এজন্যে এই উপন্যাসের উৎকর্ষ অপকর্ষ আলোচনা শুধু সাহিত্তিক মানদণ্ড বিচারেই নয়, মুসলিম সমাজকে জানার জন্যেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গ্রামের একজন সাধারণ বিত্তশালীর একমাত্র কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে এনে তার সম্পত্তি আত্মসাতের দুরভিসন্ধি করে ফয়জুল্লাহ নামে এক দুর্বৃত্ত। এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে গিয়ে একটি অসহায় বালিকাকে কি পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা-ই এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই অপহরণকে কেন্দ্র করে সমাজ-জীবনের একটা বিশেষ স্তরে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা ই লেখকের লক্ষ্যমূল। এই কাহিনীর অন্তরালে লেখক সমাজের সৎ ও অসৎ এই দুটি স্তরের লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর মতে "পাপের পতন, পুণ্যের জয়"ই[৫] সর্বদা হয়ে থাকে। অতএব লেখকের মনোভাব একদেশদর্শী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু লেকথ অত্যন্ত সচেতনভাবে মানুষের স্বভাবমূলে আন্দোলিত দোষ-গুণ, সবলতা-দুর্বলতা, স্নেহ-ঘৃণা অবলোকন করেছেন এবং যতদূর সম্ভব তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই তাঁর রচনায় কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি প্রাধান্য পায়নি। সৎ ও অসৎ বলতে তিনি কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বুঝতেন না, বরং মানবজীবনের একটা স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই তাকে দেখেছেন, যদিও তাতে পরিবেশের প্রভাবও বিশেষভাবে কার্যকর। এই মনোভাবের পেছনে লেখকের পর্যবেক্ষণশীল মানসিকতাই সর্বাধিক কাজ করেছে। তাঁর এই মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে আলেপ মিয়া বা হাজরা বাগদীর মতো চরিত্র—যারা গ্রামের কুৎসিত দলাদলিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেও, অথবা ডাকাত দলের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও নিজেদের মানবিক মূল্যবোধ হারায়নি। জোহরার সর্বশেষ আশ্রয়দাতা জমিদারের পুত্র আবুল হোসেনের ভেতরও লেখক এই মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। সে জোহরাকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু পারিবারিক বা সামাজিক গণ্ডির বাইরে গিয়ে তার সম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ করেনি। লেখক এই দুধরনের মনোভাবের ভেতর যে সীমারেখা টেনেছেন, তা খুবই স্পষ্ট। এই উপন্যাসে লেখকের মনোভাব অসাম্প্রদায়িক। মোজাম্মেল হক পরবর্তীকালে (১৯১৯) লিখিত 'দরাফ খাঁ গাজী' উপন্যাসে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তার সঙ্গে 'জোহরা'র পার্থক্য মৌলিক।

কাহিনীনির্মাণে লেখকের দক্ষতার ছাপ আছে। যদিও কাহিনীটি চারিত্রিক দ্বন্দ্বের ভেতর বিকশিত হয়নি, তবু লেখকের ঘটনাবিন্যাস-কৌশল প্রশংসার যোগ্য। জোহরাকে ভোজের নাম দিয়ে যেভাবে নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে কোনপ্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই। কারণ তাদের সঙ্গে পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্কটি বেশ নিবিড়। এরপর লেখক দক্ষতার সঙ্গে কাহিনীর গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হয়ে তাকে বাবার বাড়িতে দিয়ে আসার প্রাক্কালে পথ হারানো, ডাকাতের খপ্পরে পড়া, সেখানে ব্রাহ্মণ-মহিলার সাহায্যে মুক্তিলাভ, এবং দিলদার শাহের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করা সত্ত্বেও আবারো পথ হারানো, সর্বশেষে জমিদার হায়দার হোসেনের আশ্রয়লাভ সবই যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। জোহরার প্রতি জমিদারকন্যা বদরুন্নিসার আকর্ষণের যে ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে, তাও যুক্তিসঙ্গত। এ জাতীয় পরিবেশ রচনা লেখকের শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জোহরা—যদিও জোহরার প্রেম বা তার মানসিক দ্বন্দ্বপ্রকাশের প্রচেষ্টা এই উপন্যাসে তেমন নেই। লেখক সচেতনভাবেই সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব এড়িয়ে গেছেন বলে মনে হয়। শুধু একটি সরলা বালিকার রূপ এবং তার অবর্তমানে তার ঐশ্বর্য

আত্মঘাতের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সমাজে যে অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে তাই লেখকের প্রধান লক্ষ্যস্থল। এজন্যে দেখা যায়, বালিকার চিন্তা ও কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত। সে তার কাসেমভাইকে ছাড়া আর কাউকে চেনেনা। নচেৎ জমিদারের বাড়িতে জমিদারপুত্র আবুল হোসেনকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত প্রেমের ভিন্নধর্মী ধারাটিকে লেখক ব্যবহার করতে পারতেন এবং তদ্দ্বারা জোহরার মনে একটি প্রবল পরস্পর-বিরোধী অথচ যুক্তিসঙ্গত অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারতেন। এতে মূল কাহিনীর কোন অমর্যাদা হতোনা, বরং একটা চিরন্তন মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা নতুন রূপ নিয়ে পাঠকের সামনে উদ্‌ঘাটিত হতো। কিন্তু লেখক তা করেননি। ফলে অন্যান্য চরিত্রের মতো মূল চরিত্রও সাধারণ হয়ে পড়েছে। অতএব সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে হবে। জোহরার চিত্রাংকণে লেখকের কৌশল ও সচেতনতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই উপন্যাসের নায়িকা জোহরা —জোহরাই। কাজেকর্মে, চিন্তাভাবনায় প্রতিটি পদক্ষেপেই সে বালিকা। তার ব্যবহার ও আচরণ কোথাও অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে তার কোন কাজই বয়সের গণ্ডি অতিক্রম করেনি। আট বছর বয়সের জোহরা চিন্তাভাবনাতেই তার পরিচয় প্রদান করেছে। এজন্যেই তাদের প্রেমের উৎস দেখি মিঠাইর আদানপ্রদানে—চিঠি-পত্র বা কোনপ্রকার ভাবসমৃদ্ধ সংলাপে নয়। আরো একটু এগিয়ে গেলে লেখকের তীক্ষ্ণ চরিত্রসচেতনতা ও বাস্তববোধ পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। জোহরা তার মামুদের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। লেখক ও পাঠক উভয়ের চিত্তই শঙ্কাকুল। কারণ সব ষড়যন্ত্রই ইতোমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। একমাত্র জোহরাই নিঃশঙ্ক ও নির্বিকার। এই চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মোজাম্মেল হক যে সংযমের পরিচয় প্রদান করেছেন তা তাঁর শিল্পীসুলভ চেতনাবোধের সাক্ষর। অন্য কোন তৃতীয় শ্রেণীর লেখক হলে এই পর্বে জোহরার মনের অজ্ঞাত কোণে একটু অজানা ও অননুভূত শঙ্কা প্রদর্শনের লোভ

সংবরণ করতে পারতেন না। এই ক্ষেত্রে লেখকের বাস্তবজ্ঞান ও বিজ্ঞানবুদ্ধিই যে বহুলাংশে কাজ করেছে তা বলাই বাহুল্য। গদ্য-রচনায় যিনি "অলৌকিক জগতকেই…পুনঃসৃষ্টি করেছিলেন"[৬] তাঁর পক্ষে এটি কম কথা নয়। বিয়েতে তেল হলুদ মাখার সময় তার মনে যে প্রশ্ন উঠেছিলো তাও স্বাভাবিক। লেখক নির্লিপ্তভাবে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। এই কারণে জোহরার ভেতর আট থেকে বারো বছরের একটি অর্ধস্ফুট বালিকার যথার্থ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। জোহরা কারো মানসপুত্রী নয়, বা এমন কিছু অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারিনীও নয়, নিতান্তই একটি বালিকা—সরল, শান্ত, অকপট; যেমনটি অহরহ দেখা যায়। এই উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র হলো ফয়জুল্লার স্ত্রী। তার ভেতরও লেখক স্বাভাবিকতা প্রদর্শন করেছেন। বিশেষত বালিকা জোহরার আব্দার রক্ষার ক্ষেত্রে সে যে ঝুঁকি নিয়েছিলো তা সত্যি প্রশংসনীয়। কারণ এতদ্দারা তার অন্তর্জগতে সুপ্ত মাতৃত্ববোধ জেগে উঠেছে—যা নারীর জন্যে চিরন্তন। পুরুষচরিত্রের ভেতর একমাত্র কাজী আলতাফ আলীর চিত্রটি শিল্পসম্মত। তাঁর প্রথম জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা, শেষ জীবনের নিয়মানুবর্তিতা এবং জোহরার অপহরণের সংবাদে ক্রোধ সবই সচেতনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যান্য চরিত্র গতানুগতিক।

'জোহরা' উপন্যাসের মাধ্যমে মোজাম্মেল হক তৎকালীন সমাজের একটা নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চিত্রের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তর বাস্তব এবং পাঠকের সামনে স্পষ্ট। মুসলমান আয়মাদারদের অবস্থা, সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনযাত্রা, জীবনের সর্বস্তরে ধর্মানুভূতি ইত্যাদি নানাপ্রকার সমস্যা চরিত্র ও সংলাপের ভেতর দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। ফয়জুল্লার জোহরা অপহরণ তার সামাজিক সত্তারই অংশ। কারণ এই অপহরণের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তির প্রশ্ন জড়িত। অনুরূপ আলেপ মিয়ার মহানুভবতার পেছনে তার সততা ও মানবতাবোধ যতদূর কাজ করেছে,

ফয়জুল্লাহ কর্তৃক তার ভোজ পণ্ড করার প্রতিশোধ-যে এই পর্বে কোন অংশে কম কাজ করেনি তা বলাই বাহুল্য। আলেপ মিয়ার এই অসহায় অবস্থা সম্পর্কে সবাই সচেতন। অনেকে ফয়জুল্লার এই বিপদকে তার কৃতকর্মের ফল বলে উল্লেখ করেছে। এই উপন্যাসে মোজাম্মেল হক সর্বাধিক বাস্তববোধের পরিচয় প্রদান করেছেন গ্রামে দারোগা-পুলিশের শুভাগমন এবং কোর্টে মামলা উপলক্ষ্যে মোক্তার-উকিলদের কার্যকলাপের দৃশ্যে—যা আজো বিদ্যমান। এর সঙ্গে রয়েছে পরান্নভোগী মোল্লাশ্রেণী, দালাল, ফাঁকিবাজ প্রভৃতির চরিত্র। সামাজিক সমস্যা দেখে মনে হয়, লেখক এসব সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

মোজাম্মেল হকের 'দরাফ খাঁ গাজী' সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে

পাদটীকা

১ 'জোহরা' (ষষ্ঠ-স ; কলকাতা, ১৯৫৮) ঃ নিবেদন।

২ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য,' (ঢাকা, ১৯৬৪) ২৭৫।

৩ প্রাগুক্ত, ২৭০।

৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (ত.-স ; চট্টগ্রাম, ১৯৬৮) ১১৯।

৫ 'জোহরা', অধ্যায়, পঁয়ত্রিশ।

৬ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

কাজী ইমদাদুল হক

যেসব মুসলিম মনীষী মনের অকৃত্রিম ঔদার্য নিয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করতেন এবং জীবনের নানাক্ষেত্রে তাকে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন. তাঁদের ভেতর কাজী ইমদাদুল হক একটি বিশিষ্ট নাম। "সৌম্য দর্শন ও প্রিয়ভাষী মার্জিত রুচি ও মুক্তমন, জ্ঞানগর্বী ও সমাজপ্রেমী কাজী ইমদাদুল হক তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অতুলকীর্তি রেখে গেছেন, তার মাহাত্ম্য উপলব্ধি আজও আমাদের চিত্তের জাগরণ ও উৎকর্ষের জন্য অপরিসীম সহায়।"[১] তাঁর রচিত উপন্যাস, ছোটগল্প প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করলেই এই উক্তির যথার্থ উপলব্ধি হবে। নিজে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার প্রায় সবটুকুই তিনি একটিমাত্র উপন্যাসে উজাড় করে দিয়েছেন। যে কারণে বাঙালী মুসলমানদের হৃদয়ে কাজী সাহেবের স্থান স্থায়ী।

কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' (১৯২৫) একখানা অসমাপ্ত উপন্যাস। "১৯১৮ সালে কঠিন অস্ত্রোপচার ভোগের পর কাজী ইমদাদুল হক সাহেবকে দীর্ঘ হাসপাতাল বাস স্বীকার করতে হয়। তাঁর 'আবদুল্লাহ' সেই হাসপাতাল বাসকালে রচিত।"[২] ১৯২০ সালে এই উপন্যাসের কয়েক পরিচ্ছেদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। ত্রিশটি পরিচ্ছেদ পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর পরলোক গমনের পর 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত ৩০শ পরিচ্ছেদের পরবর্তী ১১টি (৩১শ-৪১শ) পরিচ্ছেদ ইমদাদুল হক সাহেবের খসড়া অবলম্বন করে মরহুম কাজী আনোয়ারুল কাদীর সাহেব রচনা করেন। পরে এই অংশটুকু মরহুম কবি শাহাদাৎ হোসেন কর্তৃক ঈষৎ পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়ে

উপন্যাসখানি……গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।"[৩] পরে ৩১শ ও ৩২শ পরিচ্ছেদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। আবদুল কাদির লিখেছেন, "তাঁর মৃত্যুর পর প্রাপ্ত ৩১শ ও ৩২শ পরিচ্ছেদ দু'টি মিলিয়ে দেখলে উভয়ের ভাষাভঙ্গি, ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য চোখে পড়ে।"[৪] এই উক্তি যথার্থ। আমরা শুধু কাজী ইমদাদুল হক-রচিত অংশটুকুতেই (তাঁর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি আকারে প্রাপ্ত ৩১ ও ৩২ পরিচ্ছেদ সহ) আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

মুসলমানদের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা খুবই সীমিত। তথাপি এই সীমিত সংখ্যক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যেগুলো সার্থকতা দাবি করতে পারে তার ভেতর কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসের মাধ্যাম লেখক তৎকালীন মুসলিম সমাজের একটা জটিল অবস্থার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পীরগঞ্জ গ্রামের পীরবংশোদ্ভূত ওয়ালিউল্লাহর পুত্র আবদুল্লাহর জীবনজিজ্ঞাসার চিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। আবদুল্লাহ পীর বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ইংরেজি শিক্ষার গুণে তার ভেতরকার তাবৎ কুসংস্কার দূরীভূত হয়। ফলে সে আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বীয় অধ্যবসায় বলে সফলতা লাভ করে।

এই উপন্যাসের কাহিনীমূল আবদুল্লাহ এবং তার জীবনসংগ্রাম। এই সংগ্রামচিত্রকে চক্ষুগ্রাহ্য করার জন্যে লেখক যে পটভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে, (১) আবদুল্লাহর শ্বশুর —একবালপুরের সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস, তাঁর পরিবার পরিজন এবং (২) তাঁর পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভোলানাথ সরকার। এঁদের ভেতর যে পার্থক্য রয়েছে তা আভিজাত্যের। সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের আর্থিক অবস্থা যাই হোক, খান্দানের শরাফতের ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন। কারণ তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতই অর্থে ও মানে শরিফ

ছিলেন। ভোলানাথ সরকার মহাজনী কারবারের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ করেছেন, ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। তথাপি তিনি সৈয়দ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কারণ তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা প্রকৃতরূপে সৈয়দ সাহেবের পূর্বপুরুষদের অন্নে লালিত ও পুষ্ট। (৩) রসুলপুরের মীর মোহসেন আলীও এই উপন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য একটি ধারা—যার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি সৈয়দ সাহেবের তুলনায় ভিন্ন। মোহসেন আলীর শরাফত রয়েছে, তবে তার গুমরে তিনি ইহকালে সর্বস্বান্ত হতে রাজি নন। ফলে তিনি পাটের ব্যবসা করেন, মহাজনী কারবারে সুদে টাকা খাটান। তিনি পরোপকারী ও বন্ধু বৎসল। একারণে তাঁর সম্পর্কে অনেকের ধারণা, "সুদ নিয়ে ওর যে গুনাহ হচ্ছে তার চেয়ে বেশী সওয়াব হচ্ছে পরের উপকার করে।"[৭] মীর সাহেব সর্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত। গোটা উপন্যাসে আব্দুল্লাহকে কেন্দ্র করে এই তিনটি পরিবার চক্রাকারে ঘুরছে। লেখক এই চরিত্রটিকে কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করে কাহিনীনির্মাণ করেছেন এবং পরিবেশ অনুযায়ী ঘটনা বিন্যাস করে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। লেখকের মূল চিন্তাধারা আবর্তিত হয়েছে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজকে কেন্দ্র করে। তাদের আবেগ-অনুভূতি, সবলতা দুর্বলতা, বোধ-সংস্কার এই আবর্তনের লক্ষ্যস্থল।

যেকারণে গোটা উপন্যাসে বহু চরিত্রের যেমন সমাবেশ ঘটেছে, তেমনি নানাবিধ সমস্যাও জড়ো হয়েছে। এসব সমস্যা উত্থাপন করতে গিয়ে লেখক অপরিসীম সংযমের পরিচয় প্রদান করেছেন। কারণ কোন সমস্যাই লেখক চাপিয়ে দেননি। বরং কাহিনী ও সংলাপের ভেতর দিয়ে এসব সমস্যা জেগে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে। লেখক একজন নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবেই এসব সমস্যা অবলোকন করেছেন। কোথাও তাঁর কোন ভূমিকা রয়েছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ যে নির্লিপ্ততা এক-জন প্রথম শ্রেণীর লেখকের প্রধান গুণ তা কাজী ইমদাদুল হকে প্রচুর

বিদ্যমান। এই নির্লিপ্ততার জন্যে তাঁর পক্ষে কাহিনীতে অব্যাহত গতি দান করা যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি তাতে দ্বন্দ্ব প্রদর্শন করারও অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। এই একই কারণে চরিত্রগুলো টাইপে পর্যবসিত না হয়ে রক্তমাংসে গড়া মানবমানবীতে পরিণত হয়েছে—যা সেদিনের জন্যে ছিলো দুর্লভ।

'আবদুল্লাহ'র একটা বৈশিষ্ট্য হলো নারীচরিত্রে অপ্রাধান্য। এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। লেখক তাঁর উপন্যাসে যে সময়কার সমাজব্যবস্থার চিত্র অংকন করেছেন তা সামন্ততান্ত্রিক জীবনাশ্রয়ী এবং এই জীবন সর্বাত্মভাবে ধর্ম ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই ধর্ম ও সংস্কারাশ্রিত সমাজের একটা প্রধানবৈশিষ্ট্য হলো নারীস্বাধীনতার অস্বীকৃতি। সমাজ ও সংসারে নারীর-যে কোন ভূমিকা থাকতে পারে তা এই প্রথা স্বীকার করে না। কাজী ইমদাদুল হকের চিত্রিত নারী অস্ফুট হওয়ার কারণ তাই। আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে. এই উপন্যাসে মীর মোহসিন আলীর জীবনে নারীর কোন প্রভাব নেই। কারণ মীর সাহেবকে যেভাবে একজন মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে নারীর চরিত্রেও অনুরূপ স্বভাব আরোপ করা অপরিহার্য হয়ে পড়তো। কিন্তু তা অস্বাভাবিক হতো বলেই সম্ভবত লেখক সেটি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। রাবিয়া-চরিত্রটিতে যথেষ্ট প্রাণস্পন্দন রয়েছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে আবদুল খালেকের কল্যাণে। আবদুল্লাহর মাতার ভূমিকার পেছনে কাজ করেছে তাঁর পরিবারে অভিভাবক-পুরুষের অনুপস্থিতি। আবদুল্লাহর বাবা জীবিত থাকলে হয়তো এমনটি সম্ভব হতোনা। সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁর পরিবারের স্ত্রীসদস্য তো দূরের কথা, কোন পুরুষ সদস্যও মাথা তুলতে পারেনি। তারপর রয়েছে ইসলামের অবরোধ প্রথা। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে লেখকের এই সচেতনতা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আবদুল্লাহ। সে শিক্ষিত, উদার ও উচ্চাভিলাসী। সে সর্বতোভাবে সংস্কারমুক্ত হয়ে বাঁচতে চায়—যা মুসলিম সমাজের জন্যে আদর্শ হতে পারে। তাকে সবদিক দিয়ে সহায়তা করেছে একাধারে তার শ্যালক, ভগ্নিপতি ও বন্ধু আবদুল কাদের। এই চরিত্রের প্রেরণার উৎস মীর মোহসেন আলী। আবদুল্লাহ-চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সেদিনের গোটা সমাজটিকে তুলে ধরেছেন। সে বিবেকের তাড়নায় তার পিতার বনেদী পীরমুরিদী ব্যবসা করতে যেমন রাজি নয়, তেমনি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে পড়ার জন্যে শ্বশুরের কাছে টাকা চাইতেও তেমন উৎসাহী নয়। পরিবারের ঐতিহ্যের প্রতি সে যেমন শ্রদ্ধাশীল, তেমনি প্রয়োজনের খাতিরে সেই ঐতিহ্যের মূলে আঘাত হানতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধি। কিন্তু সেদিন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিলো, সে ব্যাপারেও সে সচেতন। মীর মোহসেন আলীর ভেতর সে যে কর্ম-ধারা লক্ষ্য করেছে তা ধর্মানুমোদিত না হলেও তার ভেতরই মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত, একথা আবদুল্লাহ উপলব্ধি করতে দেরি করেনি। তথাপি তার মা সুদখোরের টাকা নিয়ে তাকে পড়াতে রাজী নন বলে তার পক্ষে মীর সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করাও সম্ভব হয়নি। অবশেষে সে সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তার জীবনের রূপরেখা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে।

এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস। কারণ এই চরিত্রে লেখক তাবৎ মানবিক গুণাগুণ স্থাপন করেছেন। সৈয়দ সাহেবের আর্থিক অবস্থা খুব যে সচ্ছল তা নয়, তথাপি দুর্মর আভি-জাত্যবোধ তাঁকে অমিতব্যয়ীতে পরিণত করেছে। একারণে তালুক বিক্রি করে তিনি যে মসজিদ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা শেষ করতে গিয়ে তাঁকে একেবারে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। তিনি সবকিছুই এই বোধ দিয়ে বিচার করতেন। যেকারণে পেয়াদা-

চাপরাশিদের সঙ্গে নামাজ পড়তে তিনি কুণ্ঠিত, সেই একই আভিজাত্যের অহঙ্কারে তিনি ইসলামের সাম্যনীতির মূলে আঘাত হানতেও পিছপা নন। আতরাফের প্রতি তাঁর ঘৃণা অপার। এর প্রকাশ পেয়েছে, দহলিজে শিক্ষাদানরত মৌলবির প্রতি তাঁর প্রতিবেশী দরিদ্র-ছেলেমেয়েদের সরক দেওয়ার নির্দেশের ভেতর। অথচ লোকসম্মুখে ঔদার্য ক্ষুন্ন হবার ভয়ে তাদের নিজের বাড়িতে আসতে তিনি নিষেধও করতে পারছেন না। অর্থের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা যাই থাকনা কেন, তিনি আভিজাত্যের মোহে তহশিলদার মহেশ বোসের তছরূপকৃত আটশ টাকা এক কলমের খোঁচায় মওকুফ করে দেন। তাঁর আশরাফসুলভ অহমিকাবোধ সম্ভবত সরল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও এই বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। পুত্রবধূকে ডাক্তারের হাতে চিকিৎসা করাতে অনীহা, মেয়েকে ট্রেনে পাঠাতে অস্বীকৃতি, তালুক বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে মসজিদনির্মাণ-পরিকল্পনা তার প্রমাণ। এই বোধ চিরন্তন—যা নানাসময়ে নানাপ্রকার রূপ ধরে মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

এছাড়া অন্যান্য চরিত্রও যথাযথ পরিস্ফুট। চরিত্রের খাতিরে লেখক উপন্যাসের নানাস্থলে নানাপ্রকার শব্দ প্রয়োগ করেছেন—যা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অবস্থান নির্দেশক। কাহিনী পরিস্ফুটনেও এজাতীয় শব্দপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেসব সমস্যা সেদিন মুসলমান সমাজকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত করেছিলো তার সবগুলোই এই উপন্যাসে স্থাপন করা হয়েছে। তবে লেখকের প্রধান লক্ষ্য তিনটি : তথাকথিত আভিজাত্যবোধ, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি সমাজের মনোভাব, এবং ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাশ্রেণীর স্বার্থপরতা ও নীতিবোধহীনতা।

আশরাফ শ্রেণী বলে কথিত মুসলমান সমাজের দুটো দিক তিনি

লক্ষ্য করেছেন। একটা হলো সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের মতো সত্যিকার আশরাফ—যাঁদের ক্রমনিমজ্জমান দেহের ভারে ধীরে ধীরে গোটা সমাজটাই রসাতলে যেতে বসেছে। তাঁরা ধর্ম করেন লোক দেখানোর জন্যে, অথচ ধর্মের মৌল অনুশাসনের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা প্রায় সমান। অন্যদিকে রয়েছে শরিফাবাদের হাজি বরকতুল্লাহ-"যাঁর পিতা শরীয়তুল্লাহ মাত্র পনের দিনের দারোগাগিরির দৌলতে যখন এক বিপুল সম্পত্তি খরিদ করিয়া দেশের মধ্যে একজন গণ্য-মান্য লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরাফতের দবজাও অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল", পরে তাঁর পক্ষে গোটা "বঙ্গদেশের মধ্যে একেবারে অতি-শরীফতম ঘর বলিয়া পরিচিত হইতে কোনই বাধা বিঘ্ন ঘটে নাই।"[৬] লেখক এই উভয়বিধ শরাফত-অভিমানীকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলেছেন এবং তারা কিভাবে গোটা মুসলমান সমাজকে অবনতির শেষ স্তরে নিয়ে যাচ্ছে তার চিত্রও বেশ দক্ষতার সঙ্গে অংকন করেছেন। এই আশরাফ শ্রেণীর যেসব অপরিণামদর্শী মনোভাবের দরুন মুসলমান সমাজ পশ্চাদপদ থেকে গেছে তার ভেতর প্রধান হলো ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণাভাব। এই ভাব আবদুল্লাহর পরিবারে যেমন ছিলো, তেমনি তার শ্বশুর সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের পরিবারেও ছিলো। তথাপি দুই পরিবারের দুজন কৃতিসন্তান (আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদের) এই বাধা অতিক্রম করে ইংরেজি শিক্ষালাভ করেছে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার সুফল দেখানোর জন্যে তিনি এসব পরিবারের পাশে ভোলানাথ রায়ের পরিবারের চিত্রও অংকন করেছেন। শুধু তাই নয়, এই পরিবারের সদস্যদের ভেতর যে ঔদার্য লক্ষ্য করা গেছে, তাকে একরকথায় ইংরেজি শিক্ষার সুফল আখ্যা দেওয়া যায়। লেখক মনে করেন, মানসিকতার দিক দিয়ে অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের ভেতর যেমন কোন পার্থক্য নেই, তেমনি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে শিক্ষিতশ্রেণীও

সমমানবিকতার অধিকারী। এই উপন্যাসে লেখক আরবি শিক্ষিত ধর্মব্যবসায়ী এবং অশিক্ষিত ধর্মব্যবসায়ীদের এক চোখে দেখেছেন। তিনি মনে করেন, এদের ধর্মচর্চা লোকদেখানো আচার ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে ধর্মপ্রাণ সৈয়দ সাহেব লোক দেখানোর জন্যে তাঁর বাড়ির মকতবে আতরাফ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পডাতে নিষেধ করতে পারছেননা, অথচ মৌলবী সাহেবকে তাদের সবক কম দিতে পরামর্শ প্রদান করছেন, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এত খোঁজখবর রেখেও তিনি তার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী নন। পীরভক্ত ফজলর রহমান মালভাড়া ও টিকেটের পয়সা ফাঁকি দিতে যেমন কুণ্ঠিত নয়, তেমনি সৈয়দ সাহেবের পীরভাই সুফী সাহেব সেকথা জেনেও তা মেনে নিচ্ছে অবলীলায়। রসুলপুরের ধর্মপ্রাণ বাদশা মিঞা সুদী কারবারের জন্যে মীর মোহসেন আলীকে প্রকাশ্যে ঘৃণা করে বলে প্রচার করছে, অথচ তার পুত্র আলতাফের জন্যে এই সুদখোরের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করছেনা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ যথার্থ যে, "যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে, সেই অন্ধতাই ধুতি চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ প'রে মুসলমানদের ঘরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে।"[৭]

এছাড়া আরো বহু সামাজিক সমস্যার প্রতি লেখক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আশরাফ শ্রেণীর বিবাহপ্রথা, অাহতু টাকার অহংকার দেখানো, মুসলমান সমাজের প্রতি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কৃপাদান, হিন্দুশিক্ষিত সমাজ কর্তৃক মুসলমান শিক্ষিতদের পদে পদে বিপর্যস্ত করা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা, মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহের রীতি, মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি নানাপ্রকার সমস্যার প্রতি লেখক মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৮]

পাদটীকা

১ আবদুল কাদির, "খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক", 'কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী' (ঢাকা, ১৯৬৮) ৬৪৮।

২ কাজী আবদুল ওদুদ, "আবদুল্লাহ"' 'শাশ্বত বঙ্গ' (কলকাতা, ১৩৫৮), ৩০৯।

৩ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, ৬৩১।

৪ প্রাগুক্ত।

৫ 'আবদুল্লাহ', অধ্যায়, ১৫।

৬ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ১৯।

৭ কাজী ইমদাদুল হককে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। উদ্ধৃত, আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, ৬৫৬।

৮ কাজী ইমদাদুল হকেব মৃত্যুর পর এই উপন্যাসের যে অংশটি কাজী আনোয়ারুল কাদীর কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছে, আমি সে অংশ সম্পর্কে আলোচনা করিনি। তার মূল কারণ দুটো। প্রথমত, কাজী সাহেবের রচিত যে দুই অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তাতেই উপন্যাসটি শেষ হতে পারে। কারণ এই উপন্যাসের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদেরের সংস্কারমুক্তির চিত্র ফুটিয়ে তোলাই যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা যথাযথ ফুটে ওঠেছে তাদের শহরবাসের প্রস্তুতির ভেতর। সৈয়দ সাহেবও শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যদিও কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন যে, কাজী সাহেবের ছককৃত পথ ধরেই এই উপন্যাস শেষ করা হয়েছে, তবু আমার কাছে কাজী আনোয়ারুল কাদীরের অংশটি দুর্বল মনে হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এই কাহিনীকে কাজী সাহেবেব চিন্তার প্রতিকূল বলেও মনে হয়েছে। যেমন, আবদুল কাদেরের এমন শোচনীয় পরিণতির কোন সঙ্গত কারণ নেই। অনুরূপ ৩১ অধ্যায়ে হঠাৎ সালেহার ভেতর এমন প্রতিক্রিয়া দেখানোও অসঙ্গত। কারণ কাজী সাহেব সালেহাচরিত্রের মাধ্যমে নারীজাতির ভিন্নধর্মী একটি রূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। এবং এই চরিত্রের-যে কোন ভিত্তি নেই তাও বলা যায় না। সালেহার মৃত্যুও অস্বাভাবিক। এর উদ্দেশ্য কি আবদুল্লাহকে দিয়ে বিধবা বিবাহ করিয়ে সমাজের কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা? কিন্তু এই উপন্যাসে কাজী সাহেব এজাতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠকে যেভাবে সোচ্চার করেছেন, তার চেয়ে এ জাতীয় ঘটনা অধিকতর দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কোন কারণ নেই। উপরন্তু লাইব্রেরির শৃঙ্খলাবিধানের জন্যে আবদুল্লাহ গ্রীষ্মের ছুটিতে তার স্ত্রীকে আনতে

বা দেখতে যেতে পারেনি এই অজুহাতের কোন বাস্তবভিত্তি নেই। সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের পরিণতি যথাযথ হলেও সালেহার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহর কাছে তার মোহরানার টাকা দাবি করাটা এই চরিত্রের স্বভাববিরোধী বলে মনে হয়। কাজী সাহেবের মৃত্যুর পর প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে শ্বশুরের সঙ্গে জামাইয়ের যে সম্পর্ক অংকিত হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলেও এই দাবি অসঙ্গত। সৈয়দ সাহেবের চরিত্রে বহু পরস্পরবিরোধীভাব, লোভ, মোহ রয়েছে বটে, কিন্তু লেখক এই চরিত্রে কোথাও হীনতা আরোপ করেননি।

এসব নানাদিক বিবেচনা করেই আমি এই অংশটিকে আমার আলোচনা থেকে বাদ দিয়েছি। উপরন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় কাজী ইমদাদুল হকের উপন্যাস, কাজী আনোয়ারুল কাদীরের নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পূর্ববঙ্গের পাটব্যবসাকে কেন্দ্র করে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের গোড়াপত্তন হয়। এই ব্যবসা উপলক্ষ্যে সদ্যগজিয়েওঠা মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী কলকাতার বিত্তশালী হিন্দুদের সংস্পর্শে আসেন এবং হিন্দুদের দেখাদেখি তাঁদের ভেতরও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগের ফলে তাঁরা আরবি, ফারসি ও উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও উৎসাহ অনুভব করেন। এই উৎসাহের ফলে তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সৎভাব যেমন রাখতে চেষ্টা করেন, তেমনি ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারেও তৎপর হয়ে ওঠেন। এই মধ্যবিত্ত সমাজের যেসব বৈশিষ্ট্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তার ভেতর শিক্ষানুরাগ, ব্যবসার প্রতি আকর্ষণ, ধর্মকর্মকে জীবনের একটা অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করার প্রেরণা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্যে ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য এই মধ্যবিত্তসমাজই পরবর্তীকালে একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছেন।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর উপন্যাসে এই সমাজের চিত্রই অংকন করেছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর উদারতা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মানুষকে কোন-প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে পর্যবেক্ষণ না করে সার্বিক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন। ফলে উপন্যাসে তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মীয় মতবাদ দিয়ে বিচার না করে তাঁর কাজ দিয়ে বিচার করেছেন। তিনি ধর্মকে পাপ ও অপরাধের প্রতিশেধক হিসেবে দেখেছেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চরিত্র

নির্মাণ করেছেন। ফলে তাঁর সৃষ্টিকর্মে ধর্মচ্যুত মুসলমান যেমন অবলীলায় পাপের গভীর পঙ্কে নেমে যাচ্ছে, তেমনি হিন্দুও। অনুরূপ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও হিন্দু একই প্রেরণায় জীবনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিষ্ঠার পরিচয় প্রদানে তৎপর।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান মোট পাঁচখানা উপন্যাস রচনা করেছেন। এই পাঁচখানা উপন্যাসকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এর প্রথমভাগে রয়েছে 'আনোয়ারা' (১৯১৪), 'প্রেমের সমাধি' (১৯১৫), ও 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৩); দ্বিতীয় ভাগে 'পরিণাম' (১৯২৭); এবং তৃতীয়ভাগে 'হাসান গঙ্গা বাহমনী' (১৯১৭) নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'আনোয়ারা' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

॥ ক ॥

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ভেতর যে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে ওঠেছে। তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে নজিবর রহমানের প্রথম পর্বের তিনটি উপন্যাসে। 'আনোয়ারা'র নুরল এসলাম, 'প্রেমের সমাধি'র মতিয়র রহমান এবং 'গরীবের মেয়ে'র নুর মহাম্মদ এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। তারা পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ধর্মকর্মে বিশ্বাসী, সমাজসেবী এবং সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসা-বানিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলছে। ফলে উপন্যাসত্রয়ে একটা সুস্পষ্ট জীবনজিজ্ঞাসা ফুটে ওঠেছে। এই জিজ্ঞাসা সর্বাংশে মুসলিম জীবন ও ধর্মনির্ভর হলেও ব্যবহারিক জীবনে উদার ও অসাম্প্রদায়িক।

'আনোয়ারা' উপন্যাসের প্রথমেই নুরল এসলামকে দেখা যায় পাটের দালাল হিসেবে—যে পাট মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নুরল এসলামের সঙ্গে মধুপুর গ্রামের জনৈক বিত্তশালী মুসলিম কৃষিজীবীর কন্যা

আনোয়ারার প্রেম ও পরিণয়ই এই উপন্যাসের উপজীব্য। নুরল এসলাম ও আনোয়ারা পরস্পরকে দেখেছে এবং সামাজিক আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। এই ক্ষেত্রে লেখকের সংযম প্রশংসনীয়। কারণ যে অবস্থায় তারা পরস্পরকে দেখেছে, তাতে পূর্বরাগ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। উপরন্তু সে পথে মুসলিম সমাজের অবরোধ প্রথাও একটা বিরাট বাধা। নুরল এসলাম ও আনোয়ারা উভয়েই সৎমার স্নেহ-গঞ্জনার ভেতর লালিত-পালিত হয়েছে। আনোয়ারার সৎমা তার সম্পত্তি আত্ম-সাতের জন্যে তার ভাইপোর সঙ্গে আনোয়ারার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে সে সফল হয়নি; তেমনি নুরল এসলাম-এর সৎমাও ভাইঝির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব উভয় পরিবারে লেখক অশান্তির যে বীজ রোপন করেছেন, তাতে কোন ফাঁক নেই। ফলে উপন্যাসের পরবর্তী অধ্যায়গুলো সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে চলেছে। আনোয়ারা অপহরণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত মামলা-মোকদ্দমার যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা বাস্তবানুগ। বৃটিশ শাসনের কৃপায় আমরা যে শাসন ও বিচার ব্যবস্থা লাভ করেছি, লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার চিত্র অংকন করেছেন। তবে আনোয়ারার প্রতি নুরল এসলামের সন্দেহসৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ আনোয়ারার প্রতি নুরল এসলামের "বিশ্বাস হিমালয় হইতেও অচল, অটল"[১] বলে ঘোষণা করার পর কাহিনী এতদূর গড়িয়ে এসেছে যে নুরল ইসলামের মনে সন্দেহ সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। সম্ভবত নুরল এসলামকে তহবিল তছরূপের মামলায় জড়িত করে কাহিনীতে একটি নতুন জট সৃষ্টি করাই এই অবিশ্বাস আরোপের কারণ। পরবর্তী পর্যায়ে লেখক সফল হয়েছেন। কারণ গোটা মামলাটির ভিত্তি ও পরিণতিতে লেখকের দক্ষতার ছাপ রয়েছে। উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ হলো সৎ-শাশুড়ি কর্তৃক নুরল এসলামের টাকা আত্মসাতের পরিকল্পনা

এবং বাদসার মৃত্যু। কারণ আনোয়ারার সংস্কার স্বভাব যাই হোক না কেন, তার পিতা "খোরশেদ আলী ভুঞা সাহেব মধুপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রধান ব্যক্তি"—একথা লেখকের মনে রাখা উচিত ছিলো। নুরল এসলামের বদলে বাদসার মৃত্যুতে লেখকের যে মনোভাব পরিস্ফুট তাকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। লেখক বিভিন্ন সময়ে এজাতীয় দুর্ঘটনা আরোপ করে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।[৩] মামলার দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত করে লেখক বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেছেন। তবে হামিদার গৃহে আনোয়ারার দীর্ঘ ধর্মোপদেশ বিরক্তিজনক। আনোয়ারার দিদিমা এবং নুরল এসলামের ফুফুর ভূমিকা প্রায় অভিন্ন। কখনো কখনো কাহিনীর জট উন্মোচনের ক্ষেত্রে চরিত্রদ্বয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আমি আগেই নজিবর রহমানের উদার মানসিকতার কথা উল্লেখ করেছি। তিনি ভালো ও মন্দের ভেতর পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি আরোপ করেননি। ফলে আব্বাস, খাদেম ফরমান নবার মতো চরিত্রহীন মুসলমানের সঙ্গে তিলক, গণেশ, রতীশ দাগুর মতো চরিত্রহীন হিন্দুও যেমন রয়েছে; তেমনি আজাদের মতো উদার ও সৎপ্রকৃতির উকিলের সঙ্গে নিরপেক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ ডিপুটি বাবুর চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।

আনোয়ারা, নুরল এসলাম, আমজাদ হোসেন প্রমুখ সৎ চরিত্র। নুরল এসলামের ভেতর যে মানবিক দুর্বলতা আরোপ করা হয়েছে, তা আনোয়ারার তথাকথিত অপকীর্তি উদঘাটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হলে ভালো হতো। এই উপন্যাসের সর্বাধিক সার্থক চরিত্র আনোয়ারার পিতা খোরসেদ আলী। এই চরিত্রে মানবিক আবেগ-অনুভূতি ও সবলতা-দুর্বলতার সজ্ঞানবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। তার দ্বিতীয় বিয়ে, সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, তার প্ররোচনায় আনোয়ারকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা, নুরল

এসলানের মামলায় সাহায্যপ্রদান সবই যুক্তিগ্রাহ্য। শুধু গোলাপ জানের প্ররোচনায় জামাইহত্যার চক্রান্তে অংশগ্রহণকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়না। এই প্ররোচনায় সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথের কথা মনে আসে, তবে তুলনার জন্যে নয়।

'আনোয়ারা'য় পূর্বরাগের সুযোগ ছিলোনা বলে দেওয়া হয়নি। কিন্তু 'প্রেমের সমাধি'তে সেই সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। দরিদ্র ইস্কুল শিক্ষকের ছেলে মতিয়র রহমান শিক্ষার উদ্দেশ্যে মরিয়মদের বাড়িতে জায়গির থাকতো। এই সময়ে পরস্পরের ভেতর প্রেমানুভূতির সৃষ্টি হয়। লেখক প্রবল ধর্মবোধের উপর ভিত্তি করে কাহিনীটির গোড়াপত্তন করেছেন। একারণেই মতিয়র রহমান বসন্তরোগে অন্ধ হয়ে যাবার পর মরিয়মের অন্যত্র বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দৈববলে সে বিয়েতে বাধাসৃষ্টি যত অবাস্তব হোকনা কেন, তা পাঠককে অভিভূত করে। মতিয়র রহমানের দৃষ্টিশক্তিলাভ ও মৃত্যুও একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেহিসেবে গোটা কাহিনীকে অবাস্তব বলা যায়। তবু লেখকের সচেতনতার দরুন তা পাঠকের চোখে গৌণ হয়ে পড়ে। উপন্যাসের সর্বাধিক বাস্তব ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো ইস্কুল পরিচালনার জন্যে প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধ এবং মরিয়ম অপহরণকে কেন্দ্র করে মামলা। এই উপন্যাসেও নজিবর রহমান মানুষের শক্তিকে খোদার ইচ্ছাধীন বলে মনে করে নানাপ্রকার জটজটিলতার ভেতর দিয়ে সেকথা প্রমাণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে ঘটনার সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ বা বিচার করেননি। কারণ তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাসী। উপন্যাসের শেষে[৪] লেখক মতি-মরিয়মের ভেতর আলোচনার মাধ্যমে এই তত্ত্ব পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন।

মতিয়র রহমান ও মরিয়মের চরিত্র গতানুগতিক। কারণ, একটা প্রবল ধর্মবোধ এই চরিত্রদ্বয়ে আরোপিত হয়েছে বলে তাদের

মানবিক মূল্যবোধ যাচাই করার উপায় নেই। তবে নানাভাবে তিনি এসব চরিত্রের মহত্ব প্রদর্শন করেছেন, যার সঙ্গে মানবিক আবেগ-অনুভূতির সম্পর্ক থাকলেও তাতে চরিত্রের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট নয়।

'প্রেমের সমাধি'তেও নজিবর রহমানের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্যণীয়। দেবীনগরের মাইনর ইস্কুলকে হাই ইস্কুলে পরিণত করার যে প্রস্তাব ইস্কুলের সেক্রেটারি নাকচ করে দিয়েছেন তাতে একটা শ্রেণীচেতনার আভাস ফুটে ওঠে, যার সঙ্গে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক নেই। সেক্রেটারির 'স্কুলে ব্যবসায়ী হিন্দু ও কৃষিজীবী মোসলমান ছেলে-পিলেই অধিকাংশ পড়ে। তাহাদের উচ্চশিক্ষার আবশ্যক কি? ভদ্রলোকের ছেলেরা টাউনে থাকে।''[৫] —জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক নয়। শুধু সেক্রেটারির বক্তব্যে নয়, চরিত্রচিত্রণেও লেখক যথেষ্ট ঔদার্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। এই কারণে নরপিশাচ পশুপতি সান্যালের সহচরদের ভেতর গহর ও ছলিমকেও দেখা যায়। মতিয়র রহমানের স্ত্রী অপহরণকে কেন্দ্র করে যে মামলা চলেছে তাতে মতির পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে নিজাম ও রামজয়—"উভয়ই সাধক বলিয়া সর্বত্র পরিচিত।"[৬] যেখানে "হিন্দুগণ জোরেসোরে দায়রায় মোকদ্দমা" চালাচ্ছে, সেখানে "খান বাহাদুরের জনৈক হিন্দু উকিল-বন্ধু মতিয়র রহমানের পক্ষে উপস্থিত" যিনি "প্রবীন ও নিরপেক্ষ লোক।"[৭] এই পর্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলো মরিয়মের সই কনকলতার স্বামী যতীন রায়। তার সাক্ষ্যের উপরই মোকদ্দমা নির্ভর করছে। সে প্রথমে হিন্দুদের চাপে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করলেও স্ত্রীর প্রভাবে অবশেষে আদালতে সত্য কথাই বললো। গোটা উপন্যাসেই লেখকের এজাতীয় সম্প্রদায়নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় রয়েছে। এর কারণ যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মবোধ তা বলাই বাহুল্য।

'গরীবের মেয়ে'তেও পূর্বরাগ নেই। নুর-নুরীর বিয়ের পর

তাদের ভেতর প্রেমের সঞ্চার হয়েছে এবং তা বহুবিসর্পিল পথ অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করেছে। 'গরীবের মেয়ে'র কাহিনী তুলনামূলকভাবে বেশি গতিশীল। যদিও কাহিনীতে বহুব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে, তবু তার গতিধারা দেখে মনে হয় নজিবর রহমান অত্যন্ত সচেতনভাবে কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন। এই উপন্যাসেও ধর্মবোধকে ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। কাহিনীর একদিকে রয়েছে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীনদের সমাবেশ, অন্যদিকে আভিজাত্যবোধ। যদিও এই বোধের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, তথাপি সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনীর সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ হলো, নুরীর সঙ্গে ওসমানের কাল্পনিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নূর মহাম্মদের প্রতিক্রিয়া। যেখানে সে নিজে কিছু প্রত্যক্ষ করেনি, তহুরা বা অন্যকেউ কিছুই জানেনা, সেখানে শুধু কালুর মার কথার উপর ভিত্তি করে নুরীর উপর রুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। কাহিনীটি সব চাইতে বাস্তব হতো যদি কালুর মার কল্পিত অপবাদের সঙ্গে সপত্নীবিদ্বেষিনী তহুরাকেও জড়ানো যেতো। কারণ লেখকতো ইতোমধ্যেই সেই ভিত্তি তৈরী করে রেখেছেন। 'আনোয়ারা' উপন্যাসেও এমন একটা দুর্বল ভিত্তির উপর নুরল এসলামের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে এই দুর্নাম-বিপর্যয়ের মুখে নুরীর মনোভাব বাস্তবসম্মত ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কারণ নারী হিসেবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে তার প্রয়াস সত্যি প্রশংসনীয়। সেদিক দিয়ে নুরীকে আদর্শ গৃহিনী বলা যায়।

'গরীবের মেয়ে'র সবগুলো চরিত্রই পরিস্ফুট। নুর মহাম্মদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রেম, নুরীর পতিপরায়ণতা ও গৃহিনীপনা, তহুরার আভিজাত্যগৌরব সবই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। এর ভেতর তহুরার চরিত্র অধিকতর বাস্তবসঙ্গত। কারণ সতীনকে দেখার আকাঙ্ক্ষা, দেখার পর আশাভঙ্গের কারণে নিদারুন হতাশা এবং সেই হতাশাজনিত প্রতিক্রিয়ায় নুরীনির্যাতন, অবশেষে নুরীর

ব্যবহারে তার প্রতি আত্মসমর্পণ সবই লেখকের চরিত্রসচেতনতার স্বাক্ষর। এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা বেশি সফল চরিত্র মৌলবী মোতাহার হোসেন। আমাদের সমাজের ইতর প্রকৃতির শিক্ষিত মোল্লাশ্রেণীর সে সার্থক প্রতিনিধি—যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পরের পায়ে পড়তে যেমন কুণ্ঠিত নয়, তেমনি কাজ ফুরিয়ে গেলে তার মস্তকে পদাঘাত করতেও পিছপাও নয়। তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপই যুক্তিগ্রাহ্য। নিজের এক স্ত্রী থাকতেও দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ, নুর মহাম্মদের অনুগ্রহে চাকরী পেয়েও তার বিরুদ্ধে ছাত্রদের উস্কে দিয়ে নিজের পদোন্নতির প্রচেষ্টা, মাদ্রাসার তহবিল তছরুফ, টাকার চাপে পড়ে স্ত্রীকে তালাক দেবার ইচ্ছা, অবশেষে সবদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে আবার নুর মহাম্মদের অনুগ্রহে চাকরীলাভ সবই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে পরশ্রীকাতরা ছাজেদা-চরিত্রটিও সমানভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এসব চরিত্র নির্মাণে নজিবর রহমান প্রচুর দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। কারণ এসব চরিত্রে সেদিনের সদ্যগজিয়ে ওঠা মুসলিম সমাজের যথাযথ চিত্র পরিস্ফুট।

॥ খ ॥

'পরিণয়'কে আলাদা করে আলোচনার কারণ হলো লেখকের একটা বিশেষ মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করা। নচেৎ এই উপন্যাসের প্রায় কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। বা একে পূর্বে আলোচিত উপন্যাসত্রয়ের তুলনায় সার্থকও বলা যায়না; বরং সে তুলনায় নিকৃষ্ট। কারণ নির্জলা শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'আনোয়ারা' 'প্রেমের সমাধি' বা 'গরীবের মেয়ে'তে উপন্যাসের বহু লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়—যা 'পরিণামে' নেই। উপরন্তু পূর্বে আলোচিত উপন্যাস-গুলোতে লেখকের যে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে, তাও এই উপন্যাসে নেই।

উপন্যাসটির প্রধান ত্রুটি হলো তার কাহিনীবিন্যাস। কাঠভাঙ্গা

গ্রামের জমিদার আবুল কাশেম চৌধুরীর পুত্র সুরত জামাল ও আবুল খয়েরের ভেতর পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয় তা-ই এই উপন্যাসের প্রধান কাহিনীধারা। তার সঙ্গে রয়েছে বিনোদপুরের খোদাবক্শ তালুকদার ও নবী বক্শ তালুকদারের উত্তরাধিকারীদের ভেতর সংঘর্ষ এবং তার করুণ পরিণতি, বেলীরচর গ্রামের কাজেমউদ্দীনের ছেলে আলাউদ্দিন এবং এমারত মোল্লার মেয়ে জয়নাবের ভয়াবহ ও শোকাবহ পরিণতি। এর ভেতর নবীবখ্শ তালুকদারের মেয়ের সঙ্গে উপাখ্যানের মূল চরিত্রের একটা সম্বন্ধরেখা টানা হয়েছে বটে, কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষীণ। আলাদা কাহিনী হিসেবে বিচার করলে এই ক্ষীণধারা বর্জন করলেওতার গতি রুদ্ধ হয় না। কারণ এই গতি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু বেলীরচরের আলাউদ্দীন-জয়নাব উপ্যাখানের সঙ্গে উপন্যাসের মূলধারার কোন সম্পর্ক নেই। লেখক নিজেও কোথাও কোনপ্রকার সম্পর্ক দেখাননি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য গ্রামীন দ্বন্দ্বকলহের 'পরিণাম' অঙ্কন করা। তবে উপখ্যানের বর্ণনাভঙ্গি সরস। এই বর্ণনায় গ্রামবাংলার সাধারণ অবস্থা সম্পূর্কে লেখকের অভিজ্ঞতার ছাপ যেমন রয়েছে, তেমনি কাহিনীবিন্যাসে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। গ্রামের দলাদলি এবং তার পরিণতিতে আলাউদ্দীনের স্ত্রীত্যাগ থেকে শুরু করে তাদের আত্মহত্যা পর্যন্ত কোথাও কাহিনীর গতি শ্লথ হয়নি। সে হিসেবে উল্লিখিত দুখানা উপাখ্যানই বড়গল্পের পর্যায়ে পড়ে—প্রথম উপাখ্যান না হোক, দ্বিতীয় উপাখ্যানতো বটেই। দ্বিতীয় উপখ্যানের বৃদ্ধ সরিয়তুল্লার চরিত্র বাস্তবসম্মত। গ্রাম্য পারিবারিক কোন্দল মেটানোর জন্যে উভয় পরিবারের ছেলেমেয়েদের ভেতর বিবাহ বন্ধনের প্রমাণ বাস্তব জীবনে বেশ সুলভ। বাস্তবেও এর উদ্যোক্তা সরিয়তুল্লার মতো জ্ঞানবৃদ্ধারাই।

এসব কারণে 'পরিণাম'কে উপন্যাস না বলে 'সামাজিক নকশা' বলাই অধিকতর সঙ্গত। আলাদাভাবে গ্রন্থিত হলে এগুলোকে

বড়গল্পও বলা যেতো। নজিবর রহমান 'দুনিয়া আর চাই না' (১৯২৩) গ্রন্থ এজাতীয় পাঁচখানা গল্প[৮] সংকলিত করেছেন। গোটা 'পরিণাম' গ্রন্থটিকে তেমনি তিনখানা বড়গল্প হিসেবে প্রকাশ করা যেতো। একশত বাইশ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্রগ্রন্থটির সত্তর পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে উল্লিখিত দুখানা উপাখ্যান।

গ্রন্থখানার নাম 'পরিণাম' সার্থক। কারণ কাহিনীর কেন্দ্রাভিমুখিনতা যাই হোকনা কেন, লেখক সর্বত্রই মানুষের পরিণতির চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে পরিণতি নির্ধারণে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি একদেশদর্শী বলে মনে হয়। প্রধান উপাখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি হিন্দু-চরিত্রের পরিণতি তার প্রমাণ। চৌধুরী সাহেবের ষ্টেটের দেওয়ান "গোপীমোহনের একমাত্র যৌবনোন্মুখী বালবিধবা পরমাসুন্দরী কন্যা কুসুমনলিনী তাহার অনাঘ্রাত প্রেম-পিযুষদানে ছুরজ জামালকে গোপনে পরিতুষ্ট করিতে আরম্ভ" করা স্বাভাবিক হলেও, গোপীমোহন যে "ইহা দেখিয়াও দেখিলনা বা কাহাকে কিছু বলিল না"[৯], তা খুবই অস্বাভাবিক। কারণ পিতৃধর্মকে তো একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তার উপর মাতুল খগেন্দ্রনাথ এবং পিতা গোপীমোহনের শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে কুসুমনলিনীর পরিকল্পনা একেবারেই অচিন্তনীয়। এই পাপের জন্যে তাদের ভাগ্যে যে শাস্তি নির্ধারিত হলো তাও ভয়াবহ। নজিবর রহমান মনুষ্যজীবনের বহু অপচয় ও অবক্ষয় লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু এত নীচস্তরে নেমে তিনি কখনো মানুষকে কল্পনা করেননি। এসব কারণে মনে হয়, পরবর্তী কালে তাঁর ভেতর খানিকটা ভাবান্তর এসে থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি' বা 'গরীবের মেয়ে' লেখার সময় (১৯১৪-১৯২৩) এদেশে যে রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিলো তার সঙ্গে 'পরিণাম' লেখার সময়কার (১৯২৭) রাজনৈতিক অবস্থার পার্থক্য বিরাট। কারণ মহাত্মা গান্ধীর হিন্দু-মুসলিম মিলনপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সম্ভবত এই রাজনৈতিক বিবর্তন তাঁর ভেতর একটা পরিবর্তন সূচনা করেছিলো। মীর মশাররফ হোসেনের জীবনেও এজাতীয় মানসিক বিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা গেছে।

॥ গ ॥

'চাঁদ-তারা বা হাসান-গঙ্গা বাহমনী' নজিবর রহমানের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রকৃতিমূল তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। গঙ্গারাম দেবশর্ম্মা একজন ব্রাহ্মণ— "তিনি মুসলমানকে ঘৃণা করেন না, কিন্তু স্বধর্ম্মে আস্থাবান।"[১০] এই ব্রাহ্মণের গৃহে "খোরাশান দেশীয় জনৈক পাঠানের পুত্র" হাসান প্রতিপালিত হয়। হাসানের ডাকনাম চাঁদ। তার সঙ্গে গঙ্গারামের কন্যা তারার প্রেম ও পরিণয় এবং অবশেষে সম্রাটের অনুগ্রহে জায়গিরলাভেই এই উপন্যাসের উপজীব্য। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাহিনীর পটভূমিকা নির্মাণ করেছেন। চাঁদ ধর্মপরায়ণ, বিনয়ী ও কর্তব্যনিষ্ঠ। ফলে সে সহজেই তার মুনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। চাঁদের বিনয় কখনো কখনো তাদের প্রেমকে পর্যন্ত বিচলিত করেছে। কিন্তু তবু সে অন্নদাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হয়নি। এভাবে লেখক প্রচুর আবর্তন-বিবর্তন-কোলাহলের ভেতর কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন এবং তার সুখকর পরিণতি টেনে এনেছেন। একমাত্র এক পরিচ্ছেদব্যাপী[১১] দিল্লী শহরের বিরক্তিজনক বর্ণনা ছাড়া গোটা উপন্যাসটি বেশ উপভোগ্য। নানাপ্রকার জট জটিলতার ভেতর দিয়ে কাহিনীটি এগিয়ে গেছে, তবু পাঠক কোথাও ক্লান্তিবোধ করেন না। এই উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর উল্লিখিত সামাজিক উপন্যাসের এক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তাহলো, এই উপন্যাসে জট খোলার জন্যে কোথাও লেখক অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তবে কোথাও কোথাও তাঁকে আকস্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই

উপন্যাসেও ধর্মের জয়গান করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই বোধের দ্বারা কাহিনী পরিচালিত নয়, বরং তার দ্বারা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র পরিশোধিত। গঙ্গারামের ভৃত্যপ্রীতি, চাঁদের কৃতজ্ঞতাবোধ, দেলওয়ারের প্রভুভক্তি, প্রজাপতি শর্ম্মাঠাকুরের সত্যবাদিতা যেমন ধর্মবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে, ঠিক তেমনি উজির মালেকজাদের বিশ্বাসঘাতকতা, বা রাজপুত্র রঘুনাথের নীতিহীনতা এই ধর্মবোধের অভাবেরই ফল।

তবে এই উপন্যাসেও চারিত্রিক দ্বন্দ্ব ক্ষীণ তারাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে চাঁদ তার কর্তব্যপরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় দিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়নি। বরং চাঁদ যেভাবে বার বার সহজে তারাকে প্রত্যাখান করেছে, তাতে তার ভেতর প্রেমজনিত দ্বন্দ্ব কখনো সৃষ্টি হয়েছিলো বলেই মনে হয়না। তারাও বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে, কিন্তু কখনো চাঁদের এই প্রত্যাখ্যান উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করলেই সে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতো। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হলো, গঙ্গারাম ঠাকুর কর্তৃক সহজে তারার ধর্মান্তকরণের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান। এই স্বীকৃতি অর্থলোভের ফল হলেও যেমন প্রশংসনীয় নয়, তেমনি ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণের ফল হলেও তা নিন্দনীয়। কারণ এতে লেখকের বহুপ্রশংসিত সম্প্রদায়নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরাজয় সূচিত হয়। চরিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে লেখকের সর্বাধিক দুর্বল দিক হলো, চাঁদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা তারা'কে বার বার আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যাওয়া, এতে তারা'র সম্ভ্রম যেমন থাকেনি, তেমনি তার প্রেমের প্রতিও চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। মনে হয় এসব ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি সর্বদা মানবমনকে আলোড়িত করে সে সম্পর্কে লেখকের কোন ধারণা নেই। লেখক জানেন না, এভাবে বারবার আত্মহত্যার চেষ্টার মাধ্যমে একজনকে পাওয়ার চেয়ে, তাকে ত্যাগ করার আনন্দ ও মহত্ব অনেক বেশি। সে হিসেবে এই

উপন্যাসের কোন চরিত্রই পরিস্ফুট নয়।

লেখক এটিকে একখানা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে উল্লেখ করেছেন।[১২] কিন্তু এই উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক কতটুকু তা নির্ধারণ করা মুসকিল। হাসানের (বা জাফরের) নাম ইতিহাসে আছে। তিনি-যে মোহম্মদ তুঘলকের সময় দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু হাসানের সঙ্গে তারার কথিত প্রেমকাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয়না। গঙ্গু বলে হাসানের একজন প্রভুর কথা নাকি মোহাম্মদ কাসিম ফেরিস্তা তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন। তিনি একজন জ্যোতিষী ছিলেন। কিন্তু অন্যকোন সূত্র থেকে এই ঘটনা সমর্থিত নয়, কিংবা তার কোন পাথুরে প্রমাণও নেই।[১৩] বাহমনী নামের সঙ্গেও এই ব্রাহ্মণের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি প্রাচীন পারস্যবীর ইসফানদিয়ার পুত্র বাহমনের বংশধর হিসেবে তাঁর নামেই এই বংশের নামকরণ করেন[১৪] এবং নিজে 'আলাউদ্দীন ওয়দ্দীন আবুল মোজাফফর বাহমান শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১৫] কিন্তু নজিবর রহমান বর্ণনা করেছেন, তিনি নাকি 'হাসান-গঙ্গা বাহমনি' উপাধি ধারণ করেছিলেন।[১৬] আলাউদ্দিন বাহমান শাহ্ মোহাম্মদ তুঘলকের আর্শীবাদ নিয়ে এই রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন বলে উপন্যাসে যেকথা উল্লেখ করা হয়েছে তাও ইতিহাসসমর্থিত নয়। তিনি সেদিনের তুঘলকবিরোধী কর্মকাণ্ডের একজন নায়ক—যিনি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭]

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের উপন্যাসে তৎকালীন সমাজের যথাযথ ছায়াপাত ঘটেছে। এই ছায়া এত গভীর যে, শিল্পসৌন্দর্যের চাইতে সমাজচেতনাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে মুসলিম

সমাজের তাবৎ গুণাগুণ তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি যে সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন তা প্রধানত ধর্মনির্ভর মুসলিম সমাজ। ফলে গোটা সামাজিক পরিবেশটাই স ধাঁচে গড়ে উঠেছে। এর ফাঁকে ফাঁকেই তিনি সামাজিক সমস্যা পর্যালোচনা করেছেন। এই চিত্র তাঁর উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবে এসেছে। উপন্যাসের কাহিনীধারায় তিনি এমনভাবে সমাজকে চালিয়ে দিয়েছেন যে, তা স্বাভাবিক চিত্র হিসেবেই পাঠককে প্রভাবিত করে, কোনপ্রকার বিরক্তিজনক বর্ণনা হিসেবে নয়। তাঁর ধর্মসংক্রান্ত বক্তব্যই শুধু পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। সপত্নীবিদ্বেষ, কৌলিন্যপ্রথা, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কুসংস্কারের প্রাধান্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাধারণ পেশার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, গ্রামে অবরোধপ্রথা, স্বনির্ভরতা ইত্যাদি নানাপ্রকার সমস্যা নানাভাবে তাঁর উপন্যাসে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া কোথাও তিনি শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে এসব সমস্যা দেখেননি।

সাহিত্যরত্ন সাহেবের উপন্যাসের প্রধান বিষয় হলো মুসলিম সমাজে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁর নায়ক-নায়িকার অকৃত্রিম আকর্ষণ। 'আনোয়ারা'র নুরল এসলাম গ্রামের গরীবদের জন্যে অবৈতনিক মাইনর স্কুল খুলে যে মহত্ব প্রদর্শন করেছে,[১৮] তার সুস্পষ্ট ছাপ 'প্রেমের সমাধি' ও 'গরীবের মেয়ে'তেও দেখা যায়। 'প্রেমের সমাধি'র মতিয়র রহমান সেদিনের লোভনীয় ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী ত্যাগ করে শিক্ষকতা গ্রহণ করে। "প্রতিবেশী মোসলমান পল্লীগুলি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিলে তাহাদের কোন উপকার করিতে পারা যাইবেনা মনে করিয়া উহা ত্যাগ" করাই সে উচিত মনে করেছে।[১৯] তাঁর 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসের নায়ক মনে করে, "মসজিদে যে টাকা ব্যয় হইবে, তদ্দারা মাদ্রাসা ও স্কুলের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া লওয়া" ভালো,—শুধু তাই নয়, তার মত হলো, "যেখানে পানির অভাবে লোকে কষ্ট

ভোগ করে সেখানে পুকুর খনন না করিয়া মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিলে কোন পূণ্য বা লাভ নাই।"[২০] এই জাতীয় চিন্তাভাবনা সেদিনের জন্যে ছিলো অচিন্তনীয়।

নজিবর রহমানের ভাষা সুললিত। তবে এই ভাষা যে বিদ্বৎ-সমাজ দ্বারা পরিমার্জিত হয়েছে সেকথা লেখক 'আনোয়ারা' ও 'পরিণামে' স্বীকার করেছেন। সেজন্যে পরিবেশ নির্মাণের সময় সুসম ভাষাপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপমাগুলো সহজ ও সজীব। যথাঃ "নীহারসিক্ত ফুটন্ত জবার ন্যায় লাল চক্ষু",[২১] অথবা, "হস্তস্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন সহজে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, বালিকা বিবাহের বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া লজ্জায় সেইরূপ জড়-সড় হইয়া গেল।"[২২] অথবা, "তুষার-শৈত্য সঙ্কুচিতা নলিনী যেমন তরুণ-অরুণ-আভা বক্ষে লইয়া হাসিতে হাসিতে ফুটিয়া উঠে, পতির আরোগ্যলক্ষণ দৃষ্টে আনোয়ারাও সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।"[২৩] অথবা, "গঙ্গা শতধারায় পাতালে প্রবেশ করিয়া যেমন সাগর রাজার শাপদগ্ধ ষষ্টিসহস্রপুত্রের পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছিলেন, তেমনি মরিয়মের 'বাসি' শব্দ মতির শ্রবণেন্দ্রিয়ের রন্ধ্রপথে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার কল্পিত ম্রিয়মান অনন্ত আশামূল সিক্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।"[২৪] অথবা, "বজ্রের কড় কড় ধ্বনি শুনিয়া তাহার মস্তকে পড়িবার আশঙ্কায় লোক যেমন আড়ষ্ট ব্যাকুল হইয়া পড়ে, হুরীর মনের অবস্থা সেইরূপ হইল।"[২৫] অথবা "শিবপ্রাপ্তিসাধনায় উমার শরীর যেরূপ কৃশ হইয়াছিল, তদ্রূপ কোন কঠোর তপশ্চর্য্যায় বালিকার দেহ অস্থি-কঙ্কালসার হইয়াছে।"[২৬]

পাদটীকা

১ 'আনোয়ারা', ভক্তিপর্ব; অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

২ প্রাগুক্ত, প্রথম পর্ব; চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

৩ প্রাগুক্ত, ভক্তিপর্ব; দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

৪ 'প্রেমের সমাধি', অধ্যায়, আটত্রিশ।

৫ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, চব্বিশ।

৬ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ত্রিশ।

৭ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, একত্রিশ।

৮ 'যুবকের কাণ্ড', 'ইমানের পরখ', 'সতীর সাধনা', 'নারীর ধৈর্য্য', 'নারীর হৃদয়'।

৯ 'পরিণাম', প্রথম খণ্ড (২) এর (খ)।

১০ 'চাঁদ-তারা বা হাসান-গঙ্গা বাহমনী', প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১১ প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

১২ প্রাগুক্ত, নামপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩ Sachidanonda Bhattacharya, 'A Dictionary of Indian History', (2nd ed. ; Calcutta, 1972) 397.

১৪ বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৭২) ২৪০।

১৫ Iswari Prasad, 'A short History of Muslim Rule in India' (Allahabad, 1939) 117.

১৬ 'হাসান-গঙ্গা বাহমনী', দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

১৭ খাজা নিজামউদ্দীন আহমদ, 'তবাকত-ই-আকবরী' [অনুবাদ] (ঢাকা, ১৯৭৮) ২৬১।

১৮ 'আনোয়ারা', পরিমাণপর্ব, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১৯ 'প্রেমের সমাধি', অধ্যায়, তেইশ।

২০ 'গরীবের মেয়ে', অধ্যায়, তেত্রিশ।

২১ 'আনোয়ারা', প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

২২ প্রাগুক্ত, বিবাহপর্ব, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২৩ প্রাগুক্ত, ভক্তিপর্ব, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

২৪ 'প্রেমের সমাধি', অধ্যায়, ছয়।

২৫ 'গরীবের মেয়ে', অধ্যায়, একুশ।

২৬ 'চাঁদ-তারা বা হাসান-গঙ্গা বাহমনী', ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলামের পরিচিতি মূলত কবিতার জন্যে। সে হিসেবে কাব্যচর্চাকেই তাঁর জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবু গদ্যসাহিত্যেও তাঁর কিছু অবদান রয়েছে। কাব্যের তুলনায় তা অকিঞ্চিতকর হলেও খানিকটা বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

নজরুল মোট তিনখানা উপন্যাস রচনা করেছেন এসব উপন্যাস প্রথমদিকে সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তাঁর উপন্যাসে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো, তাঁর নায়কের বিদ্রোহীভাব। এই বিদ্রোহের পেছনে প্রায়ই দেশপ্রেম কাজ করেছে। 'বাঁধনহারা'র নুরু, 'মৃত্যুক্ষুধা'র আনসার এবং 'কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীর-এর ভেতর স্বভাবের যে ঐক্য তা যেকোন পাঠকের চোখে পড়ে। তাঁদের দেশপ্রেম নিরঙ্কুশ নয়। তারা নারীজাতিকে সমীহ করে এবং নারীর ভেতর যে শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তার উপর আস্থাশীল। যদিও তাদের জীবনে ব্যর্থতা নেমে এসেছে, তথাপি সেই ব্যর্থতাকে এমনভাবে আবেগ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন যে, তা অবশেষে একটা জটিল রহস্যে পর্যবসিত হয়েছে। কখনো কখনো যুক্তির দ্বারা এই রহস্য অতিক্রম অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই রহস্যের মূলে সর্বদাই একটা বিদ্রোহী সত্তা জলসিঞ্চন করেছে। তাঁর উপন্যাসের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, নারীচরিত্রে একটা বৈচিত্র আরোপ। নজরুলের সৃষ্ট নারীর সঙ্গে রক্তমাংসে গঠিত নারীর পার্থক্য তো রয়েছেই, উপরন্তু অন্যান্য সাহিত্যিকের গতানুগতিক সৃষ্টির সঙ্গেও তাদের প্রার্থক্য রয়েছে। এমন তেজস্বিনী মহিলা বাঙলা সাহিত্যে বিরল নয়। তবে মুসলমান সমাজে সেদিন এজাতীয় নারী খুঁজে বের করা

সত্যি দুরূহ ছিলো। 'বাঁধন হারা'র মাহবুবা এবং 'মৃত্যুক্ষুধা'র রুবি-চরিত্রের পরিণতিতে সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ উভয়েই ব্যর্থতাকে জশ করার জন্যে প্রচলিত সমাজ ও বিধিব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলেছেন। 'কুহেলিকা'র তহমিনা তাদের সমগোত্রীয় না হলেও তেজোস্বিতায় সেও কম যায় না। এর ভেতর একমাত্র রুবিই তাবৎ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের ব্যর্থ জীবনকে ক্ষণিকের আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে এবং তার খেসারত স্বরূপ স্বীয় জীবন বিসর্জন দিয়েছে। সম্ভ্রম বিসর্জনের সঙ্গেও তার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, আনসার ও জাহাঙ্গীরের ভেতর মানসিক দূরত্ব খুব কম নয়। নজরুল-উপন্যাসে উত্থিত প্রবল ভাবপ্রবণতা তাঁর নিরঙ্কুশ শিল্পদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই ভাবপ্রবণতার ফলে একদিকে শৈথিল্য নেমে এসেছে, অন্যদিকে চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে উদ্‌ভাসিত জীবনজিজ্ঞাসা ম্লান হয়ে পড়েছে। ফেনিয়ে ফেনিয়ে তিনখানা উপন্যাসে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সবটুকুই এজাতীয় মাত্র একখানা উপন্যাসে ব্যক্ত করা যায়। এজাতীয় ভাবপ্রবণ ফেনা কাব্যের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের জন্যে ত্রুটিপূর্ণ। এর কারণ গদ্যরচনার ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞা ও পরিমিতিজ্ঞান প্রয়োজনীয়, তার অভাব বলে মনে হয়। 'মৃত্যুক্ষুধা' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

'বাঁধনহারা' (১৯২৭) ১৩২৭ সালে মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বাঁধনহারা' বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস।[১] এই উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদার ছন্নছাড়া জীবনের উপর ভিত্তি করে এটি রচিত। রাকিয়া ও আয়শা এই দুই বোনের পরিবারের গণ্ডিতেই উপন্যাস গড়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে চারিদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। তবে উপন্যাসের কাহিনী জমাট নয়। কাহিনীর একটা রেখা রয়েছে বটে

কিন্তু তা কোথাও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি। নুরু-মাহবুবার প্রেম এবং তার ভেতর নেমেআসা ব্যর্থতাই এই উপন্যাসের কাহিনীমূল। কিন্তু তাদের প্রেম যেমন গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়নি, তেমনি ব্যর্থতার কারণগুলোও স্পষ্ট নয়। তাদের এই ব্যর্থতা ঘিরে গোটা উপন্যাসে যে ব্যথা ও দীর্ঘশ্বাস আবর্তিত হয়েছে, শুধু তা-ই পাঠককে দোলায়িত করে। মাহবুবার প্রতি নুরুল হুদার অথবা নুরুল হুদার প্রতি মাহবুবার আকর্ষণটি চাবিদিক থেকে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে তার পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে কিন্তু তাদের সম্পর্কটি অনুমান করা যায়। তাদের বিচ্ছেদের কারণটি তেমন চক্ষুগ্রাহ্য নয়। কারণ উপন্যাসের এই অংশটি চারিদিক থেকে উত্থিত হাহুতাশ এবং আবেগভরা চিত্তচাঞ্চল্যের আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছে। একই কথা লেখকের সার্বিক জীবনজিজ্ঞাসা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এমন আবেগ-পূর্ণ কাব্যিক ভাষায় জীবনের সত্য ব্যক্ত করা দুরূহ। পত্রের মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে। সে হিসেবে চরিত্রগুলো যথাযথ ফুটে ওঠার কথা। কিন্তু তেমনটি ওঠেনি। কারণ ওই একটাই। তবে সাহসিকা বোস তার পত্রে নুরুল হুদা সম্পর্কে যেসব কথা বলেছে তাতে তার চরিত্র খানিকটা স্পষ্টতা লাভ করেছে। যুবকটিকে পৃথিবীর তাবৎ ছন্নছাড়া মানুষের সঙ্গে তুলনা করে সাহসিকা বলছে, "যে বাঁধন নেবে না, তাকে জোর করে বাঁধতে গিয়েছিলে, সে কখনো সম্ভব হয়রে বোন? পাগ্‌লা হাতী আর উদমো ষাড়কে জিঞ্জির বা দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলে হয় তার বাঁধন ছিড়বে, নয় আছাড় খেয়ে খেয়ে ম'রে বন্ধনমুক্ত হবেই হবে। আর যদিই ব্যতিক্রম স্বরূপ বেঁচে যায়, তবে সে বাঁচা নয়, সে হচ্ছে জীয়ন্তে মরা! মুক্ত আকাশের পাখীকে সোনার শিকল, মণি-মাণিক্যের দাঁড়, দুধ-ছোলা দেখিয়ে হয় তো প্রলুব্ধ করা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না; সেও অমনি করে বন্ধনমুক্ত হবেই! যার রক্তে রক্তে বাঁধন হারার ব্যাকুল ছায়া-

নটের নৃত্য চপলতা নাচছে, শিরায়-শিরায় পূর্ণ তেজে নট-নারায়ণ রাগের ছন্দ-মাতন হিন্দোল-দোল দিচ্ছে, তাকে থামাতে যাওয়া মানেই হচ্ছে তার ঐ নৃত্য-চপলতা আর হিন্দোল-দোলে আরো আকুল চঞ্চলতা জাগিয়ে দেওয়া, আরো বিপুল দোল উন্মাদনা তুলিয়ে দেওয়া, কারণ "সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধলো না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতন চ'মকে ওঠে। এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা পড়বার বিজুলি ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে! এরা সদাই কান খাড়া ক'রে আছে, কে থায় কোন গহন-পারের বাঁশি যেন এরা শুনছে আর শুনছে! যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দ-রাগ, এরা তখন শোনে বিদায়-বাঁশীর করুণ গুঞ্জরণ! এরা ঘরে বারে বারে বাঁদন নিয়ে আসছে, আবার বারে বারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে! ঘরের ব্যাকুল বাহু এদের বুকে ধ'রেও রাখতে পারেনা। এরা এমনি করে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর ক'রে নেবে। এরা বিশ্ব-মাতার বড় স্নেহের তুলাল. তার বিকেলের মাঠের বাউল গায়ক চারণ-কবি যে এরা!"[২] এই সাহসিকা বোস তার পত্রে নুরুলজীবনদর্শন সম্পর্কেও তার মতামত ব্যক্ত করেছে, যাতে চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি নির্ণীত হতে পারে। এই চরিত্রের সবদিক উপলব্ধি করে অনেকে মনে করেন, এতে খোদ নজরুল ইসলামের জীবনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।[৩] উপন্যাসটি পর্যালোচনা করে এই অনুমান যথার্থ বলে মনে হয়।

এই উপন্যাসের আয়েশা-চরিত্রটি উজ্জলভাবে অঙ্কিত হয়েছে। আয়েশা তার বড়বোন রকিয়াকে যে পত্র দিয়েছে, তাতে একদিকে রয়েছে তার আশাভঙ্গের বেদনা, অন্যদিকে নারীসুলভ তেজস্বিতা। সে একদিকে তার কন্যা মাহবুবার অবস্থা উপলব্ধি করছে, অপরদিকে নুরুর হঠাৎ প্রত্যাখানকে কেন্দ্র করে তার পরিবারে যে তুর্যোগ নেমে এসেছে তা-ও উপলব্ধি করেছে। একারণেই তার পক্ষে বড়বোন

রকিয়ার স্নেহ আহ্বান এত সহজে প্রত্যাখান করা সম্ভব হয়েছে। এই পত্রে নজরুল ইসলাম যে পরিমিতিবোধের পরিচয় প্রদান করেছেন তা শিল্পসম্মত।

এছাড়া উপন্যাসের আর কোন চরিত্রই তেমন ফুটে ওঠেনি। তবে নুরুল হুদার প্রতি সোফিয়ার আকর্ষণের চিত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে নজরুল ইসলাম সৈনিক জীবনের কিছু বর্ণাঢ্য চিত্র পাঠকদের উপহার প্রদান করেছেন। এছাড়া মুসলিম পরিবারের আচার ব্যবহার ও সভ্যতাভব্যতার চিত্রও এই উপন্যাসে দুর্লভ নয়। তবে গতানুগতিক মুসলিম পারিবারিক জীবনের সঙ্গে এর পার্থক্য মৌলিক।

'কুহেলিকা' (১৯২৭) মোহাম্মদ আফজাল উল হক সম্পাদিত 'নওরোজ' পত্রিকার (১৩৩৪ সালের শ্রাবণ) মাধ্যমে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পরিচ্ছেদ (পঞ্চম) গ্রন্থিত হওয়ার সময় পরিত্যক্ত হয়।[৪] 'কুহেলিকা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

এই উপন্যাসের দু'টা সুস্পষ্ট দিক হলো প্রমত্তের নেতৃত্বে জাহাঙ্গীর কর্তৃক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং জাহাঙ্গীর-তহমিনার প্রেমের উপাখ্যান তথা তার পারিবারিক জীবন। যদিও উপন্যাসে এই দুটে পরস্পরবিরোধী জীবনধারার সঙ্গে একটা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা রয়েছে, তবু বাস্তবজীবনে সেদিন তা কতদূর সম্ভব ছিলো তা বলা মুসকিল। এতে মনে হয় নজরুল ইসলাম এই পরস্পরবিরোধী জীবনধারার সমন্বয়ে বিশ্বাস করতেন। এজাতীয় উপন্যাসে সমন্বয়প্রচেষ্টা বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ নয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'তেও (১৯২৬) এর পূর্বাভাস রয়েছে। অপূর্ব ও ভারতীর মাধ্যমে তিনি এই সমন্বয় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

ফলে গোটা চিন্তাধারাটি সব্যসাচীর বিপ্লব, ভারতীয় বিপ্লববহির্ভূত পথে ভারতের স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন, এবং অপূর্বর সংস্কারবাদ—এই তিনটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছে। 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র কবি শশির মাধ্যমে পার্থিব আবেগ ও অনুভূতি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসে এর বিকৃত দিকটাই শুধু তুলে ধরেছেন। সে হিসেবে 'কুহেলিকা'তে খানিকটা অভিনবত্ব বিদ্যমান।

"হিন্দু বিপ্লববাদীদের সঙ্গে মুসলমান যুবকদের দেশপ্রেমের বর্ণনা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়।"[৫] বৈপ্লবিক সফলতা বা ব্যর্থতা যেদিক দিয়ে বিচার করা হোকনা কেন, লেখকের নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ প্রশংসার যোগ্য। কারণ বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন নজরুল সচেতন, তেমনি সেদিনকার বিপ্লবী-দের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। এই সচেতনতা থেকেই তিনি বজ্রপাণি ও প্রমত্তের মতো ভিন্নধর্মী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে প্রমত্ত অধিনায়ক বজ্রপাণিকে ভগবানের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও "বাঙলার মুসলমান ছেলে বিপ্লব-বাদীদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না" একথা মানতে যথেষ্ট ব্যথা পান।[৬] শুধু তাই নয় মাতৃসমিতি নামক প্রতিষ্ঠানের অধিনায়কেরা যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে সম্পর্কেও প্রমত্ত সচেতন।[৭] তাইতো প্রমত্ত বলতে পারছেন, "আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম। আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল-বায়ু-মাটি-পর্বত-অরণ্যকেই ভালোবাসিনি। আমার ভারতবর্ষ —ভারতের এই মূক-দরিদ্র-নিরন্ন-পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়,—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ। কত অশ্রুসাগরে চড়া পড়ে পড়ে

উঠল আমার বেদনার ভারতবর্ষ। ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের মহাভারত।'[১৮] এই উক্তিতে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক ও সর্বভারতীয় চরিত্রও ধরা পড়েছে।

বিপ্লব সম্পর্কে নজরুল যে ধারণা পোষণ করতেন, তাই এই উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের কর্মতৎপরতা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার চিত্র যেমন উপন্যাসটিতে ধরা পড়েছে, তেমনি তাদের ব্যর্থতাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। এই চিত্রে কোন বিকৃতি নেই। চরিত্রের অন্তস্তলে যেমন এই ব্যর্থতার বীজ আরোপিত হয়নি, তেমনি লেখকের বর্ণনায় কোথাও এই ব্যর্থতার আভাস নেই। ঘটনাটিই ধীরে ধীরে ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে গেছে। এই ক্রমপরিণতি যেমন ঐতিহাসিক, তেমনি শিল্পসম্মতও। পূর্বসিদ্ধান্ত ছাড়া এই পরিণতি নির্ধারিত হয়েছে এটাই নজরুল ইসলামের সাফল্য। উপরন্তু এই উপন্যাসে প্রমত্ত ও চম্পার ছদ্মবেশ ধারণ, জাহাঙ্গীরদের সেলুনে করে অস্ত্রশস্ত্র পাচার, বিভিন্নপ্রকার আদেশ-নির্দেশের আদান-প্রদান ইত্যাদি দেখে মনে হয় এ সম্পর্কে নজরুলের অভিজ্ঞতা ছিলো। এই উপন্যাসের মাধ্যমে সেদিনের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বাধা-বিপত্তির চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরেজের মনোভাবও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলো না বলে ইংরেজরা মুসলমানদের বিশ্বাস করতো, এটা ঐতিহাসিক সত্য। উল্লেখযোগ্য যে, ধরা পড়ার সময় জাহাঙ্গীরের আসল নাম প্রকাশ পায়নি, সে স্বদেশকুমার হিসেবেই ধরা পড়েছে। নজরুলের এই চেতনাও প্রশংসনীয়।

এই উপন্যাসের জটিলতম দিক হলো জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন। এই জীবনের একদিক রয়েছে তার সামাজিক সত্তা,—যা নানাপ্রকার সম্পর্কের অক্টোপাশে জড়ানো, অন্যদিকে তার পারি-

বারিক ঐতিহ্য—যেক্ষেত্রে তার পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্কই বহুলাংশে ক্রিয়াশীল। জাহাঙ্গীর সামাজিক জীবনে আত্মভোলা ও পরোপকারী বলে পরিচিত—যা প্রচণ্ড আবেগ দ্বারা পরিচালিত। এ জাতীয় চরিত্রকে আত্মত্যাগী হিসেবে উপস্থাপিত করায় সুবিধে যেমন রয়েছে, তেমনি অসুবিধেও কম নয়। নজরুল বিপ্লবী জাহাঙ্গীরের নানাপ্রকার অস্বাভাবিক কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। এর ভেতর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো, তহমিনার সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক এবং চম্পার প্রতি খানিকের আকর্ষণ—যা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার প্রাক্কালে তাদের সংলাপে ধরা পড়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি নজরুল অত্যন্ত যত্নসহকারে অঙ্কন করেছেন।

জাহাঙ্গীর হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন তার মা একজন বাঈজী এবং তার পিতার সঙ্গে তার মার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। সে হিসেবে সে কোনপ্রকার সামাজিক মর্যাদার দাবিদার নয়। বাবার মৃত্যুর পর তার আত্মীয়দের মামলায় তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরের ভেতর তারপর থেকে যে ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় তা যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এই ধারণা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। প্রমত্তের সংস্পর্শে এসে অচিরেই তা তিরোহিত হয়। অতঃপর সে তার মাকেও শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। কিন্তু তার ভেতর যে প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছিলো তার চিহ্ন শেষপর্যন্তও অবশিষ্ট ছিলো। একারণে তহমিনাকে সর্বনাশ করার পর পরই তার মনে হয়েছে এই কাজে তাকে প্ররোচিত করেছে তার বংশের বিষাক্ত রক্ত— যা তার শরীরে প্রত্যক্ষভাবে বহমান।[৯] অবশ্য এজাতীয় ধারণা প্রগতিবিরোধী। ক্ষণিকের দুর্বলতায় জাহাঙ্গীর তহমিনার যে সর্বনাশ করেছে তার কোন বাস্তব ভিত্তিও নেই। কারণ যে সময়ে তারা অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়েছে সে সময়টি এই কাজের অনুকূল ছিলোনা। জাহাঙ্গীরের প্রথমবারের সাক্ষাতের সময়

এই দৃশ্যটি দেখানোর সুযোগ ছিলো অনেক বেশি। তবে সেই অবস্থায় তহমিনার চরিত্র অঙ্কন করা দুরূহ হয়ে পড়তো। এই কারণে ঘটনাটির সম্ভাব্যতা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে মূল কাহিনীটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে তহমিনার সর্বনাশ করার পর জাহাঙ্গীরের প্রতিক্রিয়াটি সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

'কুহেলিকায়' জাহাঙ্গীর ছাড়া অন্যকোন পুরুষ-চরিত্র তেমন ফুটে উঠেনি। দেওয়ান সাহেব বা প্রমত্তের ভূমিকা তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, তবে চরিত্র হিসেবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সে তুলনায় স্বল্পপরিসরে হলেও এই উপন্যাসের নারী-চরিত্রগুলো বেশ ফুটে উঠেছে। নারীর ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো তহমিনা ও চম্পা। তহমিনার ভেতর লেখক নারীসুলভ লজ্জাশীলতা, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের চিত্র যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তেজস্বিতা তার ভেতর কম নয়। অন্ততঃ তার পাগলী মা কর্তৃক তাকে জাহাঙ্গীরের হাতে সমর্পণের পর তার যে অনুভূতি তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই অনুভূতির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোকনা কেন, জাহাঙ্গীরের কাছে দেহদানের পর সে এই মানসিকতা আর অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। দেহদানের পর তহমিনার যে চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন, তা সত্যি দুর্লভ। এক্ষেত্রে নজরুলের উপলব্ধি নির্ভুল যে, যে তুনী (তহমিনা) একদিন নিজেকে তার বাপ-দাদার বংশ গৌরবের অংশ। মনে করতো আজ "তাহার সকল দর্পের অবসান হইয়াছে। আজ সে পথের ভিখারিণী। দুই হাত পাতিয়া এখন তাহাকে ভিক্ষার তণ্ডুল-কণা গ্রহণ করিতে হইবে। কালও সে মনে করিয়াছিল, যত বড় দরিদ্র হোক তাহারা, তবু সে দেখাইয়া দিবে—আত্মসম্মান শুধু ধনীরই একচেটিয়া নয়। দারিদ্র্যের কঠিন দর্প দিয়াই সে ধনীর ঐশ্বর্যকে অতি বড় আঘাত করিবে। আজ কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, আঘাত তো সে আর করিতেই পারিবে না, উল্টো যত আঘাতই আসুক—তাহাকে পড়িয়া পড়িয়া

তাহ সহিয়া যাইতে হইবে।''[১০] এই চরিত্রের ক্রমবিকাশ নজরুলের বিশেষ অবদান। চম্পা-চরিত্রেও লেখক বিশেষ সফলতার পরিচয় প্রদান করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়ি পরিবর্তনের পরই শুধু সে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। সে জাহাঙ্গীরের প্রতি আকৃষ্ট না হোক, যখন সে বলে, "তোমাদের অগ্নিপন্থীদের মনে যে ভীষণ পশু রয়েছে—তারি প্রেরণায় তোমরা হত্যা করতেও ভয় পায় না। সে শুধু হত্যার জন্যেই নয়—অন্য কারণেও তা জেগে উঠতে পারে। তোমাদের মনের পশুকে একেবারে মেরে ফেললে তোমাদের দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব দিয়ে আর যাই হোক—আমাদের যে মন্ত্র, যে সাধনা তার কিছুই হবে না''[১১] —তখন বিপ্লবীদের অন্তরের প্রবঞ্চত্ব যে সে উপলব্ধি করেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। যে কারণে জাহাঙ্গীরের আকর্ষণকে সে গায়ের জোরে ঠেলে না দিয়ে তার আত্মিক শক্তির সাহায্যে তার প্রতিরোধ করেছে। এই প্রতিরোধকে যুগপৎ যুক্তি ও আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করা যায়—তা-ই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য। এত অল্প পরিসরে এমন একটি চরিত্র নির্মাণের জন্যে নজরুল ইসলাম কৃতিত্বের দাবিদার।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' (১৯৩০) ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সর্বপ্রথম মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাতে' আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসটি কৃষ্ণনগর শহরে রচিত। এই উপন্যাসের পটভূমিকা সম্পর্কে মুজফফর আহমদ লিখেছেন, "সম্মেলন [জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন] ইত্যাদির ঝামেলা মিটে যাওয়ার পরে নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে একটি ভালো বাড়ী পেয়ে সেই বাড়ীতে উঠে গেল। বাড়ীটি ছিল ষ্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট বাড়ী হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এত বেশী খোলা ময়দান ছিল যে তাকে বাগান বাড়ীও বলা যায়। বাড়ীর মালিক ছিলেন খ্রীষ্টান মহিলা। নিকটেই 'দত্ত-নিবাস'—বিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ত-গুপ্তের বাড়ী। এই

জায়গাটা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক এলাকা। শ্রমজীবী খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের বাস এই এলাকায়। নজরুলের উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা এই পরিবেশেই লেখা হয়েছিল।"[১২] 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসে কৃষ্ণনগর শহরের চাঁদ সড়কের সেই হিন্দু মুসলিম-খ্রীষ্টান অধ্যুসিত এলাকাটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

দুটি কাহিনীর ভেতর সংযোগ সাধন করে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। একদিকে রয়েছে সেই চাঁদ সড়ক এলাকার একটি দরিদ্র মুসলমান পরিবারের কাহিনী—যার কেন্দ্রীয় চরিত্র সেই পরিবারের বিধবা মেজ-বৌ। অন্যদিকে রয়েছে "খেলাফতী ভলান্টিয়ার" আনসারের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন। তবে গোটা উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে মেজ-বৌয়ের দুঃখভরা জীবনকাহিনী। এই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে লেখক শুধু একটা পরিবারের চিত্রই অঙ্কন করেননি, বরং শহরের এই অঞ্চলটির অধিবাসীদের সুখদুঃখ হাসি-কান্নার চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে এত সংগ্রাম করেও মানুষ কিভাবে দুঃখে ও বেদনায় পরস্পরের সহায় হতে পারে তা এই উপন্যাসে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। লেখক উপলব্ধি করেছেন, মানুষের বড় শত্রু হলো দারিদ্র। এই দারিদ্রই মানুষকে ধীরে ধীরে কাণ্ডজ্ঞানহীন জড় পদার্থে রূপান্তরিত করে। ধর্ম, সমাজ, সংস্কার সবকিছুই এর কাছে অর্থহীন। এই দারিদ্রকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করে সেদিন খ্রীষ্টান মিশনারীরা কিভাবে মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে তাও যেমন এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, মুসলমান মোল্লা-মৌলবীরা কিভাবে এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মানুষকে শোষণ করছে তাও লেখকের দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়েছে। দরিদ্র মুসলমান বিধবা মেজ-বৌএর ভেতর যে মানবতাবোধ সর্বদা উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতো চকচক করতো, তার আলো যত প্রখর ও তীব্র হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাকেও এমনি একটি আত্মঘাতী পথে পা বাড়াতে হয়েছিলো। লেখক ক্ষুধাকে ভাগ করে ব্যবহারিক

জীবনে তার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। মেজ-বৌ পেটের ক্ষুধায় খ্রীষ্টান হয়েছে। কিন্তু প্যাঁকালে মনের ক্ষুধায় সে পথে গেছে। কারণ সে কুর্সী নাম্নী জনৈকা খ্রীষ্টান যুবতীকে ভালোবাসত। অবশেষে উভয়েই স্বধর্মে ফিরে এসেছে। মেজ-বৌর আর্থিক সমস্যা মিটেছে; প্যাঁকালেও একজন মুসলমান খান বাহাদুরের কৃপায় একখানা চাকরী পেয়েছে। কর্সীও খানিকটা কান্নাকাটি করে তার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে।

মেজ-বৌ খ্রীষ্টান হয়ে যাবার পর যখন গোটা অঞ্চলব্যাপী একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয় তখন তার সঙ্গে আনসারের পরিচয়। আনসার প্রাণবান যুবক। অতএব তার আত্মীয়া লতিফার কাছ থেকে সব শুনে এবং নিজে সমস্ত অবস্থা দেখে উপলব্ধি করেছে "ক্ষুধিত মানুষ —অভাব পীড়িত মানুষের মত সকল দিক দিয়ে অধঃপতিত আর কেউ নেই। ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলই পরস্পরের সর্বনাশ করে। দু-মুঠো অন্নের অভাবে ওদের আত্মা আজ সকল রকমে মলিন।"[১৩]

আনসারের জীবনকাহিনীর গতি ভিন্নমুখী। সে জনসাধারণের সুখদুঃখে মর্মাহত হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে, জেল খেটেছে, অবশেষে যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়েছে। সে রুবি নামে একজন আমলার কন্যাকে ভালোবাসতো। কিন্তু তাদের প্রেম ব্যর্থ হয়েছে। মা-বাবার অনুরোধে বিয়ে করেছিলো; কিন্তু তার জীবনে অকাল-বৈধব্য নেমে আসায় সে সমাজসেবাকেই তার জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। অবশ্য শেষ জীবনে রুবি-আনসার মিলিত হয়েছিলো। আনসারের মৃত্যুক্ষুধা মেটানোর জন্যে রুবি তাকে দেহদান করেছে এবং আনসারের দুরারোগ্য রোগের বীজাণু বহন করে আত্মবিসর্জন দিয়েছে। এই উপন্যাসের পরিণতি যাই হোক না কেন, তারা শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন থেকে বহু দূরে সরে এসেছিলো। অতএব প্রবন্ধটিতে সমাজচেতনা

ও রাজনৈতিক চেতনার উজ্জ্বল বর্ণ সমারোহ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এটি একটি নিছক রোমান্টিক প্রেমকাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।"[১৪]

চরিত্রচিত্রণে নজরুল ইসলাম কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করেছেন। যদিও আনসারের মৃত্যুকালীন ক্ষুধার চিত্রই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে, তথাপি এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র মেজ-বৌ। কারণ মেজ-বৌয়ের রূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম বলেছেন, "মেজ-বৌ সুন্দরী! কিন্তু সৌন্দর্যটুকুই ওর সব নয়। এক একজন মানুষের চোখে-মুখে এক একটা জিনিস থাকে, যার জন্য তাকে দেখামাত্রই মনটা খুশী হয়ে ওঠে, 'তুমি' বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। স্ত্রী, লাবণ্য, সুষমা—এর কোনো একটা নাম দিয়ে ওর মানে করা যায় না। অমনি মায়ামাখানো চোখ মুখ মেজ-বৌর!"[১৫] তার এই রূপ সবাইকে আকর্ষণ করেছে। মিশনারী মহিলা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী আনসার বা তার ভগ্নিপতি ঘিয়াসুদ্দীন এবং তার শ্বাশুড়ী কেউ এই মায়াবিনীর প্রভাব এড়াতে পারেনি। কিন্তু যেভাবেই হোক সে সবাইকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার সমগ্র সত্তা যে কঠিন ইস্পাতে গড়া তার প্রমাণ পাওয়া গেছে মেজ-বৌয়ের মৃত্যুকালীন সময়ে তার অভিব্যক্তিতে। "ভোরের দিকে মেজ-বৌ ঢু'লে প'ড়তে লাগল মরণের কোলে। মেজ-বৌ কাউকে জাগালে না। সেজোর কানে মুখ রেখে বলল, "সেজো! বোনটি আমার। তুই একলাই যা চুপটি ক'রে। তোর যাবার সময় আর মিথ্যে কান্নার দুঃখ নিয়ে যাসনে।"[১৬] সেই মেজ বৌই শেষ পর্যন্ত নিজের সন্তানের ক্ষুধা মেটানোর জন্যে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলো, এটা ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু অবশেষে সে তার প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পেয়েছে। ক্ষুধা ও হতাশার যন্ত্রণায় তার এক সন্তান তাকে পরিত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু সে অবশেষে লাভ করেছে "বিশ্বমাতার পরিপূর্ণ দীপ্তি।"[১৭] নজরুল ইসলাম যেন এই মহিলার ভেতর তার মানস-প্রতিমা আবিষ্কার

করতে সক্ষম হয়েছেন।

রুবি-চরিত্রেও লেখক বেশ সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। আনসারের মতো তার প্রেম ব্যর্থ হয়ে যাবার পর তার মাতাপিতা তাকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু সে তাকে মেনে নিতে পারেনি। যে কারণে স্বামীর মৃত্যু রুবির কাছে "কোন দিনই আত্মীয়-বিয়োগের মত পীড়াদায়ক মনে হয়নি"[১৮] বটে, কিন্তু সে ঘটা করে বৈধব্যব্রত পালন করেছে। এই ব্রতের মাধ্যমে সে মূলতঃ তার মাতাপিতাকেই শাস্তিপ্রদান করেছে। এজাতীয় নেতিবাচক মনোভাব আমরা 'বাঁধন-হারা'র মাহবুবার ভেতরও লক্ষ্য করেছিলাম। প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং অবশেষে নিজেদের মতের বিরুদ্ধে অন্যত্র বিয়ে—উভয়ক্ষেত্রেই সাদৃশ্যপূর্ণ। এত সংযমের ভেতর থেকেও সে আনসারের রোগের খবর পেয়ে নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। মেজ-বৌর এক খোঁচায় তার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী নারীমন রেগে উঠলো। সে গিয়ে দাঁড়ালো রোগজীর্ণ আনসারের পাশে। আনসারের সঙ্গে তার শেষ মিলনের চিত্র রুবি তার বন্ধু লতিফাকে লিখেছে এভাবে :

"আচ্ছা বুঁচি, তুই ঘুমন্ত ক্ষুধাতুর অজগরের জাগরণ দেখেছিস্? শিউরে উঠিসনে। সব কথা ভাল ক'রে শোন্।

দুদিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে। ওর বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি বন-হরিণীর?

সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল। আমি কাঁদতে লাগলাম, আমার জন্য নয়—ওর জন্য। এ-সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শুধু আমার মৃত্যু নয়—এযে ওরও মৃত্যু। ও যে মৃত্যু-জরজর, আমাকে গ্রাস ক'রে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কি আজ ওর আছে? আমি জানতাম এ-রোগের বড় শত্রু ঐ প্রবৃত্তি। নইলে, যে আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর, তাকে এই মৃত্যু-ক্ষুধায় পেয়ে ব'সল কেন?

সে যখন বললো, "রুবি, চিরদিনই বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ মৃত্যুর ছলে তুমি অমৃত পরিবেশন কর। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই।" আমি আমার উপবাসী ভিখারী বন্ধুকে ফেরাতে পারলাম না।··· আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত-মুখে আত্মসমর্পণ করলাম।'[১৯]

সেই গল্পের প্রতিটি ছত্রে ফুটে ওঠা ভালবাসা, যন্ত্রণা, ও হতাশার চিত্র লেখক অকৃত্রিম আবেগ দিয়ে অঙ্ক করেছেন। এই চিত্র যেমন করুণ তেমনি ভয়াবহ। কারণ এর ভেতর দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম নর-নারীর শাশ্বত সম্পর্কের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গাজলের মার চরিত্রেও বাস্তববোধের ছাপ রয়েছে। মেজ-বৌকে ঘরে রাখার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাপুরণের জন্য মেজ-বৌকে প্যাঁকালের হাতে সমর্পণের আকাঙ্খা, অবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে পৃথিবীত্যাগ সবই লেখক সচেতনভাবে অঙ্কন করেছেন।

আনসারের রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে নজরুলের মতামতের মিল রয়েছে। আনসারের মতো নজরুলও "প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষতা করেন। পরে এই আন্দোলনের বিফলতা দেখে সন্ত্রাসবাদকেই বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরেন।"[২০] নজরুলের এই বিশ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছে "সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয়না"[২১] —জাতীয় আনসারের উক্তিতে। প্রচণ্ড উত্তাপ দিয়ে লেখক এই চরিত্র নির্মাণ করেছেন। অবশেষে সে রাজনীতিবিমুখ হয়ে উঠলেও তার আকাঙ্খার প্রচণ্ডতায় কখনো ঘাটতি আসেনি। রুবির কাছে আত্মসমর্পণ করে পৃথিবীত্যাগই তার প্রমাণ। তবু 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র নারীচরিত্রের তুলনায় আনসারকে দুর্বল বলেই মনে হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা কাব্যময়। সমগ্র উপন্যাসে অসংখ্য উপমা ও চিত্রকল্প ছড়িয়ে রয়েছে। সে হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর এই আবেগভারাক্রান্ত বর্ণনা উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। "বাঁধনহারাকে' উপন্যাস হিসেবে বিচার-

বিশ্লেষণ করা খুবই দুরূহ। কারণ যে অখণ্ড ঘটনাস্রোত উপন্যাসের প্রাণ তাই এতে নেই। সে হিসেবে 'কুহেলিকা' বা 'মৃত্যু-ক্ষুধাকে সার্থক বলা যায়। তবে সবদিক পর্যালোচনা করে তাঁর 'মৃত্যু ক্ষুধা'কেই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতে হয়।

নজরুল ইসলামের উপন্যাসের সামাজিক মূল্য তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ। তাঁর উপন্যাসে নানাপ্রকার সমস্যা চিত্রিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমাজ কোথাও পূর্ণাবয়ব লাভ করেনি। তবু নারীর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য চিত্রণের ক্ষেত্রে এবং নির্যাতিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী যথার্থই ক্ষিপ্র।

পাদটীকা

১ আবদুল কাদির, "গ্রন্থ-পরিচয়", 'নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৬৬) ৭৪০।

২ 'বাঁধন-হারা', রেবার প্রতি সাহসিকার পত্র।

৩ মুহম্মদ আবদুল হাই, "উপন্যাস রচনায় নজরুল", 'নজরুল পরিচিতি (ঢাকা, ১৯৫৯) ৯। সুশীল কুমার গুপ্ত, 'নজরুল-চরিত-মানস (কলকাতা, ১৩৬৭) ২৩৮।

৪ আবদুল কাদির "গ্রন্থ-পরিচয়", প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা, ১৯৭৭) ৭২৫।

৫ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, ২৪৬।

৬ 'কুহেলিকা', অধ্যায়, তিন।

৭ প্রাগুক্ত।

৮ প্রাগুক্ত।

৯ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ষোল ঃ "আমার মনে যদি পাঁক না থাকত, তাহলে আমি কি অত বড় পাপ করতে পারতাম ? আমার প্রতি রক্ত-কণিকায় যে ভোগী পিতা বেঁচে রয়েছে—আমি ভুললেও সে আমায় যে কেবলি নরকের দিকে টানবে।"

১০ প্রাগুক্ত অধ্যায়, চৌদ্দ।

১১ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ষোল।

১২ মুজফফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' (বাংলাদেশ-স ; ঢাকা, ১৯৭৩) ৩০২।

১৩ 'মৃত্যু-ক্ষুধা', অধ্যায়, উনিশ।

১৪ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, ২৪৪।
১৫ 'মৃত্যু-ক্ষুধা, অধ্যায়, উনিশ।
১৬ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, বারো।
১৭ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, সাতাশ।
১৮ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, তেইশ।
১৯ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, আটাশ।
২০ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, ২৪৭।
২১ 'মৃত্যু-ক্ষুধা', অধ্যায়, সতেরো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্যান্য লেখকদের উপন্যাস

॥ ক ॥ ঐতিহাসিক উপন্যাস

॥ ১ ॥

যদিও মুসলিমরচিত বাঙালা উপন্যাসের সুচনা হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস[১] দিয়ে, তথাপি শেখ হবিবর রহমানের (১৮৯১-১৯৬১) 'আলমগীর' (১৯১৯) প্রথম বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাস-খানি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত 'আল-এসলাম' পত্রিকার বৈশাখ, ১৩২৫ সংখ্যায়। "মহাপ্রতাপ মোঘলকুলতিলক রাজর্ষি সম্রাট হাফেজ গাজী মহিউদ্দীন মোহাম্মদ আওরঙ্গজীব মহোদয়কে সিংহাসনারোহণকালে যে সমস্ত পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল"[২] তাই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। "ইহা ঠিক উপন্যাস না হইলেও ইহার ঘটনাবলী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।"[৩] 'আলমগীর' প্রসঙ্গে লেখকের এই উক্তি যথার্থ। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অংশ অবলম্বন করে উপন্যাসটি রচনা করেছেন, নানাকারণে সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঔরঙ্গজীব ও দ্বারা শিকোর চরিত্রই এই বিতর্কের মূল বিষয়। ঘটনাচক্রে সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভ করে ঔরঙ্গজীব মোঘল সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও পিতা-ভ্রাতার প্রতি তাঁর ব্যবহার আজো ইতিহাসবিদদের জন্যে বিস্ময়ের ব্যাপার। যিনি একজন ঋষি সম্রাট হিসেবে পরিচিত, যাঁকে আজো অনেকে 'জিন্দাপীর' বলে শ্রদ্ধা করে থাকেন, তাঁর এই অসাধু আচরণ কি শুধু ধর্মের খাতিরে? এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে, কখনো লেখকের স্বগতোক্তিতে, কখনো বা চরিত্রের সংলাপে লেখক এই প্রশ্নেরই জবাব দিতে চেয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা যথাযথ ফুটে উঠেছে। তিনি একদিকে ঔরঙ্গজীবের

এই মনোভাবকে স্পষ্ট রূপ প্রদান করেছেন, অপরদিকে মুরাদবকস ও দারার আচরণকে পাঠকের সামনে সন্দেহজনকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে এই গ্রন্থ পাঠ করে যে কোন পাঠক একটা একদেশ-দর্শী মনোভাব পোষণ করবেন। গোটা কাহিনী বিশ্লেষণ করলে আপাতদৃষ্টিতে কোনপ্রকার ইতিহাস বিকৃতির লক্ষণ চোখে পড়েনা। কিন্তু লেখক অন্যভাবে এই বিকৃতি পাচার করেছেন। সাহস ও স্পষ্টবাদিতা সম্পর্কে ইতিহাসে অবিসংবাদিত স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও[৪] মুরাদবকসকে ভাঁড়ামীপ্রিয় বলে চিহ্নিত করা, দারাকে অধর্মাচারী হিবেবে অঙ্কিত করা সেই বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। মুরাদকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে[৫] তাও কোন অর্থেই সততা ও সাধুতার পরিচায়ক নয়। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিলো গুজরাটের আলি নকি খানের হত্যার অপরাধে—সম্রাট নিজেই নিহত দেওয়ানের পুত্রকে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই মামলা দায়ের করিয়েছিলেন।[৬] অথচ তার পূর্বে তার কাছ থেকে যেটুকু নেওয়ার সেটুকু ঠিকই নেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাসে সেই হত্যার বিবরণ নেই। সম্ভবতঃ লেখক ইতিহাসের প্রতি একেবারে উপেক্ষা প্রদর্শন করতে চাননি। মুরাদবকস বিলাসী ও মদ্যপ ছিলেন, একথা ঠিক।[৭] কিন্তু তার চরিত্রের এই রূপায়ণ অবান্তর, অতএব অসঙ্গত।

এই গ্রন্থে শাহজাহানের সঙ্গে ঔরঙ্গজীবের সম্পর্ক যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাও সর্বোতভাবে সমর্থন করা যায়না। তাঁর শেষকালের অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁর জন্যে অতি সাধারণ জুতা সরবরাহ করা,[৮] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে দেখতে না যাওয়া[৯] ইত্যাদিকে কোনভাবেই যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়না। সম্ভবতঃ এই কারণে মোঘল ইতিহাসের যথার্থ ট্যাজেডির নায়ক শাহজাহানের তৎকালীন আচরণের কোন পরিচয় এই গ্রন্থে নেই। শাহজাহান কর্তৃক দারাকে বার বার যুদ্ধে যেতে নিষেধ করার কথা মনে রেখেই কথাগুলো বলা হলো। কিন্তু শাহজাহানের এই আচরণের সঙ্গে তাঁর তীব্র ঔরঙ্গজীব-

বিদ্বেষের কোন মিল নেই—ইতিহাস যাই বলুক।

উপন্যাসটির সর্বাধিক বিরক্তিজনক দিক হলো, ঔরঙ্গজীবকে একজন ধার্মিক সম্রাট হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যে অহেতুক বাগ্-বিস্তার। এজাতীয় প্রয়াসের মনস্তাত্ত্বিক ক্রটিও লক্ষ্যণীয়। গোটা গ্রন্থ পড়লে ঔরঙ্গজীবকে অযথা আত্মপ্রচারে উৎসাহী বাচাল ব্যক্তির মতো মনে হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এই চরিত্রটি যথার্থই বলতে হবে। দারাকে ক্ষমা করার জন্যে জাহানারা যে আবেদন জানিয়েছেন, তার প্রত্যুত্তরে ঔরঙ্গজীবের উক্তি স্মরণ করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি হবে। সে তুলনায় দারাচরিত্রটি অধিকতর সার্থক। যদিও লেখক বার বার দারার উদার ও মুক্তবুদ্ধিপ্রসুত ধ্যানধারণাকে পাঠকের সামনে ধর্মবিরোধী বলে উপস্থাপিত করেছেন, তবু এই চরিত্রটিই একমাত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দারার পরিণতি অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক প্রচুর সহানুভূতি ঢেলে দিয়েছেন —যা পাঠকের করুণা উদ্রেক করে। যে নিভৃত কক্ষে পুত্রের গাঢ় আলি-ঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয় সে দৃশ্য দেখে লেখকের সঙ্গে পাঠকও নিদারুণ মর্মবেদনায় মুষড়ে পড়েন। এর কারণ লেখক যে দৃষ্টি নিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করেছেন, তা সম্পূর্ণ মানবিক—যাকে কোন প্রকার একদেশদর্শী মনোভাব স্পর্শ করতে পারেনি। লেখক গোটা উপন্যাসটিকেই এই ঔদার্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন।

যেভাবেই লেখক এই উপন্যাসটির পরিকল্পনা করুন না কেন, মোঘল রাজদরবারের অন্তর্বিরোধ, হতাশা, কলুষতা, ভেতরে ও বাইরে তীব্র ক্ষমতার লড়াই এমন ভাবে পাঠকের সামনে নগ্ন হয়ে উঠেছে যে, এর ক্ষয়িষ্ণু রূপটি কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। এই পর্যবেক্ষণ ও রূপায়ণ একজন শিল্পীর যথার্থ পরিচয় বহন করে। যদি এর সঙ্গে খানিকটা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি যুক্ত হতো তাহলে এটি একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে রূপলাভ করতো। ইতিহাসকে শুধু স্থূল ঘটনার

আলোকে দেখলে চলে না, তার জন্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। লেখকের ভেতর তারই অভাব ছিলো সর্বাপেক্ষা বেশি। নচেৎ উপন্যাসের পক্ষে দারা বা ঔরঙ্গজীব না হোক, শাহজাহান একটি সম্ভাবনাময় চরিত্র। অথচ লেখক শাহজাহানের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

সিংহাসন আরোহণের আগে ঔরঙ্গজীবকে 'আলমগীর' সম্বোধন করা, ঘড়ি আবিষ্কৃত হওয়ার আগেই ঘড়ি দেখে সময় বলা, পরিবেশ ও পটভূমিকার প্রতি লেখকের ঔদাসীন্যই সূচিত করে। ঔরঙ্গজীব কর্তৃক দারাকে বার বার নাস্তিক, মুলহেদ, মরদুদ, কাফের ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা তাঁর ধর্মচেতনার পরিচায়ক যতদূর নয়, তার চেয়েও বেশি অসহিষ্ণুতার বহিপ্র্রকাশ। অথচ লেখক আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো করেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এজাতীয় শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

উপন্যাসে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনার নীচে ইতিহাসের সূত্র ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করে লেখক ঘটনার সত্যতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপন্যাসের পক্ষে তা অপ্রয়োজনীয়। লেখক তো আগেই বলেছেন, এটি ঠিক ইতিহাস নয়।

॥ ২ ॥

মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর 'কালাপাহাড়' (১৯২০)-এর ঐতিহাসিক ভিত্তি সুদৃঢ়। মোটামুটি সমগ্র কাহিনীতেই ইতিহাসকে অবিকৃত রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দাউদ খানের নেতৃত্বে মোঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস, হিন্দু সামন্তদের ভেতর ত্রাসের সৃষ্টি, পাঠান-মোঘল দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ইতিহাস থেকে আহৃত। কালাপাহাড়ের সঙ্গে প্রতাপ রায়ের কন্যা কমল কুমারীর প্রেমকাহিনী কতদূর ইতিহাসসিদ্ধ বলা মুসকিল।

এছাড়া উপন্যাসটির তেমন শৈল্পিক মূল্য নেই। সংলাপ দুর্বল,

কোন চরিত্রই যথাযথ ফুটে ওঠেনি। একমাত্র বিজয়কৃষ্ণ ছাড়া অন্যান্য চরিত্র নির্দ্বন্দ্ব। মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী 'আকর্ষণ' ও 'বঙ্গের জমিদার' উপন্যাসে যে সফলতা প্রদর্শন করেছেন, তার ক্ষীণ ছায়পাতও 'কালাপাহাড়ে' ঘটেনি।

॥ ৩ ॥

শেখ আবদুল গফুরের 'সোলতানা রাজিয়া' (১৯২০) উপন্যাস নয়, তবে এতে উপন্যাসের খানিকটা কৌশল চারিয়ে দেওয়া হয়েছে। লেখক নিজেও গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলে দাবি করেননি। তবে "বহুবিধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ আলোচনায় সোলতানা রাজিয়া সম্বন্ধে যে স্থান হইতে যাহা কিছু সত্য তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অবলম্বনে তাঁহার চরিত্র সরস ও সরলভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই উপন্যাস সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১০] তবু রাজিয়া চরিত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। তবে তাঁর পরিণতি ভয়াবহ এবং সর্বস্তরের পাঠকের অন্তরে রেখাপাত করে।

'সোলতানা রাজিয়া'র মাধ্যমে সেদিনের তথাকথিত 'ইসলাম-রাজ্যে'র সংঘাত দলাদলির চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর ভাষা বিশুদ্ধ, তবে সংলাপ দুর্বল। এজাতীয় সংলাপ উপন্যাসের উপযোগী নয়

॥ ৪ ॥

শাহাদাৎ হোসেনের (১৮৯৩-১৯৫৩) সবগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাসই রোমান্সধর্মী। কারণ তিনি ঘটনার সঙ্গে কল্পনাকে এমনভাবে সংমিশ্রিত করেছেন, যে, তাতে একদিকে ইতিহাসের গূঢ় সত্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে, অন্যদিকে তার শৈল্পিক গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। এসব উপন্যাস দেখে মনে হয়, এই শিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্বচ্ছ ছিলো। শাহাদাৎ হোসেনের 'হিরণ-রেখা'র (১৯২০) সবগুলো চরিত্র ঐতি-

হাসিক হওয়া সত্ত্বেও লেখক বলেছেন, "ঘটনাবলী সম্পূর্ণ সত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত নাম উল্লেখ করিয়া সত্য ঘটনামূলক উপন্যাস লেখা বর্তমানে অসম্ভব। কারণ তাহাতে গ্রন্থকারের উপর দাবি আসিতে পারে। সেজন্য ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া উপন্যাসখানি লিখিত হইল।"[১১] এই উক্তির দ্বারা প্রভাবিত হলে গ্রন্থটিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'ও বলা মুসকিল। কিন্তু লেখক এই উপাখ্যানে ঐতিহাসিক চরিত্রাবলীর মাধ্যমে যে পটভূমিকা অঙ্কন করেছেন, তা ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে সম্রাট বাবরের ভারত অভিযানের সময় রাজপুতদের ভেতরকার কোন্দল ও দলাদলি, পরস্পরের ভেতর যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি লেখক ইতিহাস থেকে চয়ন করেছেন। তবে মূল ঘটনাটি ঐতিহাসিক কিনা বলা মুসকিল। লেখক সেজন্যেই এই ভূমিকা প্রদান করেছেন। নচেৎ বাবর, হুমায়ুন, গুলবদন, রাণা সংগ্রাম সিংহ, ইব্রাহিম লোদী, কর্ণাবতী, তুলসীবাঈ প্রমুখ ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই।

একটি বিয়োগান্ত কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। এই ঘটনার মূলধারায় রয়েছে রাজকন্যা সবিতা এবং মন্ত্রিপুত্র অজিত সিংহ। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই ভেদ করে তাদের জীবনে সুখ ও শান্তি নেমে এসেছিলো বটে, কিন্তু রতনগড়ের জবরদখলকারী সর্দার রঘুনাথের স্ত্রী তুলসীবাঈর চক্রান্তে সব ব্যর্থ হয়ে কাহিনীর শেষে অকাল যবনিকা নেমে এলো। প্রাসাদচক্রান্ত, পাহাড়ের সবুজ সমারোহ, ভীলদের জীবনের ক্ষীণরেখা সব মিলিয়ে উপন্যাসটিতে এক অপূর্ব মাধুরী ছড়ানো। তবে উপন্যাসের কোথাও পরিপূর্ণতা নেই। রাজপুতদের তৎকালীন অবস্থার চিত্র রয়েছে বটে, কিন্তু তা পরিপূর্ণ উপলব্ধির আকারে পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠেনা। বাবর শাহ ও রতন গড়ের কাহিনীতে খানিকটা পূর্ণতার আমেজ থাকলেও যাকে নিয়ে এই উপন্যাসের নামকরণ সেই রমণীর সমাজের—ভীল

সমাজের কোন চিত্রই পাঠকের চোখে ফুটে ওঠেনি। তবে দুরারোহ পর্ব্বতের অভিযানসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সবিতালাভেচ্ছু অজিত কর্ত্তৃক হুমায়ুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের দৃশ্যটি[১২] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ওসমান কর্ত্তৃক জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের[১৩] অনুকরণে চিত্রিত হয়েছে। একস্থলে হিন্দু মহৎ, অন্যস্থলে মুসলমান মহৎ—এই যা প্রভেদ।

চরিত্রচিত্রণে লেখক পরিবেশের প্রভাব এড়াতে পারেননি। যে কারণে গুলবদন বা সবিতাকে মোঘল বা রাজপুতকন্যা মনে না হয়ে বাঙালিনী বলেই মনে হয়। এসব চরিত্রে লেখক বাঙালীর মোটা স্বভাবটিই চারিয়ে দিয়েছেন। সে তুলনায় লখিয়া চরিত্রে অধিকতর সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। সেজন্যে চরিত্রটি তুলনামূলকভাবে জীবন্ত। কারণ তার স্বভাবের চপলতা ও চাঞ্চল্য লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে তার হৃদয়ের গভীরতা—যা অহরহ প্রকৃতির বিশাল প্রাণজুড়ে লীলায়িত। এমন কি 'রাজু' হিসেবেও তার ক্রিয়াকলাপ বাস্তব। হুমায়ুনকে প্রথম দিন দেখেই "উন্মুক্তহৃদয়া নৃত্যশীলা ভীলবালার হৃদয়ে…নারীত্বের জাগরণ" ঘটেছিলো বলে তাঁর অন্তর্ধানের পর "একটা বিরাট শূন্যতা" বুকে ধারণ করে সে আপন কুটিরে ফিরে এসেছিলো।[১৪] অবশেষে সে তার প্রাণের বিনিময়ে ভালোবাসার মূল্য প্রদান করলো।

নারীচরিত্রের ভেতর সর্ব্বাধিক সার্থক সর্দারগৃহিণী তুলসীবাঈ। রাজ্য বিস্তারের মোহে উন্মাদিনী তুলসীবাঈ চরিত্রের বিকাশ ও ক্রম পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথে'র লেডী ম্যাকবেথের মিল রয়েছে। উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থতার জন্যে স্বামীকে নরহত্যায় প্ররোচনা প্রদান এই সাদৃশ্যের প্রধান ভিত্তি। লেডী ম্যাকবেথের তুলনায় তুলসীবাঈর পরিণতি অনেক বেশি ভয়াবহ ও শোকাবহ।

কারণ তার ভেতর একাধারে উচ্চাকাঙ্খা ও নারীসুলভ ঈর্ষা আরোপ করা হয়েছে। এই চরিত্রটি শাহাদাৎ হোসেনের একটি সার্থক সৃষ্টি যা তাঁকে একজন দক্ষ শিল্পীর মর্যাদা প্রদান করেছে।

উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলোর তুলনায় পুরুষচরিত্র তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। লেখক বাবর ও হুমায়ুনের চরিত্রে যে পরিমাণ মহত্ব আরোপ করেছেন, সে পরিমাণ দ্বন্দ্ব আরোপ করতে পারেননি বলে চরিত্রগুলো এক-একটা টাইপে পরিণত হয়েছে। সেই তুলনায় মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বা রাজপুতসর্দার রঘুনাথের চরিত্র অধিকতর মানবিক।

শাহাদাৎ হোসেনের 'মরুর কুসুমে'র (১৯২১) উপজীব্য সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিমের সঙ্গে আনারকলি নাম্নী জনৈকা ইরানী মহিলার প্রেম ও পরিণয়। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাণা প্রতাপ সিংহ, রাজা মানসিংহ, রাণী যোধবাঈ, রাণা অমর সিংহ, মেহেরুন্নিসা প্রমুখ চরিত্র ঐতিহাসিক। তবে আনারকলির অস্তিত্ব সম্পর্কে আজো ঐতিহাসিকেরা নিঃসন্দেহ হতে না পারলেও[১৫], ১৬১৫ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত লাহোরের আনারকলির সমাধি[১৬] এই চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে আভাস দিচ্ছে। এই সম্পর্কে লেখক যে সচেতন তার প্রমাণ, তিনি মনে করেন "উপন্যাস ইতিহাস নহে।"[১৭] এছাড়া সেলিম-মানসিংহ যৌথ যুদ্ধ-প্রয়াসেরও ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে।

কাহিনীটি বেশ ঘনীভূত। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমাহারে কাহিনীটি পাঠকমনে দাগ কাটে। যোধবাঈ কর্তৃক আনারকলিকে সহজে গ্রহণ করার ঘটনাটিতে চমক রয়েছে, তবে মানসিংহের আচরণ অস্বাভাবিক (সম্ভবতঃ অনৈতিহাসিকও)। পরিণতির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, তবে রাণা অমর সিংহ ও সেলিমের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম মিলনের যে আকাঙ্খা লেখক ব্যক্ত করেছেন তা সুন্দর এবং লেখকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসূচক। একই মনোভাবের দরুণ লেখকের সহানুভূতি সবগুলো চরিত্রকেই মানবিক করে তুলেছে

তবে মানসিংহ-চরিত্রের মানবিক দিক তেমন ফুটে ওঠেনি। সোফিয়া এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। কারণ এই চরিত্রের মাধ্যমে শাহাদাৎ হোসেন মোঘল হেরেমের ষড়যন্ত্র জালের চিত্রটি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের লুৎফা (মতিবিবি) চরিত্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। আনারকলিকে ঠেকানোর জন্যে মেহেরুন্নিসার সাহায্যলাভেচ্ছার সঙ্গে লুৎফা-মেহেরুন্নিসা ষড়যন্ত্র সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ছাড়া এই উপন্যাসের অমর সেলিম প্রথম সাক্ষাৎ-কারের দৃশ্যটি তাঁর 'হিরণ-রেখা'র (১৯১৯) হুমায়ুন-অজিত সিংহের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শাহাদাৎ হোসেনের 'সোনার কাঁকন' (১৯২৩)-এর একদিকে রয়েছে রাজনীতি ও সমরনীতির নানাবিধ জটিলতা, অন্যদিকে মানবহৃদয়ের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের চিত্র। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আব্বাস ও অজয়। উভয়েই গভীর অরণ্যে স্বামী, যোগানন্দ কর্তৃক লালিতা বিজয়ার প্রেমানুরাগী। প্রেমের ক্ষেত্রে এই দ্বৈতানুরাগ উপন্যাস-টিকে বিয়োগান্ত পরিণতি প্রদান করেছে। মানুষ হৃদয়ের যে চিরন্তন প্রবৃত্তির তাড়নায় দিক থেকে দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে, এই উপন্যাসে তারই স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রায়ন লক্ষ্যযোগ্য। বিজয়া ও অজয়ের পারস্প-রিক আকর্ষণ, আবার বিজয়ার প্রতি আব্বাসের এবং অজয়ের প্রতি মহামায়ার আকর্ষণ সেই চিরন্তন হৃদয়দ্বন্দ্বেরই বহিপ্রকাশ। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব কোন স্তরেই উপন্যাসের গতিরোধ করে দাঁড়ায়নি, বরং প্রয়োজনের সময় তাকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছে। এই তীব্রতা এত গভীর যে তার দ্রুত পদসঞ্চালনে ক্ষুদ্রহৃদয় মানুষ জীবনতরীর চতুর্দিকে ছিটকে পড়ছে।

এই উপন্যাসের অনেকগুলো চরিত্র ঐতিহাসিক। মুর্শিদকুলি খাঁ, বীরেন্দ্রকিশোর রায়, যোগানন্দ স্বামী, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ প্রমুখ ইতিহাস থেকে আহৃত। উপরন্তু উপন্যাসের প্রারম্ভে সম্রাট ঔরংজীবের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারের অভাবে বিশৃঙ্খলাসৃষ্টি-

জনিত যে পটভূমিকা নির্মাণ করা হয়েছে তাও ঐতিহাসিক। তবে কাহিনীটি কতদূর ঐতিহাসিক তা বলা মুসকিল। এই কারণে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' হিসেবে উপন্যাসটি লেখকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

যোগানন্দ স্বামীর উপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীদের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। আনন্দমঠে বর্ণিত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মতো এর কোন স্থান ও কালগত সাদৃশ্য না থাকলেও চরিত্রগুলো মোটামুটি কাছাকাছি। বিজয়ার উপর কপালকুণ্ডলার প্রভাব একেবারেই প্রত্যক্ষ। এমন কি স্বর্ণের প্রতি তার অনাসক্তিও কপালকুণ্ডলার অনুরূপ। সে হিসেবে উপন্যাসটির সর্বত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব রয়েছে।

'সোনার কাঁকনে'র সবগুলো চরিত্রই সার্থক। লেখক চরিত্রের বিভিন্ন স্তর নির্মাণে বেশ সচতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। এই সচেতনতা সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায় বিজয়া-চরিত্রে। অজয়ের প্রতি তার আকর্ষণ মানবিক। অজয়ের বিজয়কালীন বিচ্ছেদের গুরুত্ব বিজয়ার পক্ষে উপলব্ধি করতে না পারাও স্বাভাবিক। কারণ প্রেম তার কাছে অনুভূতিমাত্র—উপলব্ধি নয়। অজয়ের অন্তর্ধানের পর ধীরে ধীরে সেই বিচ্ছেদ উপলব্ধিতে পরিণত হয় এবং নিদারুণ জ্বালারূপে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যোগানন্দের ক্ষুদ্র আঘাতে বিজয়ার পতন ঘটে।

বিজয়ার পতনের দৃশ্যটি লেখক ঠিকমতো অঙ্কন করতে পারেননি। ফলে তার মৃত্যু কোন বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে পাঠকের চোখে প্রতিভাত হয়না। বরং উপন্যাসটি মিলনান্তক হলেই যেন অধিকতর শিল্পসম্মত হতো। বিয়োগান্ত উপন্যাসের প্রতি শাহাদাৎ হোসেনের একটু আকর্ষণ রয়েছে বলে মনে হয়। 'হিরণ রেখা'য় সবিতার মৃত্যুর মাধ্যমে সর্দারজায়া তুলসীবাইর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক ফুটিয়ে তোলা হলেও, এই উপন্যাসে তা নেই। কখনো কখনো দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে থেকে একজনকে সরিয়ে আনার

জন্যেও এজাতীয় দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। আলোচ্য উপন্যাসে তাও নেই—না মহামায়া-যোগমায়ার (বিজয়া) ভেতর, না অজয়-আব্বাসের ভেতর। কারণ, এসব দৃশ্যের কোথাও এই দ্বৈত আকর্ষণ এত তীব্রতা লাভ করেনি, যার জন্যে এজাতীয় পরিণতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে হিসেবে পরিণতি সার্থক নয়।

এছাড়া আরেকটি চরিত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ। সেটি হলো ব্রহ্মচারী যোগানন্দ স্বামী। তার চিত্তের স্থৈর্য, পরিবেশচেতনা এবং বাস্তবসত্য মেনে নেওয়ার সাহস সত্যি বিস্ময়কর। একটু অভিজ্ঞতা যোগ করতে পারলে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর চরিত্রে পর্যবসিত হতে পারতো।

॥ ৫ ॥

মোবারক আলির 'সোফিয়া'কে (১৯২২) একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এই উপন্যাসে তুর্কী-গ্রীসের চিরন্তন বিরোধ[১৮] যেমন পরিস্ফুট, তেমনি তুরস্কের উপর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবল চাপের যে ঢেউ বয়ে গেছে[১৯] তার ছাপও স্পষ্ট। এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক নব্যতুর্কী অভ্যুত্থানের চিত্র বাঙ্ময় করে তুলেছেন। যুদ্ধও ঐতিহাসিক ঘটনা।

মোহাম্মদ পাশার নিকট গ্রীক দার্শনিক থিওক্রেটের কন্যা সোফিয়ার প্রেম নিবেদন এবং ব্যর্থতার জন্যে তার প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছাই এই উপন্যাসের মূল কাহিনী। মোহাম্মদ পাশাকে না পেয়ে সোফিয়া তাকে সমুদ্রে বিনাশ করতে চেয়েছে বটে, কিন্তু পরিশেষে তার মহত্ব ও মনুষ্যত্ববোধের প্রবল আকর্ষণে তার ভেতর অনুতাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সোফিয়া অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে তার রূপকে। অতএব রূপের বিকিকিনিতে সোফিয়া হেরেছে বটে, কিন্তু লেখক এতদ্বারা সমাজজীবনের একটা জঘন্য দৃশ্য তুলে ধরেছেন—যার মধ্যমণি লিপানটেলিস ও শাহজাদা। এই

আবর্তে যে প্রায়ই জাত ও সম্প্রদায়ভেদ থাকেনা লেখক তা-ই এই গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন। এই প্রদর্শনকাজে লেখক গোটা গ্রন্থটিকে দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত করেছেন। একদিকে মোহম্মদ পাশা, রেজ্জানুর, এদিব, ওসমান খাঁ প্রমুখ বেগমান ও বীর্যবান পুরুষ-নারী, অপরদিকে লিপানটেলিস ও শাহজাদার মতো রূপলোলুপ, কামান্ধ ও স্বার্থপর লোক। এর মধ্যস্থলে রয়েছে সোফিয়া।

সোফিয়া এই উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র—যার ভেতর যুগপৎ প্রেমপ্রীতি, হিংসাঘৃণা আরোপ করা হয়েছে। মোহাম্মদ পাশাকে প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট করতে না পেরে সে তাঁকে সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছে, কিন্তু শেষে তার মানবতাবোধ দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছে, তেমনি যাদের দ্বারা সে মোহাম্মদ পাশাকে ধ্বংস করতে চাইছে, তাদের অমানুষিক ও হিংস্র কার্যকলাপ দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠেছে। এই মোহ-ঘৃণা থেকেই জেগে উঠেছে তার অন্তরে অধিষ্ঠাত্রী চিরন্তন নারীরূপ—যা প্রেম ও আবেগে মাতৃত্বেরই দাবিদার।

উপন্যাসের ভাষা জড়তামুক্ত নয়। কথ্যরীতিতে লিখিত হলেও ভাষার বেগ ক্ষীণধারা নদীর মতো প্রবাহিত বলে তা পাঠককে আক-র্ষণ করতে পারেনা। সংলাপ খুবই দুর্বল। কখনো কখনো সংলাপ এত দীর্ঘ যে বিরক্তি উদ্রেক করে। শুধু তাই নয়, উপন্যাসটিতে পরিবেশচেতনারও অভাব রয়েছে। স্থানকাল সম্পর্কে লেখকের ধারণা ক্ষীণ বলে যুদ্ধ দৃশ্যটি তেমন উপভোগ্য হয়নি।

'সোফিয়া'কে অন্যধরণের শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও তার সার্বিক পরিচয়ে কোন প্রকার এদিক-সেদিক হবেনা।

॥ ৬ ॥

নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী-সাহিত্যসরস্বতীর 'জানকী বাঈ' (১৯২৪) মুসলিম মহিলারচিত প্রথম এবং সম্ভবতঃ একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস [২০] এই উপন্যাসে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজির

উত্থানকে কেন্দ্র করে দুটো প্রেমকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটা হলো গুজরাটের শাসনকর্তা ইউসুফ খান ওর্ফে অলেফ খাঁর সঙ্গে দেবগিরির রাজা রামদেবের ভ্রাতুস্পুত্রী জানকী বাঈর প্রেম, ধর্মান্তরণ ও পরিণয়, অন্যটি আলাউদ্দীন খিলজির পুত্র খিজির খাঁর সঙ্গে "গুজরাট-রাজতনয়া" দেবলা দেবীর প্রেম ও পরিণয়। এই দুটো প্রেমকাহিনী রূপদানের জন্যে গোটা উপন্যাস রচিত হলেও এর একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সুলতান জালালউদ্দীন খিলজি ও সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির ইতিহাস। গোটা উপন্যাসে সুলতান জালালউদ্দীন খিলজির উদার ও সংবেদনশীল চরিত্র[২১] মোটামুটি অবিকৃত রাখা হয়েছে। কিন্তু লেখিকা অত্যন্ত যত্নসহকারে আলাউদ্দীন খিলজি কর্তৃক হীন ও অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে জালালউদ্দীন খিলজির হত্যার ঘটনাটি[২২] এড়িয়ে গেছেন। গুজরাট পতনের পর দ্বিতীয় করণদেবের সুন্দরী স্ত্রী কমলা দেবীকে বন্দী করে আলাউদ্দীনের তাঁকে মহীষীদের অন্তর্ভুক্তকরণ,[২৩] কমলাদেবীর কন্যা দেবলা দেবীকে দেবগিরি থেকে জবরদস্তি করে প্রাসাদে এনে রাজকুমার খিজির খানের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধকরণ,[২৪] এবং উপন্যাসে উল্লিখিত দেবগিরি, গুজরাট, চিতোর, রণথম্বর প্রভৃতি স্থানে অভিযান ঐতিহাসিক। তবে চিতোরের রাণী পদ্মিনী প্রসঙ্গে তিনি যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। অবশ্য পদ্মিনী-উপাখ্যান নামে বর্তমানে প্রচলিত কাহিনী সম্পর্কে এমনিতেই নানাপ্রকার মতামত রয়েছে।[২৫] উপন্যাসে উল্লিখিত কয়েকটি নাম ভুল। যেমন, দেবগিরি থেকে যিনি দেবলা দেবীকে বন্দী করে এনেছিলেন তিনি আলাউদ্দীনের ভাই উলুঘ খান[২৬] —আলেফ খান নয়, (অবশ্য উলুঘ খান বিকৃত হয়ে আলেফ খান হতে পারে)। চিতোরের রাণার নাম রাজা রতন সিংহ[২৭] —ভীম সিংহ নয়। এসব ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ দিলে গোটা উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে লেখিকা সচেতন ছিলেন বলা

—১৫

যায়। তবে ইউসুফ-জানকীবাঈ উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে বলে মনে হয়না।

উপন্যাস হিসেবে জানকী বাঈ সার্থক। কারণ নুরুন্নেছা খাতুন একটি শাখাপ্রশাখাযুক্ত কাহিনী তৈরি করেছেন এবং নানাভাবে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তবে আলাউদ্দীন খিলজির রাজ্যবিস্তার বর্ণনা প্রসঙ্গে এত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই অংশ উপন্যাসের বদলে ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থে পর্যবসিত হয়েছে। তবে এতদ্বারা পাঠকের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হবার অবকাশ নেই। কারণ অপ্রতিহত গতি উপন্যাসটির একটি প্রধান গুণ। চরিত্রগুলো সে হিসেবেই গড়ে উঠেছে। জানকী বাঈ চরিত্রে লেখিকা বাঙালী রমণীর তাবৎ গুণাগুণ আরোপ করেছেন বলে তাকে আমাদের খুবই পরিচিত মনে হয়। বিশেষতঃ ইউসুফ খাঁর বিদায়কালে জানকীর আবেগাপ্লুত অভিব্যক্তি[২৮] শিল্পসুষমামণ্ডিত। এজাতীয় সংযম একটা বিশেষ গুণ।

এই উপন্যাসের একটা প্রধান আকর্ষণ হলো লেখিকার অসাম্প্রদায়িক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি—যা এজাতীয় গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে অনেকেই রক্ষা করতে পারেননি। ফলে উপন্যাসে শৌর্যবীর্য প্রদর্শনকালে কেউ কারো চেয়ে কম যায়নি। এই অভিব্যক্তি আলাউদ্দীন খিলজির ভেতর যেমন প্রতিফলিত, তেমনি হিন্দু যোদ্ধাদের মধ্যেও দুর্লভ নয়। শুধু এই উপন্যাসে নয়, 'স্বপ্নদৃষ্টা' (১৯২৩) উপন্যাসে বেনারসে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের জামে মসজিদের সঙ্গে দেবমন্দিরের অংশ যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি "অটলা-দেবীর মন্দির" ভেঙ্গে সম্রাট কর্তৃক নির্মিত অটলে কি মসজিদ দেখে তাঁর উপন্যাসের নায়ক "মনে একটু অশান্তি অনুভব" করেছে।[২৯]

উপন্যাসের প্রথমদিকে মহারাজ রাম দেবের প্রসাদাভ্যন্তরে ইউসুফ খাঁর প্রবেশ এবং তিনজন সহযাত্রীসমেত প্রাসাদে হামলার দৃশ্যটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে মহারাজ বীরেন্দ্র

সিংহের প্রাসাদের সেই পাঠান-হিন্দু সংঘর্ষের মিল রয়েছে।

॥ খ ॥ সামাজিক উপন্যাস

॥ ১ ॥

আর্চ্চমন্দ আলীর (১৮৬৫ .৯৪২) 'প্রেম দর্পণ' (১৮৯১) "বাঙালী-মুসলিম রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস।"[৩০] উপন্যাসটি একটি "সত্য ঘটনা অবলম্বনে" রচিত বলে লেখক দাবি করেছেন [৩১] একটি হিন্দু রমণীর সঙ্গে মুসলিম যুবকের প্রেম পরিণয়ের চিত্রই এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সে হিসেবে এই উপন্যাসে যুগের একটা বিশিষ্ট প্রবণতার স্বাক্ষর থাকলেও লেখক বহুক্ষেত্রেই তা অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছেন। কাহিনীতে পরিবেশ ও কালের প্রভাব তার প্রমাণ।

প্রথমেই মধ্যযুগীয় রীতিতে নর ও নারীর রূপের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা এই বর্ণনাটিও আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র প্রভাবজাত। কাসেম-ক্ষেত্রমণির প্রেমে কোন দ্বন্দ্ব নেই। যদিও দুটো পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন তাদের ভেতর দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক। একমাত্র মেয়ে হিসেবে ঘরজামাই রেখে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে স্বাভাবিক হলেও কোন মার পক্ষেই জেনেশুনে পক্ষপতির মতো মূর্খের হাতে মেয়ে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ছেলেমেয়ের জন্যে কোন মা-ই স্বার্থপর হতে পারেনা। তবে বিয়ের পর গজ-ক্ষেত্রমণি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ছেলের ভেতর দ্বন্দ্ব আরোপ করা যেতো। কিন্তু লেখক সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছেন। কাহিনীর গতিধারা সমান্তরাল বেগে এগিয়ে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে।

উপন্যাসটি মিলনান্ত। গোড়াতেই লেখক ক্ষেত্রমণির মুসলমান হওয়ার ইচ্ছে জ্ঞাপনের মাধ্যমে মিলনের আভাস দিয়ে রেখেছেন।

ফলে কাহিনীকে পূর্বনির্ধারিত মনে হয়। লেখক সমস্ত ব্যাপারটিকে সহজ করে দিয়েছেন। ফলে "ক্রমশঃ জানা গেল, ক্ষেত্র মুসলমান-ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়া কাসেমের অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে তাঁহার বাটিতে সুখে জীবন যাপন করিতেছেন। গ্রামে কয়েক দিন পর্য্যন্ত এই বিষয়ের বাক্-বিতণ্ডা চলিল, অবশেষে সকলই নীরব হইল। ভাবিল যে, এ বিষয়ে বৃথা আন্দোলন করিয়া কেবল মন নষ্ট বই আর কিছুই নয়।"[৩২] এই পরিণতি সমর্থনযোগ্য নয়। যদিও লেখক ধর্মমত পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কন করেছেন গজপতির সঙ্গে ক্ষেত্রের বিয়ের পরে, এবং যদিও ক্ষেত্রমণি একখানা পত্রের মাধ্যমে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করেছে, তবু এতে কোন ব্যতিক্রম হতে পারেনা এজন্যে মনে হয়, আর্জ্জমন্দ আলি নির্জলা ধর্ম-বিশ্বাস থেকে এই শিক্ষাগুণ-রহিত পরিণতি অঙ্কন করেছেন—হিন্দুদের রচিত উপন্যাসের প্রতি-ক্রিয়ায় রচিত হোক বা না হোক। লেখকের ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপও উপন্যাসটিতে রয়েছে।

এই উপন্যাসের আরো একটা ত্রুটি হলো অতিকথন। প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদে এই বিরক্তিজনক অতিকথনের নিদর্শন রয়েছে। কোন কোন অধ্যায়[৩৩] উপন্যাসের বদলে এক একটা বিষয়ের উপর লিখিত গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রবন্ধে পর্যবসিত হয়েছে। নারী-পুরুষের বয়েস সংক্রান্ত বিবরণীতেও লেখক কখনো কখনো পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেননি। ক্ষেত্র ও গজপতির বয়েস তার প্রমাণ।[৩৪]

এই উপন্যাসটিকে কোন দিক দিয়েই সার্থক বলা যায়না। এর কোন চরিত্রই ফুটে উঠেনি। লেখক বিভিন্ন বিষয়ে এত কথা বলেছেন যে, তা পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে এবং যুগবিচারে ঘটনাটিও অস্বাভাবিক। তবে তৎকালের একখানা মুসলিমপ্রধান অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনায় লেখক দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

॥ ২ ॥

জানে আলম চৌধুরীর 'সাধনার জয়'কে (১৯১৪) লেখক একটি পারিবারিক উপন্যাস মনে করেন। তাঁর মতে, "মুসলমান সমাজে এ পর্য্যন্ত কেহ বঙ্গভাষায় পারিবারিক উপন্যাস রচনা করেন নাই'[৩৪] কিন্তু 'সাধনার জয়'কে পারিবারিক উপন্যাস না বলে সামাজিক উপন্যাস বলাই অধিকতর বিধেয়। কারণ এই উপন্যাসে যেসব সমস্যা দেখানো হয়েছে সেগুলো সমাজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। অর্থের লোভে পাঁচ বছরের অঙ্গীকার অস্বীকার, টাকার লোভ দেখিয়ে সম্পর্কস্থাপনের প্রয়াস, উচ্চবংশে শিক্ষার অপ্রতুলতা, চকবাজারের কাপড় ব্যবসায়ীদের কাণ্ড-কারখানা, দরিদ্রের আর্তনাদ, গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে অন্যের সর্বনাশ সাধন প্রয়াস সবই সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। তবে উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের চিত্রও রয়েছে।

'সাধনার জয়ে'র কাহিনী গতানুগতিক। বাহারুদ্দিন নামে একজন দরিদ্র মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে বিত্তশালী হাসেমুদ্দীনের ছেলের প্রেম নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। হাসেমুদ্দিন প্রথমে ইয়াকুতির স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকে শমসুর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলেও শেষে নবাব নজাবত আলী খাঁর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু মেয়েটির স্বভাব ভালো ছিলোনা সে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইয়াকুতির নাক ও চোখ উপড়ে ফেলার চক্রান্ত করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে নিজেই এই নির্মম চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয় এবং প্রাণ হারায়। শেষে নবাবের প্রচেষ্টায় শমসুর সঙ্গে ইয়াকুতির বিয়ে হয়।

কাহিনীর গতি খুবই দ্রুত—কখনো কখনো অনুসরণ করাও কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই গতি উপন্যাসের শিক্ষাপ্রকরণের চেয়ে খুবই ক্ষতিকর। আবার কখনো কখনো দীর্ঘ সংলাপ পাঠকের ভেতর বিরক্তি উৎপাদন করে। কোন গভীর চিন্তার ছাপও উপন্যাসটিতে নেই। শমসু-ইয়াকুতির প্রেম অক্ষুন্ন রেখেও নবাবজাদীর চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করা যেতো। শুধু তাই নয়, এই অনুভূতির

মাধ্যমে যথাযথ দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলাও সম্ভব হতো। কারণ এই বিয়েতো তৎকালীন সমাজের একটা রূপেরই প্রতিফলন। তাতে কাউকে দোষী করার কোন কারণ নেই। কিন্তু লেখকের চিন্তায় সে মহত্ব ধরা পড়েনি। ফলে কাহিনীটি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

চরিত্রগুলোর গতি প্রায় সমান্তরাল। তবে কোন কোন চরিত্রে ক্ষীণ মানবিক আবেগ-অনুভূতি প্রশংসনীয় যেমন শমসুর সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে হাসেমুদ্দীনের ভেতর সৃষ্ট দ্বন্দ্ব, গোলাম কাদিরের ভেতর সঞ্চারিত মানবিক আবেগ, ইয়াকুতির নাসিকা ছেদন এবং চক্ষু উৎপাটনের ব্যাপারে নবাবভগ্নির উত্থাপিত ক্ষীণ আপত্তি ইত্যাদি। এছাড়া চরিত্রগুলো প্রায় একই ধারার। করিমন্নেছা ও নবাবভগ্নি যেমন কুৎসিত ও নীচ, তেমনি নবাব, নবাবগিন্নি প্রমুখ দেবতুল্য। তবে এর ভেতর হাসেমুদ্দীন চৌধুরীর চরিত্রে সর্ব্বাধিক দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। গোলাম কাদির প্রথম দিকে "বিলাসী, ভোগোন্মত্তা ও একটু চরিত্রহীন"[৩৬] থাকলেও শেষে একেবারে ভালোমানুষ হয়ে গেছে। তার বন্ধু দেবেন বাবু জানে, "যত দোষই তার থাক সে নির্ব্বোধ ও হৃদয়হীন"[৩৭] নয়। নবাবের চরিত্রে তৎকালীন মুসলিম উচ্চবিত্ত সমাজ-মানস প্রতিফলিত।

উপন্যাসটির ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। বিশেষতঃ ইয়াকুতির রূপবর্ণনায় এই প্রভাব চক্ষুগ্রাহ্য। বানান সম্পর্কে লেখক একেবারেই অসচেতন।[৩৮] বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তুর নাম উচ্চারণে আঞ্চলিকতার ছাপ রয়েছে।[৩৯] সংলাপে প্রচুর রস ও ব্যঙ্গ পরিবেশনের ফলে কোথাও কোথাও বেশ উপভোগ্য মনে হয়।

উপন্যাসটিতে কিছু মূল্যবান সামাজিক তথ্য রয়েছে। যেমন তৎকালীন মুসলমানদের ভেতর শিক্ষার অপ্রতুলতা, অর্থের লোভে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, মুসলিম বিত্তশালীদের পাশ্চাত্য ধরণের আসবাবপত্র ব্যবহার, বাজারের দরকষাকষি, সীমাহীন দারিদ্র ইত্যাদি এই উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণ।

॥ ৩ ॥

মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরীর 'আকর্ষণ' (১৯১৬) সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে রচিত। ভাগ্যাহত জমিদারপুত্র হোসেন আলির জীবনের উত্থান-পতনই উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য। হোসেন আলি কর্তৃক হোসনাবাদের জমিদার বদরুদ্দীনের গৃহে আশ্রয়লাভ এবং তার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে বিশাল জমিদারীর প্রভুত্ব অর্জন এই উপন্যাসের প্রধান ঘটনাধারা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হোসেন আলির উদ্ধারকারী বিষ্ণুপুরের জমিদার নরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তীর কন্যা মনোরমার তার প্রতি আকর্ষণ এবং সেই আকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের গৃহত্যাগ। অবশেষে প্রথমা স্ত্রী রওশনারার আগ্রহে হোসেন আলির সঙ্গে মনোরমার বিয়ে হয় এবং তারা সুখে ও শান্তিতে বাস করতে থাকে।

উপন্যাসের কাহিনী জমাট। তবে বহুচরিত্রসমাবেশের ফলে কাহিনীটি জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রধানতঃ চারটি ধারা কাহিনীটিতে আবর্তিত হয়েছে। হোসনাবাদের জমিদার বদরুদ্দিন এবং তাঁর কন্যা রওশানারা; বিষ্ণুপুরের জমিদার, বদরুদ্দীনের ম্যানেজার নরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, নরেন্দ্রকিশোরের বন্ধু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যা; সবশেষে ভাগ্যাহত জমিদারতনয় হোসেন আলি। এই চরিত্রগুলোকে লেখক বিভিন্নভাবে উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন এবং একটা দুর্ণিবার আকর্ষণের মাধ্যমে পরস্পরকে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে এনেছেন। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণে মানবহৃদয়ের সীমাহীন আবেগ-অনুভূতিজাত ব্যাথাবেদনার চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তার অন্তরের ঘৃণা, ক্রোধ ও নীচতাও প্রকটিত হয়েছে। এজাতীয় নানামুখী চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক উপলব্ধি করেছেন, পারিপার্শ্বিকতার কারণে মানুষ যেদিকেই যাক না কেন, বা যাই করুক না কেন সে তার মৌল স্বভাবে ফিরে যেতে পারে—যদিও এই প্রত্যা-

বর্তনের জ্বালা ভয়ঙ্কর এবং তার প্রায়শ্চিত ভয়াবহ এই ভয়াবহ চরিত্রের আভাস রয়েছে রমণীমোহনের ভেতর। অবশেষে তার ভেতরও মনুষ্যত্ববোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। উপন্যাসটি সবদিক দিয়েই মিলনান্তক।

চরিত্রচিত্রণে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। হোসেন আলী একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র। তার অন্তস্থিত মানবতাবোধ তাকে একটি মহৎ চরিত্রে পর্যবসিত করেছে। জমিদারতনয়া রওশানারাকে বিয়ে করার পর তাকে ভালোবেসেও নরেন্দ্রতনয়া মনোরমার আকর্ষণ অস্বীকারে অক্ষমতা হোসেন আলির অন্তরের বিশালতা প্রমাণ করে। কারণ মনোরমা যেভাবে তার প্রতি ছুটে এসেছে এবং তার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত প্রেমের বহ্নিশিখা নির্বাপণের জন্যে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, তাতে একমাত্র পাষাণের পক্ষেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকা সম্ভব। এই পর্যায়ে লেখক চরিত্রটিকে সার্থকতার উত্তুঙ্গ শিখরে উত্তোলন করেছেন। লেখক শেষপর্যন্ত এমন একটি প্রেমকে ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে এই দ্বৈতচারণাকে তিনি যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন চরিত্রটিতে দ্বন্দ্ব আরোপের ভেতর দিয়ে। তার ভেতর মানবিক অনুভূতি রয়েছে বলেই এমন দ্বন্দ্বে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং অবশেষে সেই হৃদয় প্রেম ও ভালোবাসার ফল্গুধারাগুণে বিগলিত হয়েছে। এই চিন্তাধারা শুধু আধুনিক নয়, সেদিনের জন্যে ছিল অচিন্তনীয়ও।

অন্যান্য পুরুষচরিত্রের ভেতর জমিদার নরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী এবং তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-চরিত্র যথাযথ ফুটে উঠেছে। নরেন্দ্রকিশোরের প্রবল স্নেহপরায়নতা—যার সামনে কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক প্রশ্নও গৌণ—এবং সমাজ ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ চরিত্রটিকে মহত্তের পর্যায় উন্নীত করেছে। ক্ষেত্রমোহনের সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন এবং পরিশেষে শিব্রাম নামে ডাকাতিতে অংশগ্রহণের পটভূমিকা আরো পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত ছিলো। এই ত্রুটি সত্ত্বেও

চরিত্রটি জীবন্ত ও প্রাণবান।

নারীচরিত্রের ভেতর প্রধান হলো রওশানারা, মনোরমা ও অনুপমা। রওশন ও অনুপমার বীরাঙ্গনা ভাব প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ। কারণ এজাতীয় স্বভাবের অনুকূলে যে পটভূমিকা থাকা প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেই তুলনায় মনোরমা সার্থক। কারণ তার প্রতিটি কার্যক্রম যুক্তিগ্রাহ্য ও স্বাভাবিক।

উপন্যাসটিতে কিছু গুরুতর ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। এতো অগ্রগামী মনোভাব প্রকাশ করা সত্ত্বেও এতে আধুনিক ধ্যানধারণা ও জীবনযাত্রাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—বিভিন্নপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যার অন্তর্ভুক্ত।[৪০] অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি যেভাবে সম্রাট আকবরের বিপক্ষে সম্রাট ঔরঙ্গজীবকে স্থাপন করেছেন[৪১], তা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, হাস্যকরও বটে। এছাড়া এই উপন্যাসের আর একটা বড় ত্রুটি হলো মানবমানবীর ঘন ঘন সংজ্ঞালোপ। এক এক পর্যায়ে চারজন প্রাণী (হীরেন্দ্র, কমলাদেবী ক্ষেত্রমোহন ও করুণাময়ী) একস্থানে পরস্পরকে দেখে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল—যাদের জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে অনুপমা, চন্দ্রকান্ত, হোসেন আলি ও মনোরমা[৪২] ব্যাপারখানা শুধু হাস্যকর নয়, অদ্ভুতও।

মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'বঙ্গের জমিদার' (১৯২৫) তুলনামূলকভাবে অধিক সার্থক ও শিল্পোত্তীর্ণ। প্রথম উপন্যাসের কাহিনীতে যে জট পাকিয়ে ফেলা হয়েছে, আলোচ্য উপন্যাসে তা নেই। স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে কাহিনী এগিয়ে গেছে, পাঠককে কোথাও থমকে দাঁড়াতে হয়নি। এমন অপ্রতিহত গতি যে কোন উপন্যাসের একটা বিশেষ গুণ। উপন্যাসের ভূমিকায় পুলিনবিহারী বসু বলেছেন, "বাঙলার জমিদারগণ কিভাবে পাপের পঙ্কিল হ্রদে নিমজ্জিত হইয়া প্রজার তপ্তশোণিত শোষণ করে, কি

ভাবে অত্যাচারে ও ব্যভিচারে জমিদারী প্লাবিত করে, চৌধুরী সাহেব তাহাই এই 'বঙ্গের জমীদারে' দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।" এই অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক কোথাও দৈবের আশ্রয় যেমন গ্রহণ করেননি, তেমনি কোনপ্রকার অযৌক্তিক আকস্মিকতার দ্বারা বাস্তবতার সীমাও লঙ্ঘন করেননি। এই গুণ ছিলো সেদিনকার ঔপন্যাসিকদের ভেতর দুর্লভ।

উপন্যাসটির দুটো তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে। একদিকে জমিদার শমসের আলির উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরিণামদর্শিতা, অন্যদিকে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ। জমিদারের আচরণ গতানুগতিক হলেও একজন সৎ ও সরল জমিদারের সন্তান হয়েও তার পদস্খলন অস্বাভাবিক মনে হতে পারে লেখক এদিকে সচেতন ছিলেন বলেই তার পটভূমিকা নির্মাণ করেছেন। অনুরূপ তার সৎপথে আগমনের পটভূমিকাও যুক্তিসিদ্ধ। কাহিনীতে একটিমাত্র চরিত্রের ভূমিকা অস্বাভাবিক মনে হয়, তাহলো গোবিন্দলালের। নতুন দেওয়ানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ উপন্যাসটির একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র। এই বিদ্রোহের পটভূমিকাও সুন্দরভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। বঙ্কুবিহারীর বিদ্রোহী ভূমিকা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অত্যাচারিতের শেষ চেষ্টার অনুরূপ। তারতো উভয় দিকেই মৃত্যু। অতএব পশুর মতো মরে কি লাভ। এই ক্ষেত্রে লেখকের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো, তিনি এই দৃশ্যে কোনপ্রকার অবাস্তব ভাবালুতাকে প্রশ্রয় প্রদান করেননি। ঋজুগতিতে দৃশ্যটি এগিয়ে গেছে এবং পরিণতি লাভ করেছে। এই দৃশ্যে নুরুল হক চৌধুরীর শিল্পকুশলতা একজন দক্ষ শিল্পীর সমতুল্য। তবে কৃষকবিদ্রোহের পরিণতি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনুকূলেই গেছে। সর্বহারা ও অসহায় কৃষকেরা শেষ পর্যন্ত জমিদারগিন্নি মরিয়মের শরণাপন্ন হয়েছে। জনসাধারণ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও আন্দোলনে যতিক্ষেপ লেখকের শ্রেণীচেতনারই স্বাক্ষর।

উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। মৃণালের প্রতি গুলি নিক্ষেপে উদ্যত শমসেরের কথোপকথন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলাল-রোহিণীর কথোপকথনের দৃশ্যটি স্মরণ করিয়ে দেয়। মরিয়মের নারীবন্দনা হিন্দুপুরাণের নারীরূপেরই বহিপ্র'কাশ। একারণেই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব "মনে রাখিও, নারী বালিকারূপে আনন্দদায়িনী, কুমারীরূপে সেবাকারিণী, বধুরূপে জ্যোতির্ম্ময়ী, মাতৃরূপে সন্তানপালিনী আর গৃহিণীরূপে অন্নদায়িনী, ইহা ছাড়া নারী আর একরূপে প্রকাশিতা তার নাম সংহারকারিণী।"[৪২] এজাতীয় দৃশ্য এই উপন্যাসে বহু আছে—যা লেখকের উদার ও সহনশীল মানসিকতার স্বাক্ষর।

'বঙ্গের জমিদার' উপন্যাসে লেখক কয়েকটি ভালো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। জমিদার শমসের আলির অধঃপতনের চিত্র দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। তার মদোন্মত্ত সংলাপ মাঝে মাঝে খুবই উপভোগ্য মনে হয়। এই চরিত্রটিই গোটা উপন্যাসের প্রাণমূল। তার বিপথে আগমন, পিতার মৃত্যুর পর কলকাতা এসে ভোগ-লালসার পঙ্কিল স্রোতে অবগাহন, অবশেষে তার বিবেকের জাগরণের দৃশ্যই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। এই উপন্যাসের সর্বাধিক সার্থক চরিত্র হলো দেওয়ান মোবারক আলি। এমন সংযত, ধীর ও স্থির, এমন কোমলপ্রাণ প্রজাবৎসল অথচ কর্তব্যক্ষেত্রে ইস্পাতকঠিন ও অনমনীয় মনোভাবাপন্ন চরিত্র যেকোন উপন্যাসের জন্যে গৌরবের। মরিয়ম চরিত্রের ভেতর লেখক শাশ্বত মাতৃত্বের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন-যার প্রেরণামূল হিন্দু পুরাণ। এই চরিত্রের সঙ্গে 'আকর্ষণে'র ফাতেমার মিল রয়েছে। তবে মরিয়ম আরো বাস্তব ও মানবিক-গুণসম্পন্ন। লেখক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনুকূলে একটি শক্তি হিসেবে মরিয়মকে দেখতে চেয়েছেন বলে এই চরিত্রে তাঁর অন্তরের তাবৎ সহানুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন। সে হিসেবে মরিয়ম এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলেও, সার্থকতা বিচারে

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মৃণাল। তার ভেতর লেখক অবস্থাজনিত কারণে লোভ, মোহ ও স্বার্থপরতা দেখালেও তার অন্তরে লুকায়িত নারীত্বকেও তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে লেখক কোথাও আকস্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, বরং চরিত্রটিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করেছেন। মৃণালচরিত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আঁধারে আলো'র (১৯১৫) বিজলী, 'দেবদাসে'র (১৯১৭) চন্দ্রমুখীর ছাপ রয়েছে।

সমগ্র উপন্যাস বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরী তাঁর প্রথম উপন্যাসের (আকর্ষণ) মাধ্যমে যে অজ্ঞাত পথযাত্রার সূচনা করেছিলেন, 'বঙ্গের জমিদারে' এসে তা সুস্পষ্টগতি লাভ করেছে। মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এমন পরিমিতিজ্ঞান সেদিনের ঔপন্যাসিকের জন্যে ছিলো অচিন্তনীয়।

এসব উপন্যাসের সামাজিক মূল্য অপরিসীম। 'আকর্ষণ' উপন্যাসে অনাথনাথ বিশ্বাস লিখিত ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি, লেখক একজন জমিদার ছিলেন। সে হিসেবে এর গুরুত্ব আরো মহার্ঘ। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে চিত্র এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় ত মুসলিম রচিত উপন্যাসে দুর্লভ না হলেও এর গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে উদ্বুদ্ধ এই বিভেদকে যেমন লেখক যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি এই মিলনকে তিনি পারিবারিক জীবনের সুরক্ষিত অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। তার প্রমাণ হলো, হোসেন আলি-মনোরমার বিয়ে। এই বিয়েতে কোথাও ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। এই সৌহার্দ প্রকাশের পেছনে তৎকালীন রাজনৈতিক গতিধারা নিশ্চয়ই প্রেরণা জুগিয়েছিলো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই উপন্যাসটি যে বছর প্রকাশিত হয়, তার পরের বছরই (১৯১৬) ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' সম্পাদিত হয়। 'বঙ্গের

জমিদার' উপন্যাসে জমিদারদের অধঃপতনের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তদুপরি শমসেরের শহরে গমনকে কেন্দ্র করে লেখক শহরের ক্লেদাক্ত চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে শহরের প্রতি তাঁর আক্রোশ মাঝেমধ্যে অসঙ্গত রূপ লাভ করেছে—যাকে রক্ষণশীলতাই আখ্যা দেওয়া যায়। কবি ও কবিতার প্রতি বিরাগ, রামচরণের নিরহঙ্কার পূজার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের আড়ম্বপ্রিয়তার সমালোচনা, শহরের বাবুদের প্রতি ঘৃণা লেখকের অখণ্ড চেতনা-বোধের স্বাক্ষরবাহী। এই উপন্যাসে লেখক গ্রাম থেকে শহরে আগত জমিদারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা শেষ ভাগে হিন্দু সমাজেও এজাতীয় পরগাছার সৃষ্টি হয়েছিল—যাঁরা বাঙলার সামজিক ইতিহাসে 'বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন।

'বঙ্গের জমিদার' উপন্যাসে গ্রামের পুকুর ঘাটের সুন্দর চিত্র রয়েছে। তিনি যখন বলেন,

> "একটি দুইটি করিয়া অনেকগুলি রমণী বড় পুকুরে আসিয়া জমায়েত হইল। তন্মধ্যে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, নবীনা সকল শ্রেণীর রমণীই ছিল। কোন যুবতী কলসী ডুবাইয়া জল তুলিতে লাগিল, কেহ বা স্বকীয় অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ডালিখানি সরসী-বক্ষে ডুবাইয়া রাখিয়া নিজেই গোপনে দেখিতে লাগিল। কেহ বা অপর সঙ্গিনীর সহিত সুখ দুঃখের কথা, স্বামীর ভালবাসার কথা, যৌবনের কথা কহিতে লাগিল। পৌঢ়া ও বৃদ্ধদিগের মধ্যে কেহ নীতিচর্চ্চা, কেহ বা পরচর্চ্চা লইয়া বড় পুকুরের ঘাটে এক বিরাট মজলিসের সৃষ্টি করিল। কেহ সভাপতি, কেহ সমালোচক, কেহ বক্তা, কেহ বা শ্রোতা হইয়া সেই মজলিসের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। আবার কেহ বা সংবাদপত্রের সংবাদদাতার ন্যায় সভার মধ্যে নীরবে

দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণে মজলিস ভাঙ্গিবে, কতক্ষণে সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিদ্যুৎ গতিতে সে সংবাদ প্রেরণ করিবে—"[৪৪]

তখন একে সাহিত্যের বাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন উপায় থাকে না।

॥ ৪ ॥

সফিউদ্দীন আহমদের 'সৈয়দ সাহেব' (১৯১৭) উপন্যাস হিসেবে অকিঞ্চিৎকর। কাহিনীটি সমান্তরাল। পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয় প্রদর্শনই এই উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য। ফলে নানাপ্রকার অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর মাধ্যমে কাহিনীটি বিকশিত। গোটা উপন্যাসই পুণ্যবান ও পাপী—এই দুই দলে বিভক্ত। এই কারণে কোন চরিত্রের দ্বন্দ্ব নেই। তবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সৈয়দ লোৎফর রহমানের ভেতরকার মানবিক অনুভূতি প্রশংসনীয়—যদিও তার ধর্মভাবকেই এই ধ্যানধারণার বিকাশমূল বলে লেখক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে তাও ধর্মীয় কাজেরই অঙ্গীভূত। এই কারণে উপন্যাসের শিল্পসাফল্য সীমিত।

'সৈয়দ সাহেব' উপন্যাসের সামাজিক মূল্য অপরিসীম। এই উপন্যাসে লেখক মুসলিম সমাজে আশরাফ বলে কথিত শ্রেণীর প্রকৃত অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন। এই শ্রেণীর মনোভাব যে আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশের প্রতিকূল তা লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। শুধু তাই নয়, তিনি লক্ষ্য করেছেন "পূর্ব্বে নবাবী আমলে উক্ত আশরাফগণের বিষয় সম্পত্তি পসার-পত্তিপত্তি খুবই ছিল, কালক্রমে সমস্তই গিয়াছে,—আছে কেবল "আশরাফীফখর" —কুলাভিমান। ইঁহারা কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে ঘৃণা করেন।"[৪৫] শুধু তাই নয়, এঁদের "বিবাহ বাদী সমান ঘর না হইলে হইতে পারে না, তবে দুই সহস্র, অন্ততঃ পাঁচ শত মুদ্রা পণ পাইলেও নীচ ঘরে

কন্যা বিক্রয় অথবা হীন বংশের কন্যা বিবাহ তত দুষণীয় নহে। হীন বংশের স্ত্রী বিবাহ করিলে সেই স্ত্রী বান্দিরূপে গণ্য হয়। হিন্দুদিগের ন্যায় ইঁহারা বিধবা বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত। তবে একেবারে প্রচলিত নাই এমত নহে। দৈবদুর্বিপাকে কোন মন্দ ঘটনা প্রকাশ হইবার উপক্রম হইলে তখন অনন্যোপায় হইয়া ইসলাম বিধির অনুসরণ করেন।...এই আশরাফগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘৃণ্যপ্রযুক্ত প্রায়ই দরিদ্র। উপযুক্ত বিদ্যা অভাবে চাকুরী দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেও অক্ষম।''[৪৬] আশরাফ মুসলমান সম্পর্কে 'সৈয়দ সাহেবের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তার উপর রয়েছে জমিদারের অত্যাচার, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক, মুসলমানদের শিক্ষা ইত্যাদি সমাজের নানাপ্রকার সমস্যা।

॥ ৫ ॥

মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের 'পল্লী-সংসার' (১৯১৮) একটি বৃহৎ উপন্যাস। লেখক উপন্যাসটিকে 'জাতীয় উপাখ্যান' বলে উল্লেখ করেছেন। 'জাতীয় উপাখ্যান' বলে উপন্যাসের কোন বিশেষ শাখা না থাকলেও এই উপন্যাসে বহু 'জাতীয়' ভাবধারা বিদ্যমান। এতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের চিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি মুসলিম জাতির আশাআকাঙ্খাও যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে—যদিও সেই আশা-আকঙ্খার কোন ধর্মনিরপেক্ষ রূপ নেই। লেখক ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করাকে তাঁর কর্তব্যের অঙ্গীভূত করেছেন।

পল্লীসমাজের দলাদলি ও উন্নয়ন-প্রবণতা এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। আবদুল ফজল ও আজিজার প্রেমকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই প্রেম সার্থক হয়নি। প্রেমে পরাজয় বরণ করেও আবুল ফজল পরবর্তীকালে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। তার প্রচেষ্টায় আলিনগর একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার

ফলে এখানকার সাধারণ মানুষের ভেতর শিক্ষার আলো বিস্তরিত হচ্ছে। শেষে আবুল ফজল একজন পীর ও মোরশেদ রূপে জীবনের বাকি অংশ অতিবাহিত করে।

'পল্লী-সংসারে'র কাহিনীতে লেখক যতদূর সম্ভব একটি উপন্যাসের তাবৎ লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। বড়মিয়া গিয়াসুদ্দীনের মতো আবুল ফজলের পিতা আফতাবউদ্দীনের ভুলবুঝাবুঝি এবং পরিণামে সেই ভুলবুঝাবুঝি রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপান্তর একজন সার্থক শিল্পীর কারুকার্যময় সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে তুলিত হবার স্পর্ধা রাখে। কাহিনীবিন্যাসে লেখকের কৃতিত্ব প্রসংসনীয়। উপন্যাসের শিক্ষা-কৌশল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে সেটি সম্ভব নয়। একটি বিস্তৃত ক্যানভাসে লেখক যেন গোটা গ্রামের চিত্রটাই তুলে ধরেছেন। ফলে এতে গ্রামের বিভিন্নপ্রকার মানুষ ধরা পড়েছে। জমিদার, সত্ত্বমর্যাদাহারা শরীফ মানুষ, ব্যবসায়ী, গ্রামের সর্বহারা কৃষককুল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সমাগম উপন্যাসটিকে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করেছে। মুসলিমরচিত বাঙালা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির অবদান অনস্বীকার্য।

কাহিনীনিয়ম ছাড়া চরিত্রচিত্রণেও লেখক যথেষ্ট সফলতার পরিচয় প্রদান করেছেন। এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র মুনশী গিয়াসুদ্দীন —গ্রামে যিনি 'বড় মিয়া গয়জদ্দীন' নামে পরিচিত। এই চরিত্রটিতে লেখক তাঁর সম্পূর্ণ আবেগ ও অনুভূতি ঢেলে দিয়েছেন। পারিবারিক জীবনে তিনি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা মেনে চলার পক্ষপাতি। এজন্য তিন স্ত্রী একত্রে থাকা সত্ত্বেও তার পরিবার সপত্নীবাদের অভিশাপে জর্জরিত নয়। সামান্য একটা ভুলবুঝাবুঝির দরুন যখন আফতাব-উদ্দীনের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যর সূচনা হলো, তখন গ্রামের কিছু কুটিল লোক তার উপর ভর করে ব্যাপারখানাকে একটি রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পথে নিয়ে গেলো। বড় মিয়ার কাছে তখন তাঁর মানসম্মানের অহমিকাই বড় হয়ে দেখা দিলো। এতে আবুল ফজলের বিবাহের

পাকা কথাবার্তা ভেঙ্গে গেলো। আফতাবউদ্দীন বিয়ের ব্যাপারে তাকে পুনরায় চিন্তা করার অনুরোধ জানিয়েও রাজি করাতে পারলেন না। আজিজাকে তিনি স্নেহ করতেন। সেজন্যে তার সুখ সমৃদ্ধির প্রতি বড় মিয়ার সজাগ দৃষ্টি ছিলো। ফলে আজিজার স্বামীর বহু অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। এমন তেজস্বী পুরুষ শেষে মামলায় আপোষ করার পর একেবারেই নুইয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর-মন ভেঙ্গে গেলো, উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেললেন তিনি। এভাবে তাঁর সামাজিক জীবনে নেমে এলো যবনিকা। পরবর্তীকালে তিনি সুখী হয়েছিলেন। তবে সেই সুখের জন্যে তাঁকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিলো। এমন মানবিক গুণাগুণ সমৃদ্ধ চরিত্র যেকোন উপন্যাসের জন্যে মূল্যবান সম্পদ।

এছাড়া বাকি চরিত্রগুলোও ফুটে উঠেছে। রায় বাহাদুর তারিণীচরণ, তাঁর পুত্র সতীশ, আফতাবউদ্দীন মিয়া, আবদুল হক, মতিওর রহমান, মাসুদ, জমিদার চৌধুরী আনোয়ার আলি, আশরাফ ইত্যাদি বহু চরিত্র এই উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। এদের সব গুলোই যে সার্থক তা বলা যায়না, তবে নিজনিজ গণ্ডিতে এসব চরিত্র যথাযথ ভূমিকা পালনে তৎপর হয়েছে।

আবুল ফজল এই উপন্যাসের নায়ক। সবদিক দিয়েই চরিত্রটিকে আদর্শ বলা যায়। বড় মিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আজিজার সাথে তার বিয়ের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবার পর তার মানসিক আবর্তন বেদনাদায়ক। তার চোখের সামনে তাকে দলিত-মথিত করে আজিজা অন্যের স্ত্রী হতে চলেছে, অথচ তার নিজের কিছুই করার নেই। আবুল ফজলের এই সময়কার চিত্র লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। লেখক আবুল ফজলকে একটি বিশেষ আদর্শের প্রতীক হিসেবে অঙ্কন করতে চেয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে সার্থকও হয়েছেন। প্রথমদিকে আবুল ফজলের চরিত্রে মানবিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হলেও, শেষের

দিকে চরিত্রটি একটি বিশেষ টাইপে পরিণত হয়েছিলো। এই কারণে তার ভেতর প্রচুর গোঁড়ামিও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সমর্থনযোগ্য হলেও এতদ্বারা তার মানবিক প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই চরিত্রের পরিণতিতে লেখকের রক্ষণশীল মানসিকতার ছাপই বেশি।

মহিলাদের ভেতর সর্বাধিক উজ্জ্বল চরিত্র আজিজা। আবুল ফজল-আজিজার প্রথম সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি খুবই মনোজ্ঞ। এই সাক্ষাৎকারে আজিজার মুখ হতে কোন কথা বের হলোনা বটে. কিন্তু তার নীরব ভাষা সব জানিয়ে দিয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, আবুল ফজলের মতো বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর তার মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেও এই চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি নির্ণীত হতে পারে। পরবর্তীকালে আজিজা নিজগুণে মুখরা জোবেদাকে যেমন বশীভূত করেছে, তেমনি সপত্নী সোফিয়াকেও সহোদর ভগিনীর মতো আপন করে নিয়েছে। সালেমাচরিত্রে যে দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা বাস্তবানুগ। এজাতীয় দ্বন্দ্ব চরিত্রটিকে মানবিক করে তুলেছে। কমলাকর্তৃক হিন্দুসমাজের দোষকীর্তন মুসলিম লেখকদের বহুল অনুসৃত রীতির একটি অংশ মাত্র।

'পল্লী সংসারে'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজে'র (১৯১৬) মিল রয়েছে। নামে যেমন, বিষয়বস্তুতেও তেমনি। 'পল্লী সমাজে' যেমন সমাজের ক্লেদাক্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি পল্লী সংসারেও। তবে পল্লী-সংসারের মতো 'পল্লীসমাজে' এত ধর্মভাব আরোপ করা হয়নি। অবশ্য 'পল্লী-সংসারে' যেমন হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনটি 'পল্লীসমাজে' নেই। 'পল্লী সমাজে' শুধু হিন্দুঅধ্যুসিত সমাজের কাহিনী বিবৃত।

গ্রন্থটিতে কিছু গুরুতর ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। লেখক এই গ্রন্থের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন বলে মনে হয়। একারণে কমলা এবং রেঙ্গুনের ইংরেজদম্পতির ইসলাম ধর্মগ্রহণ যুক্তিহীন।

বিশেষতঃ আবুল ফজলের গুণে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ দম্পতির ইসলাম ধর্মগ্রহণ হাস্যকর। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো এত দীর্ঘ তত্ত্বীয় সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, তা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। আজিজার মার মৃত্যুশয্যায় তাদের সংলাপও বিরক্তিজনক। মযহব নিয়ে বিতর্কও তেমনি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়।

উপন্যাসটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো সমাজচিত্র। এই উপন্যাসে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম তৎকালীন গ্রামভিত্তিক সমাজের একটা নিখুঁত চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি নগর-সভ্যতাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলেছেন। মুসলিম জমিদারীর পতনের কারণ, নব্যহিন্দু সমাজের আবির্ভাব, মোল্লাতন্ত্রের অবসান, অর্থের বিনিময়ে জাতে ওঠার প্রয়াস, গ্রাম্য দলাদলি, মুসলমানদের ভেতর ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন, স্ত্রীশিক্ষা এবং নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, পানাহার, দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে জায়গীরের ব্যবস্থা ইত্যাদি যথাযথ চিত্রিত হয়েছে। লেখক মুসলমান সমাজকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ, আশরাফ। এতে রয়েছে সৈয়দ, শাহ, কাজি, মিঞা, খোন্দকার ও চৌধুরী। দ্বিতীয় ভাগ উন্নতশীল মধ্যসমাজ। এতে রয়েছে তালুকদার, আরমাদার, হাওলাদার, বিশ্বাস, খাঁ, সরদার, মুনশি, ঠাকুর, মিনা ও মণ্ডল। তৃতীয় ভাগে রয়েছে আতরাফ। এর অধিকাংশই বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের বংশধর। এই বিভক্তিকরণ তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম জাতির সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ মূল্যবান তথ্যসম্ভার হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ এই উপন্যাসটিতে এই সমাজের একটা বিশেষ ধারার পরিচয় রয়েছে।

'পল্লী-সংসারে'র ভাষা বিক্ষুব্ধ ও তৎসমশব্দবহুল। তবে সংলাপে প্রায়ই সাধু-চলিত মিশে গেছে। মোহাম্মদ আবদুল হাকিম কিছু সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন। যথা:

"মরা নদীর ক্ষীণ রেখার মত আফতাবউদ্দীন মিঞা বর্ত্তমান।"[৪৭]

অথবা, "উত্তপ্ত নিদাঘ-বায়ু বিতাড়িত উত্তাপ-লহরী-প্লাবিত প্রান্তর তাহার নিকট অগ্নিময় বলিয়া অনুমিত হইল।[৪৮]

অথবা, "শরাহত কপোতীর ন্যায় দিলযান মাটিতে ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন।"[৪৯]

অথবা, "বালিকার মুখখানি মাধ্যাহ্নিক রবিকিরণতপ্ত নলিনীর ন্যায় কিঞ্চিত পরিমাণ ভাব ধারণ করিল।"[৫০]

অথবা, "গঙ্গার ঘাট গোলজার করিবার জন্য শঙ্কিতা-সফরীর ন্যায়—চকিতা কুরঙ্গীর ন্যায় ধীর-মন্থর গতিতে পথ অতিক্রম করিত।"[৫১]

অথবা, "প্রভাতনলিনী গৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া বাত্যাহত লতিকার ন্যায় থর থর করিয়া কম্পিত হইতেছে।"[৫২]

॥ ৬ ॥

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৫-১৯৭৩) নানাকারণে বাঙালী মুসলমানদের কাছে পরিচিত। অগাধ পাণ্ডিত্য ছাড়াও মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের জন্যে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তার পেছনে কাজী আবদুল ওদুদেরও অবদান রয়েছে। কাজী সাহেব মূলতঃ পরিচিত প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্যে।

কাজী আবদুল ওদুদ দুখানা উপন্যাসও রচনা করেছেন। এই দুখানা উপন্যাসে মুসলিম কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই শ্রেণীচয়ন তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি প্রকৃত মুসলিম সমাজকে উপন্যাসে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কোনপ্রকার আইডিয়ার

উপর ভিত্তি করে শ্রেণীকে বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। প্রথম উপন্যাসে তিনি প্রকৃত কৃষকশ্রেণী থেকেই কাহিনী ও পাত্রপাত্রী মনোনীত করেছেন। ফলে তাঁর পক্ষে এই শ্রেণীর যথাযথ চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। একই কথা উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজ চয়ন সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

'নদীবক্ষে' (১৯১৮) কাজী আবদুল ওদুদ মুসলমান কৃষকের ছেলে লালুর মতো আরেক কৃষকের মেয়ে মতির প্রেম ও পরিণয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনী গতিশীল। নানাপ্রকার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে কাহিনীটি ধীরে ধীরে তার কেন্দ্রকে পরিপুষ্ঠ করেছে এবং পরিণতি লাভ করেছে। এই কাহিনীতে লেখক প্রচুর মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নীরিক্ষা চালিয়েছেন। এই নীরিক্ষা কখনো তার শ্রেণীকে অতিক্রম করে যায়নি। সেই অনুপাতে দ্বন্দ্বও আরোপ করা হয়েছে। মতির বিয়ের সময় লালুর অনুপস্থিতি এই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। বিয়ের সময় লেখক নানাভাবে মতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বটে, কিন্তু তা কোন স্তরেই বিদ্রোহে পরিণত হয়নি। কারণ ওদুদ সাহেব জানেন, তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন, সে সমাজ বিদ্রোহ প্রকাশ করতে জানে না। এই অক্ষমতার পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। লালু এসব কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলো বলেই হয়তো তার পক্ষে মতির শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি মতির স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভেতর একটা ছায়াও পড়েছে—যা তাকে "চারিদিকে যেন রৌদ্রহীন, বায়ুহীন, বৃষ্টিহীন কঠোর বিশুষ্ক দিনের মত"[৫৩] ঘিরে রেখেছিলো। অথচ এই শোকাবহ ঘটনার অন্তরালে যে আশার আলো লুকিয়ে রয়েছে তাও সে উপলব্ধি করতে পারে। লেখক সমাজের যে স্তরের চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেই স্তর সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই লালু-মতি প্রেমের কোন সংলাপ রচিত হয়নি। তারা একজন আর একজনের চোখের উপর চোখ রেখে চলেছে, সেই মুগ্ধ

দৃষ্টির উপর ঘটনাধারা পাতার পর পাতা এগিয়ে চলেছে। এই গতি সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের মতো উভয়ের মনোজগতে যে আবর্তন সৃষ্টি করেছে তা জানে তারা, এবং ওদুদ সাহেবের মতে, সেই অন্তর্যামী, —কিছুই যার দৃষ্টিসীমার বাইরে নয়। কাহিনীর শেষ পর্যায়েও লেখকের পরিমিতিজ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। মামার বাড়ি থেকে মতিকে নিয়ে আসার সময় নৌকায় শুধু তারাই ছিলো। লেখক এই দৃশ্যে শুধু রূপকের মাধ্যমেই তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কুয়াশাঘেরা রাতের ভয়ে মতি যখন অন্যমনস্কভাবে লালুর কাছে ঘেঁসে আসছে তখন লালুর অভয়বাণীর অন্তরালে যে আশ্বাস ও আশার আভাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা শুধু মতি নয়, পাঠককেও গভীর আবেগে অভিভূত করে রাখে।

এই উপন্যাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লেখকের পরিবেশ চেতনা। কাহিনীর আগাগোড়াই এই চেতনার স্পষ্ট পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক এই পরিবেশের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লালু-মতির মাছধরা ও কাঁকড়া-খোঁড়া', মতি ও পুটির আম নিয়ে ঝগড়া অবশেষে লালু-দুখের ভেতর যুদ্ধে রূপান্তর, মাঠে জমির-লালু একত্রে বসে ধূমপান, মতির শ্বশুর বাড়িতে লালুর আপ্যায়ন ইত্যাদি নানাপ্রকার ঘটনায় লেখক এই চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই কাহিনীর উত্থান-পতনে সমাজের কোন ভূমিকা নেই। সমাজকে শুধু বিয়ের সময়ই সামান্য দেখা গেছে। এর কারণ হলো, লেখক সমাজের যে স্তরের চিত্র অঙ্কন করেছেন, সমাজে তাদের কোন মুখ্য ভূমিকা নেই। কারণ, আমাদের স্বার্থসচেতন সমাজ কাঠামোই তাদের সযত্নে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই পর্যায়ে লেখকের সচেতনতা একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সমতুল্য। 'নদীবক্ষে'র কোন নরনারীই লেখাপড়া জানেনা। শুধু একবার মতিকে তার বাবার সঙ্গে বসে মুখে মুখে দোআ-দরুদ পড়তে দেখি।

লেখাপড়া এই পর্যন্তই। এমন কি লেখাপড়ার জন্যে কারো আকাঙ্খা যেমন নেই, তেমনি অনুশোচনাও নেই। ফটিকের মৃত্যুর পর গায়ের অলঙ্কার নিয়ে তার ভাইদের ব্যবহার এবং এই ক্ষেত্রে মতির মার প্রতিক্রিয়া, বিধবা মতির সঙ্গে লালুর বিয়ের ব্যাপারে তার মার সঙ্কোচ, মৃত্যুশয্যায় মার পুনর্ব্যক্ত আশা ইত্যাদি প্রায় তাবৎ ঘটনাতেই লেখক তাঁর সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।[৫৪]

চরিত্রচিত্রণেও লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। লালুর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য যে কোন পাঠককে অভিভূত করে। মতির প্রতি তার আকর্ষণ, বাদায় যাবার প্রাক্কালে তার প্রতিক্রিয়া, বাদা থেকে ফিরে এসে মতির বিয়ের কথা শুনে তার অন্তরে উত্থিত অব্যক্ত হাহাকার, মতির শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ভোরে কাউকে না বলে চলে আসা এবং তার জন্যে অনুশোচনা ইত্যাদি দৃশ্যে লেখক যে সচেতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তা সবার চোখে পড়ে। তবু লালু চরিত্রটিকে গ্রামের সাধারণ কৃষক যুবকের চেয়ে বেশি সচেতন ও আবেগপ্রবণ বলে মনে হয়। অবশ্য লেখকের বর্ণনাগুণে তাও পাঠকের সামনে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সে তুলনায় মতি-চরিত্রটি অধিকতর সার্থক। এই সার্থকতা গোটা উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। ছোটবেলায় লালুর সঙ্গে খেলাধুলা, বিয়ের সময় তার অব্যক্ত প্রতি-ক্রিয়া, শ্বশুর বাড়িতে লালুর সামনে নীরব অশ্রুপাতের ভেতর তার মনোভাব প্রকাশ, বিধবা মতি কর্তৃক লালুর সেবাশুশ্রূষায় অংশগ্রহণ, মামার বাড়ি থেকে ফেরার পথে তার ভীত বিহ্বল অন্তরের নীরব আত্মসমর্পণ ইত্যাদি সব চিত্রই লেখক নানারঙের সমারোহে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। লালুর অসুস্থতার সময় বিধবা মতির যে চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যি অতি দুর্লভ। লালুর কাতর চিৎকার শুনে মতি যেভাবে ছুটে এসেছে এবং ছুটে এসে যেভাবে

অন্য অজুহাত দেখিয়ে ফিরে গেছে তা একেবারেই বাস্তব। একই বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন দেখি, মতির অসুস্থ লালুর সান্নিধ্যলাভে এবং সেবাশুশ্রুষার অধিকার অর্জ্জনে। শুধু লালু ও মতি নয়, উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রেও লেখক দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। জমিরের চরিত্রটি খুব ছোট, অথচ মাত্র দুয়েকটি তুলির আঁচড়ে লেখক এই চরিত্রটিকে পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত করে তুলেছেন। ফটিকের ভোগলালসা এবং অবশেষে মতির প্রতি আত্মসমর্পণ এই চরিত্রের সুদৃঢ় বাস্তব ভিত্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, দুখে, দুখের মা, লালুর মা, মতির মা ইত্যাদি প্রায় সব চরিত্রেই লেখকের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ছাপ বিদ্যমান।

কাজী আবদুল ওদুদের দ্বিতীয় উপন্যাস 'আজাদ' (১৯৩০)।[৫৫] এই উপন্যাসটি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'জয়ন্তী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি "একটি বড় পরিকল্পনার আদিস্তর। এই পরিকল্পনার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলো মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, আর বিশেষ করে রোমাঁ রোলার "জন ক্রিষ্টোফার" বইখানি।"[৫৬] 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে লেখক দরিদ্র মুসলমান কৃষক পরিবারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই উপন্যাসে উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর চিত্র রয়েছে। চৌধুরী মোহাম্মদ আজমের পুত্র আজাদই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের সন্তান হিসেবে সে যেসব স্বপ্ন দেখেছে এবং সেই স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে তার ভবিষ্যৎ পরিচালিত হয়েছে তাই এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'আজাদ' উপন্যাসের কাহিনীতে ঘটনার চেয়েও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের সংলাপ—যা গোটা উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এসব সংলাপের একদিকে রয়েছে নীতিকথা, অন্যদিকে সাধারণ পরিবেশ রচনা। এর ভেতর লেখক একটা বিশেষ শ্রেণীর আশাআকাঙ্খা কামনা-বাসনা ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও

পরিবেশচেতনার স্বাক্ষর রয়েছে—যে পরিবেশ মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তা সর্বাংশে সংস্কারমুক্ত ও উদার। চৌধুরী মোহাম্মদ আজম তাঁর পুত্র আজাদকে যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন তাদের ভেতর হজরত ওমর শেখ সা'দী, সম্রাট বাবর যেমন রয়েছেন, তেমনি রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও আছেন। তবে লেখকের প্রেরণা-মূল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন হলেও এই উপন্যাসে তার তেমন ছায়া নেই। "স্বদেশী আন্দোলন আজম সাহেবকে একটুখানি ভাবিয়েছিল, কিন্তু একটুখানিই। তবে শীগগিরই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—ও এক হুজুগ।"[৫১] এই সিদ্ধান্তের পেছনে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব ছিলো কিনা জানিনা, তবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই সিদ্ধান্তকে নির্ভুল বলেই মনে হয়—যা ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছিলো। আজম সাহেব এবং তার পারিপার্শ্বিকতায় চিত্রিত শহুরে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া প্রায় সমধর্মী হওয়াই স্বাভাবিক—বিত্তহীন সমাজের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন। লেখক এই সত্যটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুসলিম চাকুরীজীবীদের বর্ণনায়ঃ

> "অভ্যাগতদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি খান সাহেব খায়রুল আলম, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বয়স চল্লিশের উপরে—তাঁর পীরকেবলা দেহলবীর দস্ত-মোবারক ধারণপূর্ব্বক এখন তাঁর চলেছে তাসাউফের গহনে প্রবেশ-পথের সন্ধান। এঁর পরেই উল্লেখযোগ্য মৌলবী মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম এম্-এ বি-এল্, সরকারি উকিল, পনের বৎসর তাঁর ওকালতি করা হয়েছে, এখন সকালে ঘুম থেকে উঠতে তাঁর আটটা বাজে, রাত্রের আহারের সময়ে খাসির চর্ব্বিদার গোশতের একটু কোরমা তাঁর চাইই। নিজেকে

তিনি জানেন অন্তুতঃ তাঁর জেলার শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতা বলে—এবারকার নববর্ষে 'খান বাহাদুর' তিনি হতে পারেন, এ সম্ভাবনার কথা তিনি সহজভাবেই মনে স্থান দেন। এই দুই জনের পরে উল্লেখযোগ্য আজকার সম্মানিত অতিথি মৌলবী ফজলে আলি—তিনি য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ইন্স্পেকটর হয়ে যাচ্ছেন বগুড়ায়। তাঁর মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, রংউজ্জ্বল গৌরবর্ণ—ভারী হাসি খুশি দেখাচ্ছে তাঁর মুখখানি। সর্পোশ ঢাকা পেচোয়ান নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেছে এই ভদ্রমণ্ডলীর ধুমপান আর গল্প। কোথায় কোন্ মুসলমান চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছু তরক্কী করেছেন, কোন্ কোন্ ডিপার্টমেণ্টের সাহেব মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান, কম্বখত্ হিন্দুদের দৌরাত্মে মুসলমানদের কিছু হ'বার উপায় নেই—এই সবই প্রধানতঃ এঁদের গল্পের বিষয়।''[৫৮]

লেখক অভিজাত বলে কথিত মুসলিম সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে যে সব উক্তি করেছেন সেগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সমাজ শিক্ষায় পরাম্মুখ নয়, বাঙালা ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। উর্দু ভাষাকে বাবুর্চীদের ভেতর সীমাবদ্ধ রেখে লেখক মুসলিম সমাজে তার অবস্থান নির্ণয় করছেন, যদিও এই অবস্থান সর্বোতভাবে ব্যক্তির মানসিকতার উপর নির্ভরশীল। এই উপন্যাসে লেখক সংলাপের মাধ্যমে প্রচুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেছেন। যদিও কখনো কখনো এই পর্যবেক্ষণ পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে, তথাপি লেখকের তীব্র অনুশীলনশক্তি প্রশংসনীয়। 'নদীবক্ষে' যেখানে এই পর্যবেক্ষণ লেখকের বিবরণের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেখানে 'আজাদে' গোটা চরিত্রগোষ্ঠীকে এই পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া লেখকের বাস্তবজ্ঞানের স্বাক্ষর।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আজাদ হলেও শ্রেষ্ঠ চরিত্র চৌধুরী মোহাম্মদ আজম। আজম সাহেব একজন বিজ্ঞ সরল ব্যক্তি—যার ভেতর লেখক সম্পূর্ণ মানবিক গুণাবলী স্থাপন করতে চেয়েছেন। জনসেবায়, নিজের পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যৎ গঠনে, রাজনীতি ও সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে চেতনায় মোহাম্মদ আজম একজন জীবন্ত ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভূমিকা পালন করেছেন। আজাদ উচ্চাভিলাষী তরুণ। সে যেভাবে গোড়া থেকে তার জীবন গড়ে তুলেছে তা তরুণসমাজের জন্যে আদর্শ। কাজী আবদুল ওদুদ এই আদর্শকে সমাজের সামনে স্থাপন করতে চেয়েছেন।

'নদীবক্ষে' ও 'আজাদ' উপন্যাসের সূচনা ও পরিণতিতে লেখক গভীর জীবনবোধের পরিচয় প্রদান করেছেন। উভয় উপন্যাসই খেলাধুলার ভেতর দিয়ে সূচনা, পরিণতি জীবনের প্রগাঢ় অনুভূতিতে —'নদীবক্ষে'র লালুর কাছে যার প্রেরণা মতি, আজাদের কাছে তা রাবিয়া। এই উপন্যাসে লেখক কোন প্রকার সামাজিক সমস্যা আরোপ করেননি, কখনো কখনো সমাজ উঁকি মেরেছে মাত্র। লেখকের এই ভাব প্রশংসার যোগ্য।

কাজী আবদুল ওদুদের ভাষা গতিশীল। দুটি উপন্যাসের দু ধরনের ভাষারীতি প্রয়োগ পরিবেশ ও চরিত্রের প্রকৃতি নির্ণয়ে সহায়ক। তাঁর উপমা যেমন জীবন্ত, তেমনি পরিবেশের ছাপাঙ্কিত। মনে হয় তিনি যেন জীবন থেকেই উপমাগুলো সংগ্রহ করেছেন। যেমন :

> "কিন্তু পর মুহূর্তেই মতিকে সটান শয়ান দেখিয়া বিদ্যুৎ বিকাশের পর সমস্ত আকাশ যেমন একেবারে গাঢ় আঁধারে ভরিয়া যায়, লালুর মায়ের মন তেমনি হতাশে নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল।"[৫১]

অথবা "দেহমনের সমস্ত শক্তি উজাড় করিয়া দিয়া সে অভীষ্টের পানে তাহার পথ কাটিতেছিল, যেন প্রবল ভূমিকম্পে

তাহার সাধন, তাহার পথের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়া এমন করিয়া তাহার সব সম্বল বিধ্বস্ত হইয়া গেল।"[৬০]

অথবা "তাই কিছু পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে আসিতেই তাহার ক্রোধের আগুন প্রায় নির্বাসিত হইয়া আসিল, শুধু আগুন নিভিয়া গেলে দগ্ধ স্থান যেমন কালো বিশুদ্ধ হইয়া খাঁ-খাঁ করিতে থাকে, তাহার মনেও তেমনি সব রকমের ইচ্ছার প্রেরণা লোপ পাইয়া গিয়া একটা কঠোর অন্যমনস্কতা জাগিয়া রহিল।"[৬১]

অথবা "গ্রামের প্রতি তাঁর যে সত্যকার টান, গ্রামের লোকদের প্রকৃতই তিনি হিত চিন্তা করতেন—পরম প্রেমিক মহাত্মার হিতচিন্তা নয়, অদীন যুবকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক আর চলন্ত রক্তের মতো রঙীন হিত-চিন্তা।"[৬২]

অথবা "তাদের স্বাস্থ্যপূর্ণ চোখে কেমন চাহনি যেন বৈকালের স্থলপদ্ম।"[৬৩]

অথবা "সত্যিই এক অপরিসীম পুলক আজ আহ্লাদ অনুভব করছিল এই সব সামনে করে' বসে'—হয়ত এমন পুলক যার সামনে অতীত শরতের কুয়াসার মতো স্বপ্নমাধুর্য্যমণ্ডিত, আর ভবিষ্যৎ শ্রাবণের গুরু গুরু মেঘ-রবের মতো দূরাগত মধুর, সুখদ।"[৬৪] ইত্যাদি।

॥ ৭ ॥

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) 'সরলা' (১৯১৮) উপন্যাসে কতিপয় গুরুতর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গোটা উপন্যাসখানা সরলা নাম্নী জনৈকা দুর্ভাগা রমণীর করুণ জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত।

সরলা একজন কুলীন বংশীয় নারী। সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে

ধর্মের পথে আত্মসমর্পণ করার পর বিলাস নামে এক কায়স্থ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে দেহদান করে। ফলে সে অন্তসত্ত্বা হয়। এই গ্লানি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে সে একদিন গভীর রাতে গৃহত্যাগ করে। অতঃপর নানাপ্রকার দুখ, দৈন্য, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে প্রথমে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের আকর্ষণে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতঃ ফাতেমা নাম ধারণ করে। অতঃপর জনৈক দেশীয় খ্রীষ্টানের স্নেহাকর্ষণে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং মিস সেরেন নামে পরিচিত হয়ে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে। সবশেষে তার স্বামী বিলাসকে পায়। বিলাসও তখন মুসলমান হয়ে গেছে এবং আবদোল্লাহ নাম গ্রহণ করেছে।

এই উপন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো একখানা প্রেমের চিত্র রয়েছে। সেখানা হলো সরলার আশ্রয়দাত্রী মিঃ মর্ণোর শ্যালিকা ফ্লোরার প্রণয়োপাখ্যান: ফ্লোরা সুন্দরী। অতএব তার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট। কিন্তু সে ভালোবাসে জোসেফকে। অন্যদিকে তারই বান্ধবী—মিস এমিলি—জোসেফকে ভালোবাসে। ফ্লোরা শেষ পর্যন্ত এমিলি কর্তৃক অনুরুদ্ধা হয়ে জোসেফ-এমিলির বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয় এবং প্রেমের বিচ্ছেদ ছাড়াও নানাপ্রকার পারিবারিক গোলযোগের দরুন আত্মহত্যা করে

এই উপাখ্যানদ্বয়ের ভেতর একটা সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা তেমন গুরুতর নয়। এই কারণে লেখকের মনোযোগও বঞ্চিত। সে হিসেবে কাহিনীবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। তবে গল্পদ্বয়কে লেখক এমনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন যে, মুগ্ধ পাঠকের সেদিকে লক্ষ্য থাকেনা। গল্পটির এই ক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

সরলা ও ফ্লোরাকেই এই উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র বলা যায়। কারণ এর বাইরে তিনি যেসব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলো একদেশদর্শী—সে হিন্দু হোক কি মুসলমান, অথবা খ্রীষ্টান। তাদের

কেউ ক্রুর শয়তান, কেউ বা দেবতুল্য মহামানব। আহমদ চরিত্রের ভেতর মানবিক দ্বন্দ্ব স্থাপনের যথেষ্ট অবকাশ ছিলো। কারণ সরলার প্রতি আকর্ষণ এবং তার পারিবারিক দায়িত্ববোধ এক সময় এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, লেখক এতদ্বারা তার ক্ষতবিক্ষত আত্মার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারতেন। কিন্তু লেখক তাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সরলা-চরিত্রের মাধ্যমে যদিও লেখক কোন প্রকার মনস্তাত্ত্বিক সত্যনিষ্ঠা আবিষ্কার করতে পারেননি, তবু এই চরিত্রের মাধ্যমে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বক্তা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনা করেছেন। সরলা বিভিন্নক্ষেত্রে এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে যা তার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে। তার রূপোপলব্ধি ও প্রেমানুরাগ হিন্দু সমাজের এক জটিল সমস্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ভিত্তি ঐতিহাসিক। একে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা সত্যকে অস্বীকার করার মতো। তবে লেখক আহমদ ও সরলার মাধ্যমে যেভাবে ইসলাম ধর্মের গুণকীর্ত্তন করেছেন[৬৫] তা শিল্পবোধের প্রতিকূল। এই ত্রুটি এড়াতে পারলে ভালো হতো। কারণ ধর্মক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং সেই কারণে অসহিষ্ণুতা সর্বজনস্বীকৃত। তবু ধর্মীয় ক্ষেত্রে সরলার ঔদার্যও লক্ষ্য করা যায়। কারণ সে প্রথাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে যেমন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তেমনি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছে—বিশ্বাসে নয়। কারণ ঘা খেয়ে সে উপলব্ধি করেছে "সব ধর্ম্মেই মানুষ আছে।"[৬৬] সে হিসেবে চরিত্রটিকে অসাধারণ মানবিক বলা যায়। তবে ফ্লোরার ত্যাগস্বীকারও প্রসংসনীয়।

একই উদার ও সংবেদনশীল মানসিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায় মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'রায়হান' (১৯১৯) উপন্যাসে। এই

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রায়হান। রায়হান একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত। অতএব সে জনহিতকর কাজকেই তার জীবনের পরম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই একটি চরিত্রকে সামনে রেখে লুৎফর রহমান মানবজীবনের উভয়দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। ভালো ও মন্দের সমন্বয়েই যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিকাশ ঘটে তার প্রমাণ পাওয়া যায় রমেশ ও খোরশেদের চরিত্রে। উভয় চরিত্রেই মানবিক গুণাগুণ আরোপ করা হয়েছে—যদিও দোষের পাল্লাই ভারি। নারীর ভেতরও কখনো কখনো মানবিক গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায় এই গুণাগুণ সর্বাধিক চক্ষুগ্রাহ্য গিরিবালা-চরিত্রে। তবে খোরশেদের প্রতি আকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সে যদি গৃহত্যাগ না করতো তাহলে চরিত্রটি অধিকতর জোরালো হতো। সে অনুপাতে আমেনা-চরিত্র অনেক বেশি সফল। এই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সেদিনের একটা গুরুতর সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,—তাহলো মুসলিম সমাজে বর্ণচেতনা। উনবিংশ শতাব্দীতে এই চেতনা একটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিলো।

যেহেতু একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপন্যাসটি রচিত, সম্ভবতঃ সে কারণে উপন্যাসের কাহিনীতে কোন প্রকার জটিলতা নেই। লেখক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে কোথাও অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেননি। ফলে কাহিনীটি সরল গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের শেষপর্বে আমেনার প্রতি রায়হান যে আকর্ষণ প্রদর্শন করেছে তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাসটির সর্বাপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ দিক হলো ধর্মকে কেন্দ্র করে বড় বড় বক্তৃতা। এতে লেখকের পরিমিতিজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'পথহারা'কে (১৯১৯) উপন্যাস না বলে কয়েকটি স্কেচের সমষ্টি বলাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ এর কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই, বা কোন কেন্দ্রীয় ঘটনা নেই। ছোট ছোট কয়েকটি উপাখ্যানকে পর পর সাজিয়ে কিছু নীতিকথা প্রচার

করা হয়েছে মাত্র। এসব নীতিকথার মাধ্যমে লেখক ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এই মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে তিনি হিন্দু সমাজ ও ধর্মের নানাপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতিকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন—যার ভেতর বিধবা নারীর মানবিক অনুভূতি প্রধান স্থান দখল করে আছে। কখনো কখনো বিনা দোষে জাত খোয়ানোর দৃশ্যও রয়েছে। তাঁর অঙ্কিত এসব হিন্দু চরিত্রের অধিকাংশই মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের ধন্য মনে করছে এবং ইসলামের বিধান দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। তাঁর চোখে হিন্দু ব্রাহ্মণও শঠ, প্রবঞ্চক ও ইন্দ্রিয়সেবী, আর অশিক্ষিত মুসলমান জেঠেলও মহাপুরুষ। হরিঠাকুরের স্ত্রী শান্তা, সরযূ, ফুলরাণী, সৌদামিনী, কাদম্বিনী, নিহার, রমা ইত্যাদি চরিত্রের মাধ্যমে লেখক হিন্দু সমাজ ও ধর্মের যে অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন তা হয়তো বাস্তব, কিন্তু এই বাস্তবের বিপরীত শ্রোতধারা অঙ্কন না করলে তা একদেশদর্শী হয়ে পড়তে বাধ্য।

তবে লেখক পথহারা মানবগোষ্ঠীর ছবি আঁকতে গিয়ে মুসলমান সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই চিত্রসমূহ ধর্ম ও সমাজ জীবনকে অতিক্রম করে কখনো কখনো পারিবারিক জীবনেও ছায়াবিস্তার করেছে। এরশাদ-কুলসুম ও কাদম্বিনী-রাধা উপাখ্যান তার প্রমাণ। যদিও এই উপন্যাসের শিল্পমূল্য একেবারেই ক্ষীণ, তথাপি শান্তার দুঃখময় জীবনকাহিনী এবং জাপানী মহিলা বেলার করুণ আত্মবিসর্জন পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবশ্য এই দৃশ্যও পথহারাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সমাজসচেতনতা অত্যন্ত গভীর। তিনি সমাজের নানাপ্রকার দোষগুণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি কৌলিন্য প্রথাকে যেমন ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তেমনি মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামিকেও নাকচ করে দিয়েছেন। তবে খ্রীষ্টান মিশনারীদের তিনি প্রশংসা করেছেন, যদিও সরমার

পুনর্বার খ্রীষ্টানধর্মগ্রহণ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুতর অনিষ্টকর দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর উপন্যাসে তিনি নানাপ্রকার সামাজিক অপরাধ, স্ত্রীজাতির প্রতি দুর্ব্যবহার, নারী শিক্ষা, আশরাফ ও আতরাফপ্রসঙ্গ, বিয়ের যৌতুক, কোরবানী নিয়ে দাঙ্গা, সংস্কৃতিক্ষেত্রে সমন্বয়প্রয়াস ইত্যাদি নানাপ্রকার সামাজিক জটিলতার উপর আলোকপাত করেছেন। শান্তার রূপমুগ্ধ রমেন বসুর হত্যাকে কেন্দ্র করে পুলিশ-ধীবর সংঘর্ষের ফলে যে বিচার বিভাগীয় প্রহসন অভিনীত হয়েছে, তা ইংরেজ শাসনের অবক্ষয়ের একটা বাস্তব দলিল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তাঁর উপন্যাসে বিদেশী দ্রব্যের প্রতি ঘৃণা যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বাঙলা বই ও লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা দেখা যায়। এই ভাষাপ্রীতি সজ্ঞানবিন্যস্ত। কারণ তখনো মাতৃভাষাপ্রসঙ্গ মুসলমানদের ভেতর আলোচিত হতো। লেখক 'সরলা' উপন্যাসে প্রবল আঘাত হেনেছেন মুসলিম সমাজে বহিরাগত বলে দাবিদার বিত্তশালীদের অসার বংশগৌরবজনিত অহমিকার উপর। ধর্মান্তরিত হিন্দুর বংশধর হয়েও "অনেক কাল পরে নিশাপুরের জমিদারেরা বলিতেন,—শাহ আব্দোল্লা এবং তদীয় পত্নী ফাতেমী দেবীর বংশধর তাঁরা। তাঁরা মোগল বাদশাহের সময় আরব দেশ থেকে এসেছিলেন।"[৬৭] এই সমস্যাটি সেদিন মুসলিম সমাজে গভীরভাবে চেপে বসেছিলো।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান 'প্রীতি উপহার' (১৯২৭) ও 'বাসর উপহার' নামে দুখানা উপন্যাসও এই সময়সীমায় রচনা করেছিলেন। সংলাপের ভেতর দিয়ে বিকশিত এই গ্রন্থদ্বয় উপন্যাসের শর্ত পূরণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ বলে এগুলো আলোচিত হলোনা। লেখকের নীতিকথাপ্রীতি এই রচনাগুলোতে এত প্রকট যে, তিনি শিক্ষাসৌকর্য সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলেন।

॥ ৮ ॥

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) 'রূপের নেশা' (১৯১৯) উপন্যাসে

মানবমনের একটা বিশেষ প্রবণতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—যার প্রেরণা রূপ ও গুণের দ্বন্দ্ব। নায়ক রশিদ জনৈক কুটিল লোকের চক্রান্তে একটা মেয়ের ছবি দেখে, কিন্তু কার্যতঃ তার বিয়ে হয় অন্যের সঙ্গে। এই কুটিলতার জন্যে গোটা উপন্যাসে সৃষ্টি হয় নানাপ্রকার ঘটনাবর্ত। মজিদ নামে যে কুটিল লোকটি এই অবস্থার জন্যে দায়ী সে নানাপ্রকার জটিলতার মাধ্যমে শ্বশুর ও জামাইয়ের .ভতর ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে—যা মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু পরিণামে রশিদের বিবাহিতা স্ত্রী জাহানারার সুদৃঢ় হস্তক্ষেপে তাবৎ চক্রান্ত জাল ফাঁস হয়ে যায়।

কাহিনীটির দুটো দিক রয়েছে। একদিকে বিয়েকে কেন্দ্র করে রশিদ এবং তার শ্বশুরের ভেতর দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণ—যা পরিণামে সকল প্রকার জটজটিলতা ছিন্ন করে এক পক্ষকে অন্যপক্ষের কাছে নিয়ে এসেছে। জাহানের প্রতি রশিদের আকর্ষণ যেমন হোক না কেন, জাহানারা সত্যি রশিদকে ভালোবেসে ফেলেছিলো। কিন্তু সে উপলব্ধি করতে পেরেছে, প্রকৃতপক্ষে রশিদ ভালোবাসে তার চাচাত বোন মণিমালাকে। এই কারণে রশিদের সঙ্গে মণিমালাকে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জাহানারার প্রবল ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা যায়। জাহানারার মধ্যস্থতায় মণিমালার সঙ্গে রশিদের বিয়ে হয় বটে, কিন্তু রশিদ-মণি পরস্পরকে ভোগ করার আগেই তাদের জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদ। মজিদ যখন শুনতে পেলো, মণিমালার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে রশিদেরই হয়েছে তখন সে মণিমালাকে হত্যা করে। মজিদের এই কাজের পেছনে যুক্তি আছে। কারণ সে যেসব চক্রান্ত করেছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য মণিমালাকে পাওয়া। এতদ্বারা লেখক দুটো অবস্থার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত: মানসিকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করার যত চেষ্টাই হোক না কেন, যাকে ভালোবাসা যায় না তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে—

বাইরের চাপ থাকলেতো কথাই নেই। দ্বিতীয়তঃ নারীর ভেতর এমন একটা গুণ লেখক আবিষ্কার করেছেন, যাতে করে সে স্বামীর সুখশান্তির পাদদেশে তার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে—তা সে যত মহার্ঘই হোক না কেন। কিন্তু লেখক পরিণামে একটা দুর্ঘটনার মাধ্যমে নারীত্বকে চরম অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। লেখক বোধহয় পুরুষের প্রেম ও ভালোবাসাকে ভাগ করতে চান না। নচেৎ জাহানারা মৃত্যুর দোরগড়ায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও সে বেঁচে গেলো, অথচ শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ মণিমালার অপঘাতে মৃত্যু হলো কেন? লেখক কাহিনীর কোন স্তরেই অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। মিথ্যা কথা বলে জাহানারাকে ট্রেণ থেকে নামিয়ে ফেলার দৃশ্যটি শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র (১৯২০) অচলা অপহরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উপন্যাসের সর্বাধিক সফল চরিত্র রশিদ এবং জাহানারার পিতা মমতাজ মিঞা। উভয়ের ভেতর লেখক পর্যাপ্ত মানবিক গুণাগুণ আরোপ করেছেন—যা নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব, লোভ ও প্রতিহিংসার ভেতর বিকাশ লাভ করেছে। রশিদ মণিমালার ছবি দেখে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে বটে, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয় নি যে, এই ক্ষেত্রে জাহানারা নিষ্পাপ অতএব তাকে কষ্ট দেওয়া অনুচিতই শুধু নয়, অমানবিকও। একারণে সে তার মামার কুপরামর্শও গ্রহণ করেনি। রশিদের এই দ্বন্দ্ব অবশেষে স্থিরতালাভ করেছে জনৈক সিদ্ধপুরুষের কল্যাণে। মমতাজ মিঞার ভেতরও প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সে জাহানারার বিয়ের ব্যাপারে মজিদের সাহায্য প্রার্থনা করেছে বটে, কিন্তু তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে মণির ছবি দেখানো হবে এটা সে কোনমতেই সমর্থন করতে পারে না। তাই সেও এই গর্হিত কাজের জন্যে মজিদের উপর ক্ষুব্ধ। কিন্তু তার তো কোন দোষ নেই। তাই সে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু সেও তো মানুষ। তাই দেখি তাকে একবার কন্যার হয়ে মামলা

করতে, আবার দেখি বেনামা পত্র পেয়ে কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় মামলার দিন অনুপস্থিত থাকতে। এত কিছুর পরও সে বাবা বলেই জামাতার অসুখের মিথ্যে খবর পেয়ে মেয়ে নিয়ে ছুটে যায় তার বাড়িতে। কিন্তু এর ভেতর যে মজিদ এত চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে তাতো কেউ জানেনা—এমন কি রশিদের মামা কুটিলকুলচূড়ামণি সফিও না। কিন্তু অবশেষে সেই মমতাজ মিঞাকেও মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তার করুণ পরিণতি স্বীকার করে নিতে হলো। কারণ সেতো মেয়ের সুখের জন্যেই এত করেছে।

গোলাম মোস্তফা তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভাঙাবুকে' (১৯২১) প্রায় একই বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক মোয়াজ্জম সোফিয়ার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে বিয়ে করতে হয় তার বড়বোন সাজেদাকে। তবে এই বিয়েতে সে প্রতারিত হয়নি। বাস্তব অবস্থার চাপেই তাকে এই বিয়ে স্বীকার করতে হয়েছে। অতএব সে সাজেদার সঙ্গে সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে যেমন চেষ্টা করেছে, তেমনি তার প্রেমিকা সুফিয়াকে ভালো ঘরে বিয়ে দিয়ে তার জীবনকেও অর্থপূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু অশিক্ষিতা ও বুদ্ধিহীনা সাজেদার পক্ষে শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি মোয়াজ্জমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হলো না। ফলে তাদের ভেতর সৃষ্টি হলো ভুল বুঝাবুঝির। এর এক পর্যায়ে সাজেদার একটি কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তিতে ক্রুদ্ধ হয়ে মোয়াজ্জম তাকে তালাক প্রদান করে। তালাকের পরই সাজেদার ভেতর শুভবুদ্ধির উদয় হয়। সে উপলব্ধি করতে পারে সোফিয়ার প্রতি মোয়াজ্জমের ভালোবাসায় কোন কুটিলতা নেই। অতএব তাকে ধরে রাখার কোন অর্থ হয় না। ফলে এবার সে মোয়াজ্জমের সঙ্গে সোফিয়ার পরিণয়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। সোফিয়া কর্তৃক প্রেরিত এক পত্রের মাধ্যমে মোয়াজ্জম একথা জানতে পারে। এই সংবাদে মোয়াজ্জমের ভেতর প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সে এতদ্বারা তার

প্রতি সাজেদার আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পারে। সে মনে মনে ভাবে, "সে আমায় কত ভালবাসিয়াছে, তাহার সমস্ত কাজের মধ্যে আমার প্রতি কত গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়াছে। সোফিয়ার প্রতি যে ঈর্ষার ভাব দেখাইয়াছে তাহার মুলেও যে এই ভালবাসা, তাহা আজ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠিল।"[৬৮] অতএব সে ছুটে যায় সাজেদার কাছে। কিন্তু তাতে সফল হওয়ার আগেই দারুণ মানসিক বিপর্যয়ের ফলে সাজেদা প্রাণত্যাগ করেন।

'রূপের নেশা' উপন্যাসের নায়ক যেমন ভালোবাসতো একজনকে বিয়ে করলো আরেকজনকে, তেমনি 'ভাঙাবুকে'ও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ব্যর্থ ও হতাশ জাহানারার মতো সাজেদাও শেষ পর্যন্ত প্রেমিকার কাছে স্বামীকে অর্পণের মাধ্যমে তার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেছিলো। কিন্তু তালাক প্রদানের ফলে সাজেদার মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়েছিলো—দৈহিক না হলেও মানসিকভাবে তো বটেই। কারণ মুসলিম ফেকাশাস্ত্র অনুযায়ী তালাক খুবই জটিল কার্যক্রম।[৬৯] তবে গোলাম মোস্তাফা এই উপন্যাসে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন "প্রকৃত ভালবাসা ভোগে নয়, ত্যাগে।"[৭০] এই উপলব্ধি সোফিয়াকে যেমন উজ্জীবিত করেছে, তেমনি সাজেদাকেও শেষ মুহূর্তে নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, এই উপলব্ধি মোয়াজ্জমের ভেতর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি। যে কারণে প্রশান্তির বদলে তার বুক ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে, সে তা বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।[৭১]

'ভাঙাবুকে'র সাজেদা চরিত্রটি গোলাম মোস্তফার একটি অনবদ্য সৃষ্টি। সাজেদা একটি অতি সাধারণ মেয়ে। ফলে সে তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় যেমন অন্ধ, তেমনি এই ভালোবাসা প্রকাশেও তদনুরূপ অক্ষম। সে সোফিয়ার প্রতি তার স্বামীর আকর্ষণ সম্পর্কে অবহিত, ফলে সোফিয়ার সকল কাজই তার কাছে বিরক্তিকর ও

ঘৃণার্হ। লেখাপড়া, ভালো করে কাপড় পরা, চুলবাঁধা ইত্যাদি নানা কাজে সে বার বার এই ঘৃণা প্রকাশ করেছে। সোফিয়ার ব্যাপারে মোয়জ্জমের সদিচ্ছা অনুলব্ধির পেছনে শুধু তার প্রতি অকরুণ ইর্ষা কাজ করেনি, কাজ করেছে স্বামীর প্রতি প্রবল ভালোবাসা —শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীনতা যার মূলে জল সিঞ্চন করেছে। কিন্তু যখনি সাজেদা তার স্বামীকে চিনতে পারলো, তখনি সে তার প্রায়শ্চিত্ত বিধানে তৎপর হলো। এই প্রায়শ্চিত্ত যে কত ভয়ঙ্কর তা উপন্যাসের পাঠকমাত্রই জানেন।

গোলাম মোস্তফার উপন্যাসে যে সমাজ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অনগ্রসর। ফলে তিনি হিন্দুসমাজের সেবামূলককাজে যেমন গৌরবান্বিত, তেমনি মুসলিম সমাজে তার অভাব লক্ষ্য করে বেদনাহত।[৭২] এই চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যচিন্তার অনুসারী। তিনি মনে করেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার প্রসার না হলে মুসলিম সমাজের উন্নতি নেই। এই ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 'রূপের নেশা'র নায়ক তার বন্ধুর সহযোগিতায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করে, প্রতিষ্ঠিত করে 'মণিমালা মেমোরিয়াল রিডিং রুম' শুধু তাই নয়, তাঁর উপন্যাসে নারী জাগরণেরও সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে। এছাড়া গোলাম মোস্তাফা নিপুণ চিত্রকরের মতো সমাজের নানা স্তরের চিত্রও তুলে ধরেছেন। মানত নিয়ে দলাদলি, বিয়ের ব্যাপারে নানাপ্রকার কুসংস্কার, শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চালচলন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গোলাম মোস্তফার অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

॥ ৯ ॥

কলিমউদ্দীন আহমদের 'মামুলী' (১৯১৯)[৭৩] উপন্যাসে দুটি প্রেমের কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে। মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে বদরউদ্দীনের

সঙ্গে জনৈক অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কন্য. লায়লীর প্রেম এবং অন্যটি বদরুদ্দীনের বন্ধু আমীর খাঁর সঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসকারী তোরাপ মণ্ডল নামক ক্ষমতাশালী সর্দারের কন্যা দুলালীর। বদরউদ্দীন ও আমীর খাঁ যদিও লায়লী ও দুলালীকে ভালোবাসে, তথাপি তাদের মাঝখানে আরো দুটি নারী নয়নভরা তৃষ্ণা এবং বুকভরা স্নেহমায়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তারা হলো জলপথে নিমজ্জিত বদরউদ্দীনের উদ্ধারকারী জলদস্যু পিলুর কন্যা মুংলী এবং একই দুর্ঘটনার শিকার আমির খাঁর উদ্ধারকারী জেলে হরিনাথের বিধবা কন্যা তারা। এর ভেতল মুংলীর প্রেম সোচ্চার, কিন্তু তারার আকর্ষণ তেমনটি নয়। কাহিনীটি যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে তারা ও মুংলীকে কেন্দ্র করে আমির খাঁ ও বদরউদ্দীনের ভেতর দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা যেতো। কারণ তারাকে আমরা আমির খাঁর কথা ভাবতে দেখেছি[৭৪]—যদিও "আত্মসংযমই তারার চরিত্রের মহত্ব।"[৭৫] আর মুংলীতো স্পষ্টই বদরুদ্দীনকে বলেছে, "তোমায় কেমন যেন দেখিতে ইচ্ছা করে ও তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে। কেন এই ইচ্ছা হয়, তা জানিনা।"[৭৬] কিন্তু লেখক তা এড়িয়ে কাহিনীটিকে নির্দ্বন্দ্ব গতিতে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। তারা তার অন্তরের সীমাহীন আকাঙ্খা জলাঞ্জলি দিয়ে আমির খাঁর হাতে দুলালীকে তুলে দিয়েছে, ওদিকে মুংলী সর্বসমক্ষে আত্মহত্যা করে তার প্রেমশিখাকে অমরতা দান করেছে। এই কারণে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই উপন্যাসের ঘটনা ধারা বিশ্লেষণ করার কোন উপায় নেই। জামিলার বিয়ের প্রস্তাবে আমির খাঁর প্রতিক্রিয়া যুক্তিসঙ্গত। কারণ "দুলালী আমির খাঁর হাতে গড়া সামগ্রী। দুলালীর সাহচর্যে আমির খাঁ হৃদয়ে যে গাঢ় প্রেম পোষণ করিয়াছিল,— দুলালীর চক্ষুও যে প্রেমের অব্যর্থ প্রতিদান ইঙ্গিত করিয়াছে, সে প্রেম—সে মধুর আসঙ্গলিপ্সা জামিলাতে নাই। দুলালী না থাকিলে আমির খাঁর হৃদয় শূণ্যবোধ

হয়; কিন্তু জামিলার থাকা না থাকাতে, জগতে আমির খাঁ বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন না। দুলালীর কথা মনে পড়িলে আমির খাঁর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, জামিলার কথা মনে করিলে সেরূপ হয় না। দুলালীর কণ্ঠস্বর, আমির খাঁকে যেন কোন অজানা দেশে লইয়া যায়—আমির খাঁ আত্মবিস্মৃত হন, কিন্তু জামিলার কণ্ঠস্বরে সে মাদকতা আছে বলিয়া আমির খাঁর মনে হয় না।"[৭৭]

চরিত্রচিত্রণেও লেখক তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। কারণ তিনি প্রায় সব চরিত্রেই অল্পবিস্তর তাঁর নিজস্ব আইডিয়া আরোপ করেছেন—যা নীতিগতভাবে ভালো মনে হলেও শৈল্পিক দিক থেকে মূল্যহীন। কারণ এজাতীয় চরিত্র বাস্তব জীবনে খুঁজে পাওয়া খুবই মুসকিল। একমাত্র ব্যতিক্রম তারা। কারণ তারার ভেতর বৈধব্যযন্ত্রণা বাস্তব রূপ লাভ করেছে আমির খাঁর প্রতি তার আকর্ষণের ভেতর দিয়ে। তার দুর্বল মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ, সংযমজনিত মহত্ব সবই বাস্তবজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

উপন্যাস হিসেবে 'লায়লী'র মূল্য যত অকিঞ্চিতকর হোক না কেন, এর সামাজিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ, ধর্মবোধ, নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সুদ সংক্রান্ত জটিল ও বাস্তব বিতর্ক, জমিদারের নায়েব গোমস্ত পাইক-পেয়াদার অত্যাচার ইত্যাদি চিত্রে সমকালীন জীবন বার বার পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে। "লায়লীর পিতার পূর্বপুরুষ খোরাসনের একজন সাধারণ অধিবাসী"[৭৮]—তেমনি আমির খাঁর "পূর্ব্বপুরুষ হিরাতের অধিবাসী"[৭৯]—এই মনোভাবের পেছনে তৎকালীন মুসলিম সমাজের একটা ভিত্তিহীন অনুভূতি কাজ করেছে। বদরউদ্দীন ও আমির খাঁর ভেতর লেখক যথাক্রমে রক্ষণশীল ও উদার এই দুই ধরণের মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবু সঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন খান নোহানীর 'শপথ'(১৯২০) একটি সার্থক উপন্যাস। দুটি হিন্দু যুবক-যুবতীর প্রেমের ব্যর্থতা উপন্যাসটির উপজীব্য। শশিমোহন ঘোষের ভাইপো ব্রজমোহন স্কুল শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মেয়ে হেমনলিনীর প্রেমে পড়ে। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর মেয়েকে একটি ব্যরিষ্টার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান জানতে পেরে ব্রজও ব্যরিষ্টারী পড়বার জন্যে গৃহত্যাগ করে। ইত্যবসরে হেমনলিনীর সঙ্গে সেই ছেলের বিয়ের দিন ধার্য হয়। হেমনলিনী পরস্পরের শপথের কথা মনে রেখেও বাবার অনুরোধে বিয়েতে মত দেয়। কিন্তু দৈবক্রমে তার সঙ্গে বিয়ে হয় একজন মদ্যপের। এদিকে ব্রজ ব্যরিষ্টারী পাশ করে এসে হেমনলিনীর বিয়ের কথা শুনে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে। সন্ন্যাসী হিসেবে অবস্থান কালে ব্রজর সঙ্গে একদিন হেমনলিনীর সাক্ষাৎ হয়। তখন হেম জানতে পারে যে, ব্রজ পলাতক থেকেও হেমকে পত্র দিয়েছিলো, কিন্তু বাবা তাকে বা তার মাকে সেই পত্র দেখাননি। একথা শোনার পর হেম নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

উপন্যাসটির কাহিনী জমাট। লেখকের বলার ভঙ্গিও সরল। পাঠক এক নিশ্বাসে উপন্যাসটি পাঠ করে ফেলতে পারেন। কোন প্রকার অতিকথন যেমন কাহিনীটিকে ভারাক্রান্ত করেনি, তেমনি কাহিনীর গতি কোথাও শ্লথ হয়নি। কাহিনীর পটপরিবর্তনে লেখক অশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। যেন যবনিকার পর যবনিকা উত্তোলিত হচ্ছে এবং নটনটীরা পরিচালকের নির্দেশমতো অভিনয় শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হচ্ছে।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কাহিনীটি চয়ন করা হয়েছে। লেখক অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পরিবেশ রচনা করেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের আশাআকাঙ্খা ও সুখদুঃখের ছবি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তার তাবৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ধরা

পড়েছে। লেখক একজন মুসলমান হয়ে যেভাবে হিন্দু পরিবারের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

ব্রজমোহন ঘোষ ও হেমনলিনী যদিও এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা, তথাপি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শশিমোহন ঘোষ এবং তার স্ত্রী মোক্ষদার চরিত্রই মানবিক ও বাস্তবানুগ। তাঁদের ভেতর স্বার্থপরতা যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনি অনুতাপ-অনুশোচনাও যথাযথ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলাউদ্দীন-চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক একজন সমন্বয়বাদীর ভূমিকা পালন করেছেন। প্রেমিকাকে ভুলবেন না বলে শপথ করার পরও বনলতার প্রতি আকর্ষণ যেমন মানবিক, তার পূর্বমতে ফিরে আসাও তেমনি মানবিক। লেখক শিক্ষাসচেতন বলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের এমন সুযোগ হারাননি। এই উপন্যাসের সর্বাধিক সার্থক চরিত্র মাষ্টার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—হেমনলিনীর পিতা। ব্রজের প্রতি অপরিসীম স্নেহের বশবর্তী হয়ে একসময় তিনি তার সঙ্গে হেমের বিয়ে ঠিক করলেও পরে ভালো পাত্র পেয়ে পুত্রীস্নেহের আকর্ষণে হেমের অন্যত্র বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। একই পুত্রীস্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি ব্রজর পত্রও লুকিয়ে রাখেন। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। উপন্যাসের শেষে ভূপেন বাবুর ভেতর আবেগ, বেদনা ও অনুশোচনার যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা একটি ট্রাজেডির নায়কের উপযোগী। মানবমনের দুর্বলতার যে ছিদ্রপথ বেয়ে ট্রাজেডির বীজ প্রবেশ করে, পুত্রীস্নেহকে সে স্তরে বিন্যস্ত করলে এটি একটি ট্রাজেডি হতে পারতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে লেখকের সফলতা সীমিত।

উপন্যাসটি যখন লিখিত হয় তখন অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনের যুগ। এর কয়েক বছর আগেই (১৯১৬) 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের' মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সূচনা হয়েছে। এই উপন্যাসে যেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনারই ছায়াপাত ঘটেছে। বিশেষতঃ শশি-আলাউদ্দীনের বন্ধুত্ব সে কথা মনে করিয়ে দেয়। খাওয়ার নিমন্ত্রণ

প্রসঙ্গে যে কৈফিয়ৎ প্রদান করেছেন তা লেখকের সমাজসচেতনতারই পরিচায়ক। মুসলিম পারিবারিক জীবনচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে সিদ্দিক লোহানীর সচেতনতা যে তীব্র বাস্তবানুগ তার ছাপ রয়েছে 'প্রত্যা-বর্ত্তন' গল্পে। গল্পটির পুরো পরিমণ্ডলই ধর্মনির্ভর—যা 'শপথ' উপন্যাসের দ্বন্দ্বদৃশ্যে প্রতিফলিত।

॥ ১১ ॥

মোহাম্মদ বেলায়েত আলির 'মিলন-কুটীরে'র (১৯২১) প্রধান উপ-জীব্য সমাজের স্বার্থপরতা, হিংসা, করুণা হলেও লেখক কোথাও তার সামাজিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। আমিন শেখের সম্পত্তির উপর তার গোমস্তা আনোয়ারের অবৈধ অধিকার প্রতি-ষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং আনোয়ারের পুত্র ইসকান্দর কর্তৃক, মৃত আমিন শেখের ছেলে ওসমানের স্বত্ব স্বীকারের মাধ্যমে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

উপন্যাসের কাহিনী খাপছাড়া ও ঢিলেঢালা। কখনো কখনো তার খেই ধরতে অসুবিধে হয়। কাহিনীতে জটিলতা আনতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে উদ্ভট ও অবাস্তব ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে বলে পাঠ-কের বিরক্তি উৎপাদন করে। উপন্যাসের সংলাপ একেবারেই দুর্বল। কখনো কখনো সংলাপে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। চরিত্রগুলোও তেমন পরিস্ফুট নয়। আনোয়ারের জীবনের ভেতর যেমন মনুষ্যত্বের লেশ মাত্র নেই, তেমনি আমিন শেখ, ইসকান্দর, রোস্তম, মোনিরুদ্দীন, শাহজাদা প্রমুখ মনুষ্যাবতার। দরিদ্র মাঝি নেওয়াজের চরিত্রেই একমাত্র খানিকটা মানবিক অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়···যা জোবেদার বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আনোয়ারের স্ত্রী রহিমুন্নেসার ভেতর স্থাপিত মাতৃত্ববোধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু অব-শেষে তাও অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত। পাহাড়ী-কুহেলীর চরিত্র

স্বল্প পরিসরে রচিত হলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তবে এই উপন্যাসে লেখক মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের উন্মেষ-চিত্রটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। জীবনবোধের যে সংকট সেদিন মুসলিম সমাজকে গ্রাস করেছিলো, তার চিত্রও এতে রয়েছে। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনধারা অনুকরণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সেদিন গভীরভাবে ধ্বনিত হয়েছিলো তার পরিচয়ও এই গ্রন্থে বেশ স্পষ্ট। এছাড়া গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রার কাহিনীও রয়েছে—যা দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের ঘাতপ্রতিঘাতে জাজ্বল্যমান। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সংগ্রামী মানুষের চিত্রও লেখক সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন।

॥ ১২ ॥

শাহাদাৎ হোসেনের 'খেয়াতরী' (১৯২২) একখানা ক্ষুদ্র উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক একটি মানবীর হৃদয়ের জটিল অভিব্যক্তি দক্ষতার সঙ্গে রূপদান করেছেন। সে নারী হলো শ্যামলী—জনৈকা তরিবাহিনী। যাকে নিয়ে সে আশা ও আকাঙ্খার রঙীন স্বপ্ন বুনতে পারতো একদিন সেই লাল্লুর প্রেমের সামনে এসে দাঁড়ালো জমিদার রতীশ বাবু। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সূত্র ধরে এই পর্বের সূচনা। শামীর মনের ভাবান্তরকে লাল্লু বিকৃত করে ভাবলো। ফলে একদিন সে শামীকে নিয়ে পালিয়ে গেলো। কিন্তু তার আশা নিষ্ফল হলো। শ্যামলী কোনমতেই তার হলোনা—আদর-সোহাগের বিনিময়েও নয়, দুঃখ নির্যাতনেও নয়। সেই নিষ্ফল যন্ত্রণায় অদৃশ্য হলো লাল্লু। কিন্তু তাই বলে শামীতো রতীশকে পেতে পারেনা। তবু আশা করতে ক্ষতি কি! কিন্তু সে ভাবনা বাস্তব রূপ লাভ করার আগেই আর একটি ঘটনা ঘটলো। জাতিচ্যুতির অপরাধে তার ভাই তাকে গৃহে স্থান দিলোনা। অতএব এই হৃদয়বতী নারী একদিন "জীবনের সম্বল এই খেয়াতরী-

খানিকে ভরসা করে''[৮০] জীবনের অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমালো।

শ্যামলী-চরিত্রের মাধ্যমে শাহাদাৎ হোসেন মানবজীবনের এক জটিলতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শামী কি জানেনা, তার পক্ষে রতীশকে পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়? আথিক অস-চ্ছলতার কথা বাদ দিলেও তাদের ভেতরকার বর্ণগত বৈষম্যও তো কম ভয়ঙ্কর নয়। তবু সে লাল্লুর সরল ও সহজ প্রেমের গলা টিপে ধরলো। এখানেই চরিত্রটির ট্রাজেডি নিহিত। মানবহৃদয়ের অন্তর্লীন ভাষা পড়ার ক্ষমতা যে তার ছিলোনা তা নয়, তবু সে অবোধ পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলো এবং একটি প্রেমকেও হত্যা করলো। মানুষ তার এই পরিণতি এড়াতে পারে না। এটাই বুঝি তার নিয়তি!

উপন্যাসের সর্বাধিক বলিষ্ঠ, বাস্তব ও মানবিকগুণসমৃদ্ধ চরিত্র লাল্লু। শামীর ভালোবাসাই তাকে দিক থেকে দিগন্তে ছুটিয়ে বেড়িয়েছে। মহেন্দ্রের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে তার দয়িতাকে রক্ষা করার দুর্বার কামনা তাকে রতীশের শরণাপন্ন করেছে, আবার সেই রতী-শের প্রতি শামীর আকর্ষণ উপলব্ধি করে সে নিজেকে তার অকল্যাণে নিয়োজিত করেছে। অবশেষে শামীকে পাওয়ার জন্যে সে নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতম পন্থা অবলম্বন করেছে। হৃদয়ে প্রেমের বহ্নি না থাকলে এমনটি হতোনা। কিন্তু দুর্ভাগিনী শামী তার হৃদয়ের সেই ভাষা পাঠ করতে না পেরে শুধু অন্ধকারেই হাতপা আছড়ে মরলো।

উপন্যাসটির পরিণতি কি? এই উপন্যাসে শামীকে যেভাবে পথে নামানো হয়েছে তাকে বাস্তব আখ্যা দেওয়া যায়না। অথচ লাল্লুর প্রতি তার আকর্ষণও চক্ষুগ্রাহ্য করা হয়নি। তবে কেউ যদি লাল্লুকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করার সময় শামীর অন্তরের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে থাকেন[৮১] তাহলে তার কাছে এই উপন্যাসের পরিণতি সুখকর হতেও পারে। কারণ লাল্লু ছাড়া শামীর একটি-মাত্র সঙ্গী রয়েছে,—সে হলো মৃত্যু।

'যুগের আলো'কে (১৯২২) লেখক "সামাজিক চিত্র" বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এতদ্দ্বারা একটা সম্প্রদায়নিরপেক্ষ সমাজের কল্যাণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মতি ও রমেশ পরস্পরের বন্ধু। উভয়ে গ্রামের উন্নতির জন্যে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং তার মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণকে বৃত্তিমূলক কাজে উৎসাহিত করে। রমেশের বোন সুরমাও এই কাজের একজন বড়ো সাহয্যকারিণী। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে হিন্দু বিধবা হয়েও মুসলমান যুবকের প্রেমে আকৃষ্ট হয়। ঘটনাচক্রে বিধবা সুরমার প্রতি গ্রামের জমিদারের নায়েবও লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ফলে সে মতিকে জব্দ করতে এবং প্রয়োজনে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তাতে বাধ সাধে তারই রক্ষিতা হরিদাসী—যে মনে মনে মতির প্রতি আসক্ত। এই আসক্তি অবশেষে তার জীবনে শুভঙ্কর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

লেখক সচেতনভাবে কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন। ফলে কোথাও অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক কিছুই স্থানলাভ করেনি। কাহিনীর গতি দুই ধারায় বিভক্ত। এক ধারায় রয়েছে গ্রামের উন্নয়নকল্পে মতি ও রমেশের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, অন্যধারায় মতি ও সুরমার প্রেম—যা সমাজের চোখে অবৈধ। লেখকের কুশলতা এই চিত্র অঙ্কনেই সর্বাধিক সোচ্চার। মতি ও সুরমা পরস্পরকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু উভয়ে নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। ফলে তা কোথাও নগ্ন নয়। অবশেষে সুরমাই তার নিজের পথ বেছে নেয়, মতিকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।

মতি ও রমেশের চরিত্র গতানুগতিক। তারা সাহসী, কর্মঠ, দেশ ও দশের উন্নতি কামনায় উন্মুখ। তাদের বিরোধী চরিত্র নায়েব ও সতীশ মুখুজ্যে। উভয়েই কুটিল, পরশ্রীকাতর ও লোভী। নায়েবের যৌনক্ষুধার জোগান দেয় সতীশ মুখুজ্যে তার বিধবা মেয়ে হরিদাসীর মাধ্যমে। তাদের অন্তরে দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। অতএব পুরুষচরিত্রগুলোকে ব্যর্থই বলা যায়।

সে তুলনায় নারীচরিত্রগুলো সার্থক। সুরমার প্রশান্ত মূর্তির অন্তরালে প্রবাহিত উচ্ছল প্রেমধারা এবং তার বিগলিত রূপ সবই জীবন্ত মানুষের মতো। একেবারে শেষ দৃশ্যে সে মুষড়ে পড়ে আশা-ভঙ্গের তাড়নায়। তবে নিজগুণে সে তাকে আসন্ন পতনের হাত থেকে উদ্ধার করে। তার অন্তরে যে জ্বালা ধূমায়িত হচ্ছিলো তা কারো পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এমনকি মতিও পেরেছে বলে মনে হয়না। এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা সার্থক চরিত্র হরিদাসী। যে ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে তারই নির্মম শিকার। কিন্তু তবু সে মানবী। অতএব মানবীসুলভ আশা-আকাঙ্ক্ষা তার ভেতরও রয়েছে—যা শেষে মতিকে কেন্দ্র করে আত্ম-প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু মতির সৎপথে আসার পরামর্শ তার বিবেককে পীড়িত করে—যা দেশ ও দশের কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়। এমন পূর্ণাঙ্গ চরিত্র যেকোন সাহিত্যের জন্যে বিশেষ সম্পদ।

গোটা উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। নায়েব হরিদাসীর সম্পর্কের উপর যেমন 'বামুনের মেয়ে'র (১৯২২) গোলক ঠাকুর-জ্ঞানদার প্রভাব রয়েছে, তেমনি মতি-সুরমার প্রেমে রয়েছে 'পল্লী-সমাজে'র (১৯১৬) রমেশ-রমার প্রেমের। তবে উভয়ে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সুরমার কাশী গমনের সঙ্গে রমার কাশী গমনের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়েই তার প্রেমিকের কাছে নিজ নিজ প্রতিনিধি রেখে দেশত্যাগ করেছে।

শাহাদাৎ হোসেনের 'পথের দেখা'[৮২] (১৯২৮) মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন সম্পাদিত 'সওগাত'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি অসম্পূর্ণ। তবু পথে কুড়িয়ে-পাওয়া ব্রাহ্মণ তরুণী নীলিমাকে কেন্দ্র করে লেখক যে কাহিনী নির্মাণ করেছেন তা খুবই দুর্বল। নীলিমার সঙ্গে পরিচয়, তাকে অনাথ আশ্রমে ভর্তি করিয়ে দেবার পরও তার প্রতি আকর্ষণ, তার কথা ভুলে যাবার জন্যে মদ্যপান

ইত্যাদি ঘটনাতে নায়কের অপরিণামদর্শী মনোভাবই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো স্ত্রী সোফিয়ার সঙ্গে তার অভিমান। যে শহরে এতকিছু করছে, অথচ নীতি ও যুক্তির যাবতীয় বোঝা স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সে দিব্যি ভালোমানুষটি সেজে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সে হিসেবে তার কোন কাজই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অসম্পূর্ণ বলে এই উপন্যাস সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা যায়না।

সমাজচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে শাহাদাৎ হোসেন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 'খেয়াতরী' উপন্যাসে তিনি মূলতঃ হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'যুগের আলো'র সামাজিক মূল্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতো যদি তাদের এই শুভচিন্তার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতো। গোটা গ্রন্থে একমাত্র মতি ছাড়া আর কোন মুসলমান চরিত্র নেই। অথচ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু নায়েব এবং তার সাহায্যপুষ্ঠ কুটিল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ। রক্ষণশীলতার ক্ষেত্রে কেউ কিন্তু কোন অংশেই কম যায়না। লেখক সেদিকটি এড়িয়ে গেছেন। তালপুকুরের ঘাটে হরিদাসীর ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে গ্রামবাংলার যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা খুবই সুন্দর। জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় ধারণা না থাকলে এমন চিত্রাঙ্কন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

॥ ১৩ ॥

মোহাম্মদ এবরাহিম রচিত 'যোবেদা' (১৯২২) একটি "পারিবারিক উপন্যাস"। জমিদার আলাদ হোসেন ও যোবেদার দাম্পত্যজীবন নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। এই জীবনের ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো চরিত্রের সমাবেশ এবং ঘটনাবিন্যাস উপন্যাসটিকে খানিকটা শিল্প-সৌকর্য প্রদান করেছে। যোবেদাকে অবিশ্বাসিনী ভেবে অসাদ হোসেন কর্তৃক তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দান বা যোবেদার আত্ম-

হত্যা করাকে কোনপ্রকার যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়না। উপরন্তু এমন কিছু ঘটনা এই উপন্যাসে রয়েছে যেগুলো অল্পবেশি অতিপ্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। যোবেদার মৃত্যুর পর মহাপুরুষের আবির্ভাব এবং যোবেদার লাশ স্কন্ধে নিয়ে অন্তর্ধান, দেশী গাছগাছড়ার সঙ্গে কোরআনের বাণী ও দরুদের মাধ্যমে মৃতা যোবেদার পুনর্জীবন লাভ, মহাপুরুষের গুপ্তধণপ্রাপ্তি, অজিতের স্বর্ণহার চুরি করার সময় ব্যাঘ্রের আক্রমণে কৃষ্ণধনের মৃত্যু, স্বপ্নে আসাদ কর্তৃক যোবেদার জীবিত থাকার সংবাদ লাভ ইত্যাদি ঘটনার কোন ব্যাখ্যা নেই। এছাড়া অজিত বিমলার প্রেমের চিত্রে দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিলো। কিন্তু লেখকের একদেশদর্শী মনোভাবের দরুণ তাও ব্যর্থ হয়েছে।

'যোবেদা'র প্রত্যেকটি চরিত্রই অস্ফুট। যোবেদা-ফিরোজা প্রমুখের ভেতর দিয়ে লেখক যেমন সত্য ও সনাতন ধর্মানুভূতির জয় গান করেছেন, তেমনি আসাদ, অজিত (আমজাদ), রমজান ইত্যাদি চরিত্রও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। শেখজী ও রাবেয়া চরিত্রে খানিকটা মানবিক অনুভূতির ছাপ আছে। বিশেষ করে তাদের চরিত্রের যে বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাতে এই অনুভূতি প্রবল, কিন্তু পরিণতি যুক্তিসিদ্ধ নয়। বিশেষতঃ রাবেয়া-চরিত্রটি অতিনাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। ফিরোজার পরিবর্তনের একটা জাগতিক কারণ রয়েছে যা রাবেয়াতে নেই। একটু মনোযোগ প্রদান করলে এটি একটি উৎকৃষ্ট চরিত্রে রূপান্তরিত হতে পারতো। এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা দুর্বল চরিত্র বিমলা। নির্লজ্জের মতো অজিতের কাছে তার আত্মসমর্পণ শুধু মনস্তাত্বিক ত্রুটিপূর্ণই নয়, বরং শিক্ষাবোধবর্জিতও। সেই আত্মসমর্পণে অজিতের ভেতর কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়া বিস্ময়কর হলেও, লেখক সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে বিস্ময়টি অতিক্রম করেছেন। কিন্তু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই মনোভাব অগ্রাহ্য।

'যোবেদা' উপন্যাসের অনেক স্থলেই বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের

বিভিন্ন উপন্যাসের ছাপ রয়েছে। যেমন, মৃত্যুকালে যোবেদার "আমি যাচ্ছি—দু'দিন পরে আপনিও আসবেন, আবার একসঙ্গে মিলিত হয়ে সেই চিরশান্তিময় স্থানে সুখে কালাতিপাত করবো। যেখানে জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, দ্বেষ-হিংসা নেই, রোগ-শোক নেই, জাতিভেদ নেই, সব এক—সব একাকার। সেখানে ভ্রাতৃ-বিরোধ, জ্ঞাতি হিংসা নেই, কুটিলতা নেই—আছে কেবল সুখ-শান্তি-ভালবাসা"[৮২]—জাতীয় উক্তির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখা'র "ডুবে যাও প্রতাপ"—[৮৩] জাতীয় উক্তির তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। অনুরূপ অরণ্য জগতে অবস্থিত মহাপুরুষের আবাসস্থলে যোবেদার রাণীমাতে রূপান্তর এবং অতিথিশালার মাধ্যমে দুঃস্থের সেবাকার্যে নিয়োগের প্রেরণামূল যেমন বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরানী', তেমনি বিমলা কর্তৃক ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রেমিকের করে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে তুলে দিয়ে তাকে সযত্নে রাখার উপদেশ প্রদানের অনুপ্রেরণাও বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা তিলোত্তমা। যোবেদাকে অবিশ্বাসিনী ভেবে তাকে আত্মহত্যার প্ররোচণা শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬) উপন্যাসের সরযূকে আত্মহত্যার প্ররোচণা দানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'যোবেদা' যদিও একটি পারিবারিক উপন্যাস, তথাপি এই উপন্যাসের মাধ্যমে মোহাম্মদ এবরাহিম আগাগোড়াই মুসলিম সমাজ ও ইসলাম ধর্মের জয়গান করেছেন : কখনো এই কাজ করা হয়েছে চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে, কখনো বা লেখক কর্তৃক দীর্ঘ উপদেশাত্মক উক্তির মাধ্যমে। জমিদার মির হোসেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লেখকের দীর্ঘ ধর্মোপদেশমূলক বক্তৃতা, রাবেয়ার শ্বশুর বাড়িতে না যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত উপদেশ, যোগেশ বাবুর সঙ্গে মদ খাওয়া নিয়ে ধর্মানুশাসন প্রচার, গয়লানী নলিনীপ্রসঙ্গে ইসলামধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচার, হিন্দু-মুসলমানের ব্যবহারে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যে পাঠককে অনুরোধ এবং যোগেশ বাবুর বাড়িতে

অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে হিন্দু রমণীর প্রতি লেখকের উপদেশ ইত্যাদি রীতিমত হাস্যকর। এই ক্ষেত্রে লেখক চূড়ান্ত করেছেন যোগেশ বাবুর স্ত্রীর মুখ দিয়ে হিন্দুনারী ও মুসলিমনারীর তুলনামূলক বক্তৃতায়। এই একপেশে মনোভাবের জন্য এই উপন্যাসে তৎকালীন সমাজও তেমন স্পষ্টভাবে পাঠকের চোখে ধরা পড়েনি। মানবপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ধর্মভাব আরোপই তার প্রধান কারণ। উপন্যাসে ব্যবহৃত কোন কোন উপমাতেও এই অনুভূতির ছাপ রয়েছে। যেমন, যোবেদাকে লক্ষ্য করে আসাদের উক্তি—"তুমি আমার প্রতাপে আলী, ঐশ্বর্য্যে সেকেন্দার, বুদ্ধিতে লোকমান"[৮৫], অথবা, "সত্যি মা তুই জান্নাতে খাতুন"[৮৬] অথবা "যেন সাক্ষাৎ জোলেখা"[৮৭] ইত্যাদি। লেখকের সীমিত আরবী-জ্ঞানের প্রমাণ "আলি আল্লা" (আসলে 'আলি আল্লাহ্' হবে), এবং "জান্নাতে খাতুন" (আসলে 'খাতনে জান্নাত' হবে)—জাতীয় শব্দ।

॥ ১৪ ॥

কে. এম. আজহারুল ইসলামের 'আলোকের পথে' (১৯২২) একটি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ধর্ম-বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তুলেছে এবং অবশেষে এই জীবনে নিজেদের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। এই বোধ আবদুল কাদেরকে যেমন একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারার অধিকারী করেছে, তেমনি সন্তানহীনা নুরুলকে মায়ের ভাবৎ স্নেহপ্রীতি তার সতীন জমিলার সন্তানের প্রতি ঢেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

এই উপন্যাসের কোন চরিত্রই পরিস্ফুট নয়। উপরন্তু ধর্মীয় উপদেশমালা উপন্যাসটিতে এত বেশি জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রায়ই তা পাঠকের কাছে বিরক্তিকর ঠেকবে। তবে এর কিঞ্চিৎ সামাজিক মূল্য রয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ এবং সেই

সমাজে ধর্মভাবের প্রাধান্য যেমন পরিস্ফুট, তেমনি তীব্র নীতিবোধও উপন্যাসটিকে পাঠকের কাছে খানিকটা আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে লিখিত মধ্যসমাজাশ্রয়ী প্রায় উপন্যাসেই এই ধর্মভাব লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটির ভাষা দুর্বল, সংলাপ অসংলগ্ন। ফলে পাঠকের পক্ষে কখনো কখনো কাহিনীর ধারাও অস্পষ্ট মনে হয়।

॥ ১৫ ॥

মোহাম্মদ কোরবান আলীর 'মনোয়ারা' (১৯২৩) উপন্যাসের উপজীব্যও ধর্মনির্ভর সমাজ। গোটা উপন্যাসের পটভূমিকা ইরাণের তেহরান শহরের উপর ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু এই পটভূমিকা অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি বঙ্গদেশের আবহের কথা এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হননি। রাখালের গোধন নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন, শামসুল-মনোয়ারার বিয়ে, পুলিশের ব্যবহার, কোর্টের মামলা পরিচালনার দৃশ্য, হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ইত্যাদি পাঠকের মনে বঙ্গদেশেরই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, শামসুল আলম, বদরুজ্জামান, ফয়জুল ইসলাম সওদাগর, মতি, গোলাপী ইত্যাদি নাম বঙ্গদেশেই বেশি প্রচলিত। তবে দেলেরা বা সবিলা নামে নতুনত্ব রয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনী খুবই দুর্বল, কোনচরিত্রই পরিস্ফুট নয়। থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারী, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি দৃশ্যে লেখকের বাস্তববোধের ছাপ থাকলেও তাতে পরিবেশচেতনা একেবারেই নেই। বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও[৮৮] উপন্যাসটিকে সার্থক বলা যায় না। মাঝে মাঝে ধর্মসংক্রান্ত অনুভূতি এমনভাবে প্রকটিত হয়েছে যে, তা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। গোলাপীর ইসলাম ধর্মগ্রহণ অযৌক্তিক হলেও লেখক সেই লোভ সংবরণ করতে পারেননি। তবে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ এবং নারী ও

পুরুষ নির্বিশেষে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুরাগ মোহাম্মদ কোরবান আলীর যুগচেতনার স্বাক্ষরবাহী।

॥ ১৬ ॥

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের আলেখ্যসমৃদ্ধ এম. মনির হোসেনের 'অপরিচিতা' (১৯২৩) প্রথমদিকের মুসলিমরচিত উপন্যাসের ভেতর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপন্যাসটির তাৎপর্য নানামুখী। কারণ তখন বঙ্গের জমিদারকুল 'রায়বাহাদুর' ও 'খানবাহাদুর' উপাধির পদতলে কিভাবে দেশ ও জাতির স্বার্থ বিলিয়ে দিতেন তার চিত্র যেমন এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে, তেমনি এই সদ্যগজিয়ে ওঠা মুসলিম বিত্তশালী সমাজেও কিভাবে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো দেশপ্রেম ও ত্যাগের আদর্শ স্থাপিত হয়েছে তার চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে লেখক নানাপ্রকার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তুলেছেন।

গোটা উপন্যাসে কয়েকটি ধারায় ঘটনাজাল বিস্তৃত হয়েছে। বৃদ্ধ রহিম খাঁ, জামাল খাঁর উপখ্যান,—যার মধ্যমণি আহসান, মহিউদ্দীন-লতিফা—যাদের ঘিরে গড়ে উঠেছে হেনা-আনোয়ার হোসেনের আবর্তসঙ্কুল জীবন, মোহাম্মদালী-মরিয়ম-হোসেন সাহেব —যার মৌল ব্যক্তিত্ব পেয়ারা সাহেব। এই গোটা ঘটনাজালের চতুর্দিকে একটি চরিত্র আবর্তিত হয়েছে—কখনো ধীরেসুস্থে মন্থর-গতিতে, কখনো বা তীব্র বেগে। বলতে গেলে গোটা উপন্যাসের মধ্যমণিই হচ্ছে সেই চরিত্র—তুলিয়া—রহিম খাঁর মৃত কন্যা লুৎফুন্নিসা এবং পেয়ারা সাহেবের কন্যা। গোটা উপন্যাসের পট-ভূমিকা বঙ্গদেশ থেকে সুদূর সিমলা-অযোধ্যা-আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও লেখক কাহিনীটিকে একটি সূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছেন। এই গ্রন্থণায় কোন মৌলিক শিথিলতা চোখে পড়ে না। তবে

মাঝে মধ্যে ঘটনাধারা অস্পষ্টরেখায় পরিণতি লাভ করেছে বলে পাঠককে খানিকটা সচেতন হতে হয় মাত্র। এই অস্পষ্ট ধারা বহুলাংশে পেয়ারা সাহেবের জীবন সম্পর্কেই প্রযোজ্য। পান্নাবাঈর সঙ্গে তার পরিচয়, বঙ্গদেশে আগমন, বৃদ্ধ রহিম খাঁর সংস্পর্শে এসে লুৎফুন্নিসার সাথে পরিণয়, অবশেষে আবারো গৃহত্যাগ এবং পান্না-বাঈর সঙ্গে নতুন করে জীবনারম্ভ—এই গোটা ধারাটি অনুসরণ করতে কখনো কখনো পাঠককে একটু বেশি সচেতন হতে হয়। তবে এতে পাঠক ক্লান্তি অনুভব করেননা, বা তাঁর অপ্রতিহত গতি কোথাও শিথিল হয়না, বরং সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট পথরেখা ধরে তিনি নিপুণ অশ্বারোহীর মতো কাহিনীটি অনুসরণ করেন।

বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে নানাপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নীরিক্ষা 'অপরিচিতা'কে একটি আধুনিক উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। পান্না বেগমের বাঈজী হিসেবে আত্মপ্রকাশ, মোহাম্মদ আলীর শেষ জীবনের যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি, পেয়ারা সাহেবের অকস্মাৎ শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ ইত্যাদি সাদাচোখে দেখে বিশ্লেষণ করা যায়না। এতে কখনো কখনো চরিত্রের অবচেতন মনকে কাজে লাগানো হয়েছে—যা পরবর্তীকালে একেবারেই সুলভ ভাবকল্পে পরিণত হয়েছিলো। এর চূড়ান্ত রূপ লক্ষ্য করা যায় মহিউদ্দীনের 'খানবাহাদুর' উপাধি লাভকে কেন্দ্র করে হেনা-আনোয়ার হোসেনের ব্যবহারে। হেনার এই ভাবের আরোপ লেখকের গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞান-সূচক। পরে একই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেছে আহসানের বিয়ের পর হেনা-তুলিয়ার আচরণে। এখানে লেখক হেনার চরিত্রে যে ভাবই আরোপ করুননা কেন, তুলিয়াকে দুর্বোধ্যই ঠেকেছে। বাবার সঙ্গে তার গৃহত্যাগ এবং অবিলম্বে মাতার আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে গৃহ প্রত্যাবর্তনে তার অবচেতন মনের হাহাকারই ফুটে উঠেছে বেশি—যার একদিকে আহসান, অপরদিকে মাতা আমিনা বেগম। লেখক সর্বাপেক্ষা সংযমের পরিচয় প্রদান করেছেন আনোয়ার-তুলিয়ার

প্রেমের চিত্র অঙ্কনে। সন্ত্রাসবাদী ও স্বদেশী আনোয়ার যে কোন অবস্থাতেই নগ্নভাবে একজন নারীর পদে লীন হতে পারেনা একথা তিনি বরাবরই মনে রেখেছিলেন। এই কারণেই পরিচয়ের পর আনোয়ারের হঠাৎ অন্তর্ধান গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফুলিয়া। লেখক এই চরিত্রটিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। কখনো সে চপলমতি বালিকা, কখনো আমিনা বেগমের ক্রীড়াসঙ্গিনী হিসেবে একজন পরিণত বয়স্কা নারী। আহসানকে সে ভালোবাসে বটে, কিন্তু তার কোন চক্ষুগ্রাহ্য রূপ নেই। ফুলিয়া কি আহসানকে সত্যি ভালোবাসতো? এই প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল। আমিনা এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আহসানের বিয়ের দিন তাকে নিয়ে অযোধ্যা চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু লেখক কখনো ফুলিয়ার মনোভাব পাঠকের কাছে নগ্নরূপে তুলে ধরেননি। এই কারণে শেষের দিকে আহসানের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা ও চলাফেরা থেকে কোন অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করা যায় না। যেকোন সাধারণ লেখক হলে এই সম্পর্ক বিশ্লেষণের নামে একটি দৃশ্য সৃষ্টি করতেনই। কিন্তু এম. মনির হোসেন এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই পর্বের যবনিকা নামিয়ে দিয়েছেন যে, পাঠককে বাধ্য হয়ে ভাবতে হয়েছে, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে'। ফুলিয়ার স্নেহকাঙাল অস্তিত্ব প্রথমে বিকশিত হয়েছে বৃদ্ধ রহিম খাঁকে কেন্দ্র করে, শেষে সে স্থান লাভ করেছে নিঃসন্তান আমিনা বেগমের শূণ্য হৃদয়ে, অবশেষে সে তার অবস্থান খুঁজে পেয়েছে আনোয়ারের কাছে—যা দেশ ও জাতির স্বার্থচিন্তায় ইতোমধ্যেই যথেষ্ট স্ফীত ও প্রশস্ত হয়েছে।

আমিনা বেগমের চরিত্রও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্তানহারা আমিনাবেগমের অন্তস্তল ছিলো বেদনাজর্জ্জর—যেখানে নিয়ত দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হতো উত্তপ্ত মরুভূমির শুন্যতাজুড়ে গুমরেওঠা দিগন্ত-বিস্তৃত হাহাকারের মতো। সেই তপ্ত হৃদয় অবশেষে মাতৃত্বের স্বাদ

পেলো ছলিয়াকে কেন্দ্র করে। তাই তিনি নিজেকে ছলিয়ার মঙ্গলাকাঙ্খায় বিলিয়ে দিলেন, নিমজ্জমান ব্যক্তির খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টার মতো। অবশেষে যখন সেই অবলম্বনও খসে পড়লো, তখনি তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করলেন। এত বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্র এই উপন্যাসে আর নেই। ছলিয়ার সঙ্গে আচরণে তিনি যেমন শিশুর মতো সরল ও সহজ, স্বামী জামাল খাঁর সঙ্গে আচরণে তেমনি গম্ভীর ও বুদ্ধিদীপ্ত। মোক্ষদা চরিত্রের মাধ্যমে লেখক প্রচুর বাৎসল্যরস পরিবেশন করেছেন—যা কখনো কখনো পাঠককে অভিভূত করে। সংস্কারের প্রতি তার মজ্জাগত আকর্ষণ এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনের জয়গান পরস্পরবিরোধী হলেও সংস্থাপনে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। হেনা-চরিত্রে লেখক কখনো কখনো মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন।

পুরুষচরিত্রের ভেতর সর্বাধিক সার্থক পেয়ারা সাহেব। একটা ছর্ভেদ্য বিষণ্ণতা আগাগোড়াই এই চরিত্রকে ঘিরে রেখেছে। লেখক প্রথম দর্শনেই তার আভাস প্রদান করেছেন। রহিম খাঁর সেবায় থাকা অবধি তার চরিত্রের যে রূপ লক্ষ্য করা গেছে পরবর্তীকালে আর সেরূপ থাকেনি। পেয়ারা কিসের আকর্ষণে সিমলা-আগ্রা-অযোধ্যা-বঙ্গদেশ ঘুরে বেড়িয়েছে? সেও এক তীব্র হাহাকার ও যন্ত্রণার বহিপ্রকাশ। প্রথম যৌবনে সে পত্নীহারা হয়েও কন্যা ছলিয়াকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলেছিলো জামাল খাঁর এক আঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। তারপর থেকে সেই ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের স্মৃতি বহন করে বাত্যাতাড়িত তৃণখণ্ডের মতো সে সমগ্র ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছে। সুখ সে পায়নি। কারণ তার সুখের একদিকে পান্নাবাঈ, অপরদিকে লুৎফুন্নিসা, তার মধ্যস্থলে ছলিয়া। সেদিক দিয়ে চরিত্রটিকে একটি ট্রাজিক-চরিত্র আখ্যায়িত করা যায় —যার জ্বালা নেভানোর সাধ্য পান্নাবাঈর নেই। পান্নাবাঈর সরব আর্তনাদ তার প্রমাণ। মহিউদ্দীন চরিত্রেও লেখক ব্যাপক সার্থকতা

প্রদর্শন করেছেন। সরকারের খয়ের খা ডাক্তার একদিকে যেমন সরকারী 'খানবাহাদুর' যেভাবে আনন্দিত ও কৃতার্থ, তেমনি তাঁর অন্তরে অধিষ্ঠিত ধ্যানমগ্ন পিতৃরূপের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত। তাঁর ছেলে এই খেতাব ঘৃণা করে বলে গৃহত্যাগ করেছে, এই ব্যথা মহিউদ্দীনকে কতদূর পীড়িত করেছে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা, স্বাভাবিক গতিতে পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এই পিতৃস্নেহের কষাঘাতেই তাঁর জীবনে নেমে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। আনোয়ার হোসেন যদিও এই উপন্যাসের নায়ক, তথাপি চরিত্রটি গতানুগতিক। তবে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি আনোয়ার হোসেনকে তার নিজস্ব ছকে ফেলে অবলোকন করলে তার ভেতর কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বেই।

মনির হোসেনের ভাষা সহজ ও সরল এবং কখনো কখনো আবেগপূর্ণ। কাহিনীর গতিধারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে এবং উপলখণ্ডবাহিত জলধারার মতো স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে গেছে। এমন বাগচাতুর্য ও সংযম মুসলমানদের ভেতর তো দূরের কথা, হিন্দুদের ভেতরও খুব বেশি দেখা যায় না। কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত হলো :

> "এই যে কারণে অকারণে ভাই সাহেবকে ব্যস্ত করিয়া তোলা, সময়ে অসময়ে মামীমাকে জড়াইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ইহা যে বুকভরা বেদনার কথা ঢাকিয়া রাখিবার ব্যর্থপ্রয়াস আহসান একথা আজ পরিষ্কার বুঝিতে পারিল।"[৮৯]

অথবা

> "উদ্ভিন্নযৌবনা পান্নাবাই যখন তাহার একরাশ রূপের বোঝা লইয়া স্রোতের তৃণের মত ইতস্তত: ভাসিতে ভাসিতে কোন এক লম্পটের হস্তে একদিন অপমানিতা হইল, সেইদিন তাহাকে জগতের সামনে এমন করিয়া নিঃসহায় করিবার কোন্ অধিকার মোহাম্মদালীর ছিল তাহার জবাব

লইবার জন্য পান্নাবাঈ আর একবার পিতার নিকট সিমলা ফিরিয়া আসিল।"[৯০]

অথবা, "দুর্ব্বল আহসান শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়ার্ত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া আজ মোক্ষদা সুন্দরীর স্নেহ দৃষ্টির তলে নিজের রক্তাক্ত ক্ষত হৃদয়খানি মেলিয়া ধরিল।"[৯১]

অথবা, "অশ্রুজল সিক্ত করিয়া দয়িতের উদ্দেশ্যে প্রেম অর্ঘ দান করিবার জন্য সে নিজহস্তে যে পুষ্প চয়ন করিয়াছিল আহসানের স্পর্শ পুলকে অবসন্ন হেনার বসনাঞ্চল হইতে ঝুর ঝুর করিয়া সে ফুল মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া প্রেমিক দম্পতীর জন্য যেন পুষ্পশয়ন রচনা করিয়া দিল।"[৯২]

উপন্যাসখানির রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯২০ সালে উপন্যাসখানি লিখিত হয়। সমগ্র ভারতে খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা তখনো স্তিমিত হয়নি। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। অহিংস ও সহিংস অন্দোলনের বাগবিতণ্ডা তখনো চলে আসছিলো সমানে। লেখক এই উপন্যাসে গোটা রাজনৈতিক আন্দোলনটিকে তুলে ধরেছেন। একদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে আনোয়ার-সুরেশকে কেন্দ্র করে সেদিনের সহিংস-অহিংস বিরোধ উপরন্তু এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণমানসে যে চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিলো তার চিত্রও যথাযথ বিধৃত হয়েছে পশ্চিমা সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার মহিউদ্দীন খানের খদ্দর পরিধান করে স্বদেশীতে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, সেদিন ব্যায়ামের আখড়ার নামে যেসব গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি গড়ে উঠেছিলো তার চিত্রও উপন্যাসটিতে ধরা পড়েছে।

এছাড়া এই গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের চিত্রও ফুটে উঠেছে।

চালানী ব্যবসায়ী রহিম খাঁর জমিদারে রূপান্তর শুধু এই উপন্যাসের কাহিনী নয়—বঙ্গদেশে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ এবং তার ক্রমপরিণতির ইতিহাসও বটে। এসব জমিদার, জোতদার এবং ইংরেজের গা-চাটা আমলারাই যে বিভিন্ন পদবির মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়ে ইংরেজের জয়গান করে এসেছেন তার একটি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'নর্থব্রুক হলে'র নিয়মিত আড্ডা এবং মহিউদ্দীন সাহেবের 'খানবাহাদুর' খেতাবপ্রাপ্তির আনন্দোৎসবের ভেতর। গভীর অভিজ্ঞতা ছাড়া যে এজাতীয় চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাধিজর্জরিত তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নানাপ্রকার ত্রুটি, শোষণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের আমোদঅহ্লাদ ও রূপচর্চার রঙীন চিত্র। অভিজাতশ্রেণীর ভেতর সঙ্গীতের সমাদর ছিলো এই সত্যও লেখক তুলে ধরেছেন।

এজাতীয় উপন্যাস সেদিন বাঙলা সাহিত্যে ছিলোনা।

॥ ১৭ ॥

আবদুল মালেক চৌধুরীর 'স্বপ্নের ঘোর' (১৯২২) একটি "সচিত্র খাসিয়া সামাজিক উপন্যাস।" এই উপন্যাসে চৌধুরী সাহেব অবিভক্ত ভারতের আসামের খাসিয়াদের জীবনযাত্রা এবং তাদের অন্তরের আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন, একটা অসম প্রেম কাহিনীর মাধ্যমে। কাহিনীটি একেবারেই ক্ষুদ্র। মুসলিম যুবক আফতাব, কাতিউ নাম্নী জনৈকা খাসিয়া যুবতীর প্রেমে পড়ে তাকে বিধিসম্মত-ভাবে বিয়ে করে। কিন্তু পরে পারিবারিক আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য তাকে সাময়িকভাবে আবারো অন্যত্র বিয়ে করতে হয় এবং সেই একই কারণে সে তিউকে পরিত্যাগ করে। এই ক্ষুদ্র কাহিনীটি নির্দ্বন্দ্ব গতিতে এগিয়ে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। সে হিসেবে 'স্বপ্নের ঘোর'কে সার্থক উপন্যাসও বলা যায়না। দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপ কখনো কখনো বিরক্তিকর মনে হয়। সংলাপ জুড়ে

রয়েছে শুধু স্থূল প্রেমালাপ।

'স্বপ্নের ঘোরের' কোন চরিত্রই যথাযথ পরিস্ফুট নয়। আফতাব -চরিত্রে আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। বিশেষতঃ এই ছাপ ফুটে উঠেছে তার ছড়ি এবং 'আনোয়ার পাশা' টুপির মাধ্যমে। এই আভিজাত্যই তার জীবনে কাল হলো। সে এমন দুর্বলচেতা পুরুষ যে, যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো তার জন্যে কোন ত্যাগই স্বীকার করতে পারলোনা। অবশেষে ত্যাগ স্বীকারের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলো একটি অবলা বালিকার উপর। এছাড়া আর যেসব পুরুষ-চরিত্র রয়েছে সেগুলোও তেমন ফুটে ওঠেনি।

সে তুলনায় খাসিয়া রমণীদের চিত্র যথেষ্ট শিল্পসম্মত। অবশ্য খাসিয়াদের তুলনায় চরিত্রগুলো অনেক বেশী আধুনিক বলে মনে হয়—যা তাদের চালচলন, কথাবার্তা, আচারব্যবহারে পরিস্ফুট। সে হিসেবে চরিত্রগুলোর বাস্তব ভিত্তি নিরূপণ করা মুসকিল। তিউ চরিত্রটি গতানুগতিক। খাসিয়া রমণীদের মতো সেও অনেকের লুব্ধদৃষ্টির শিকার হয়েছিলো। কিন্তু অবশেষে সে আফতাবকেই পতিত্বে বরণ করেছে। তার চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এমনকি আফতাব দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাবার সময়ও নয়, তার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েও নয়। এছাড়া এলিসা, কাশেল জাতীয় নারীর চরিত্রও দ্বন্দ্ববিবর্জিত। এই উপন্যাসে কোন খাসিয়া পুরুষের চরিত্র নেই।

'স্বপ্নের ঘোর' উপন্যাসের সামাজিক মূল্য রয়েছে। তবে খাসিয়াদের যে সমাজ এই উপন্যাসে বিবৃত তা কতদূর বাস্তব বলা মুসকিল। তাদের ঘরের আসবাবপত্র, চা খাওয়ার এত ঘটা, চাল-চলন ও কথাবার্তা সবই তুলনামূলকভাবে আধুনিক। এত আধুনিক যে সেকালে সাধারণ গ্রামেও বোধ হয় এমনটি ছিলোনা—কোন উপজাতীয় অঞ্চল তো দূরের কথা! লেখক সম্ভবতঃ নিজস্ব ধ্যান ধারণা আরোপ করে চরিত্র ও পরিবেশ নির্মাণ করেছেন। তবে

উপজাতীয় রমণীদের প্রতি সভ্যতাগর্বী আধুনিক জগতের চিরন্তন আকর্ষণের চিত্র এই উপন্যাসে খানিকটা ফুটে উঠেছে। সমকালীন মুসলিম সমাজচিত্র অঙ্কনে তিনি তুলনামূলকভাবে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। পারিবারিক রক্ষণশীলতার কাছে আত্মসমর্পণ আফতাবের জন্যে যত কাপুরুষতাই হোকনা কেন, এতদ্বারা মুসলিম সমাজের আভিজাত্যবোধ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

॥ ১৮ ॥

নুরন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য সরস্বতীর (১৮৯৪-১৯৭৫) দুখানা সামাজিক উপন্যাস বেশ সার্থক। তিনি প্রথম মহিলা যিনি উপন্যাস রচনা করলেন।[৯৩]

নুরন্নেছা খাতুনের 'স্বপ্নদৃষ্টা' (১৯২৩) একটি "পারিবারিক উপন্যাস।" উকিল আনোয়ার আলীর স্ত্রীবিয়োগের পর সে একদিন স্বপ্নে দেখতে পায়, তার স্ত্রী একজন মহিলাকে দেখিয়ে তাকে বিয়ে করতে বলছে। এই মহিলা তারই বন্ধু আহমদ হোসেনের শ্যালিকা। এই বিয়ে উপলক্ষ্যে যেসব বাধাবিপত্তি আসে তারই উপর ভিত্তি করে উপন্যাসখানা রচিত। উপন্যাসের কাহিনী মোটামুটি সুবিন্যস্ত। একমাত্র ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ ছাড়া বাকিটুকু বেশ স্বচ্ছন্দ পাঠ করা যায়। ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে এই অংশ বেশ উপাদেয় হলেও, উপন্যাসের এমন এক জটিল মুহূর্তে এজাতীয় বর্ণনা বিরক্তি উৎপাদন করে। স্বপ্নদর্শনের দৃশ্যটি যদিও অস্বাভাবিক, তবু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চরিত্রগুলো যথাযথ ফুটে উঠেছে। মোমেনা এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। লেখিকা এই নারীর ভেতর যথার্থ প্রাণসঞ্চারে সক্ষম হয়েছেন। রশীদার সঙ্গে আনোয়ারের বিয়ের প্রস্তাবে স্বামীর প্রভাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মাতাপিতার আপত্তিতে যুক্তির অন্বেষণে একজন সাধারণ নারীর ছাপ কারো দৃষ্টি এড়ায়না।

স্বামীর সঙ্গে সংলাপ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে তার আচরণ চরিত্রটিকে একেবারে রক্তমাংসের মানবীতে পরিণত করেছে। এছাড়া আনোয়ার আলি চরিত্রটিও লেখিকা বেশ যত্ন সহকারে অঙ্কন করেছেন তার একদিকে মৃতা স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে নতুনভাবে জীবন গড়ার স্বপ্ন সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ডাক্তার আহমদ হোসেনের চরিত্র বৈশাদৃশ্যপূর্ণ। সে উচ্চশিক্ষিত ও উদার প্রকৃতির লোক। অথচ শ্যালিকার বিয়ের ব্যাপারে তার শ্বশুর-শ্বাশুরীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় স্ত্রীকে শুদ্ধ ত্যাগ করে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক। এই উপন্যাসের বড় দুর্বলতা হলো, মোমেনার বোন রশীদার মনোভাব নেপথ্যে রাখা। ভগ্নিপতির সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণটি খুবই বাস্তবসম্মত। কিন্তু তার বিয়ের ব্যাপারে এত তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার ভেতর কোন প্রতিক্রিয়া নেই, একি করে সম্ভব?

যে অলীক স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে 'স্বপ্নদৃষ্টা' উপন্যাস রচিত, ঠিক একই অলীক বক্তব্য রাখা হয়েছে তাঁর 'আত্মদান' (১৯২৫) উপন্যাসে। লেখিকা এটিকে "সত্য ঘটনামূলক গার্হস্থ্য কথন" বলে উল্লেখ করেছেন—যদিও এজাতীয় ঘটনায় কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। তবে কাহিনী নির্মাণ, পরিবেশ রচনা এবং ঘটনায় যথাযথ অভিজ্ঞতা বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এটিকে একটি উৎকৃষ্ট রচনা বলতেই হবে। 'স্বপ্নদৃষ্টা' উপন্যাসে যেখানে গোটা কাহিনীতে পুরুষ-চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, সেখানে 'আত্মদানে' প্রাধান্য পেয়েছে নারীচরিত্র। খোরশেদ আলি নামে জনৈক মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর সুখের সংসার কিভাবে তার মৃত্যুর পর তারই নিকটতম আত্মীয়দের চক্রান্তে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছুনো সেই চিত্রই এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরে লেখিকার অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। খোরশেদ আলির মৃত্যুশয্যায় তার আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া, খোরশেদের লাশ

নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির ভেতরের ক্রন্দন-দৃশ্য, জেরিনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তার পিতার প্রচেষ্টা ইত্যাদি যেন ফটোগ্রাফের সাহায্যে দৈনন্দিন জীবন থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। মানুষ কিভাবে প্রতিদিনকার শোক অতিক্রম করে বেঁচে থাকে এবং তার ভেতরও ধৈর্যসহকারে নিজে মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে লেখিকা তা-ই দক্ষতার সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন। খোরশেদ আলির মৃত্যুর পর তার ভাইদের আচরণও যুক্তিসঙ্গত। হাসিনার পরিণতি যত অবাস্তব ও ভিত্তিহীন হোক না কেন, পাঠকের ভেতর নাড়া দেয়।

এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র জেরিনা—মৃত খোরশেদ আলির স্ত্রী। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, শোকে-সান্ত্বনায় এই নারী মানবজীবনের আদর্শস্থানীয়া। স্বামীর জীবদ্দশায় সে সর্বদা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখেছে। কিন্তু যে তত্ত্বাবধানের অভাবে তার স্বামীর মৃত্যু হলো তার অনুভূতিও তাকে কম বিচলিত করেননি। জেরিনা চরিত্র সর্বাধিক ফুটে উঠেছে খোরশেদ আলির মৃত্যুর পর। একদিকে তাকে তার অনাথ সন্তানদের অসহায় পক্ষীশাবকের মতো নিজের বুকে আঁকড়ে রাখতে হয়েছে, অন্যদিকে তার কুটীল দেবরদের নানা-প্রকার চক্রান্তজাল ছিন্ন করতে হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য অসহায় ও শক্তিহীন মানুষের মতো তাকেও যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে নীরবে সরে পড়তে হয়েছে। অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসিনী নুরন্নেছা খাতুন জেরিনার পরিণাম অঙ্কন করতে গিয়ে কোনপ্রকার অদৃশ্যশক্তিকে তার পক্ষে নিয়োগ করেননি। এই পর্যায়ে তাঁর বাস্তবতাবোধ একজন দক্ষ শিল্পীর সমতুল্য।

নুরন্নেছা খাতুন এই উপন্যাসদ্বয়ে যথেষ্ট সমাজসচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন মুসলিম পারিবারিক জীবনে যে আধুনিকতা সেদিন দুর্লভ ছিলো লেখিকা তাঁর উপন্যাসে তারই আভাস প্রদান করেছেন।[১৪] সমাজে বসবাসকারী মানুষের বর্ণপরিচয়, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, মুসলিম সমাজে অবরোধ প্রথা, নানাপ্রকার

কুসংস্কার ইত্যাদি যেমন রয়েছে, তেমনি রথদেখা এবং হিন্দুসমাজে কনে দেখা নিয়ে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে তাঁর সঙ্কীর্ণতার ছাপও রয়েছে। হরতনের মামলায় 'স্বপ্নদৃষ্টা'র নায়ক আনোয়ার আলি কর্তৃক আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়ে সরকার পক্ষের জেরা করার দৃশ্যে তাঁর রাজনীতি-চেতনার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

নুরন্নেহা খাতুন 'ভাগ্যচক্র,' 'বিধিলিপি' ও 'নিয়তি' নামে তিনখানা উপাখ্যান রচনা করেছেন। এর ভেতর 'ভাগ্যচক্র' ও 'বিধিলিপি'তে যথাক্রমে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার এবং বিধবা বিবাহকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই উপাখ্যানত্রয়কে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা যায়না। এগুলো আসলে বড়গল্প।

॥ ১৯ ॥

মোহাম্মদ রহমতউল্লার 'সফুরার পরিণাম' (১৯২৬) একটি "সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস।" কাহিনীটি গতানুগতিক। কোনপ্রকার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য এর কোথাও চোখে পড়েনা। সম্ভবতঃ উপন্যাসখানি "সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসুত" নয়[৯৫] বলেই এতে কোন জটজটিলতা নেই। চরিত্রগুলোও ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি। 'সফুরার পরিণাম' বলতে লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন? এই পরিণাম এত স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য যে, এর জন্যে কাউকে দায়ী করা যায়না —না নিয়তিকে, না কোন বিশেষ ব্যক্তিকে। সফুরার স্বামীর সঙ্গে তার ভাই আবদুল মতিন বিশ্বাসের কথিত মতভেদটি যদি আরো স্পষ্ট হতো তাহলে এই নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেতো।

উপন্যাসের কোন চরিত্রই যথাযথ ফুটে ওঠেনি। উপরন্তু সতীনের ব্যাপারে ঔদার্য এবং বহুবিবাহের গুণগান, ধর্মব্যাখ্যা, দরিদ্রের প্রতি দয় প্রসঙ্গে কোরআন ও হাদিসের অনুশাসন বর্ণনা, রমণীদের পতিভক্তি প্রসঙ্গে অধ্যায়ব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় ভাবধারা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজপাঠের

ফজিলত বর্ণনা, হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদের নিন্দা ইত্যাদি শুধু উপন্যাসের শৈল্পিক মূল্যই ক্ষুণ্ণ করেনি, পাঠকের বিরক্তি উৎপাদকও বটে। এজাতীয় উক্তি শুধু ধর্মগ্রন্থেই মানায়। উপরন্তু সফুরার খাসি সদকা দেওয়ার পর থেকে বহুরাণীর রোগ নিরাময়ের সূচনা অযৌক্তিক এবং তা অন্ধবিশ্বাসের সমতুল্য।

তবে লেখকের সমাজ ও পরিবেশচেতনা প্রশংসনীয়। গ্রামের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা, যতিন বিশ্বাসের পিতা আমির আলি বিশ্বাসের আর্থিক ভিত্তি, স্ত্রীকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃবিরোধ, সফুরার অবয়ব ইত্যাদি বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি গভীর জীবনবোধের পরিচয় প্রদান করেছেন। গোটা উপাখ্যানে তাঁর গভীর ধর্মবোধের পরিচয় থাকলেও মৃতস্ত্রীকে গোসল করানো তো দূরের কথা তার মুখদর্শনও যে শরিয়ত মতো নিষিদ্ধ তা তিনি জানেন না।

মোহাম্মদ রহমতউল্লার ভাষা দুর্বল। কখনো কখনো অশুদ্ধ বাক্যও চোখে পড়ে—যা লেখকের বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে।

॥ ২০ ॥

মোহাম্মদ শাহজাহানের 'নিমক-হারাম'ও (১৯২৪) একটি "সামাজিক উপন্যাস"। সমসাময়িক কালের মুসলমানদের লিখিত অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় উপন্যাসটির একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। লেখক ক্ষুদ্র পরিবারে একটি বৃহৎ পটভূমিকা চয়ন করেছেন এবং তাকে কেন্দ্রমুখী করে বিচিত্র রঙে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী গতানুগতিক। দরিদ্র কৃষক বছিরদ্দি তার ছোট ভাই শাহাদৎকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছে। কিন্তু কর্মময় জীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসা, স্বার্থপরতা ও কুটিলতার জন্যে শাহাদৎ তার ভাইকে অস্বীকার করে তার ত্যাগের কথা বিস্মৃত হওয়ার মাধ্যমে। ফলে শেষ জীবনে বছিরুদ্দিকে অসীম দুঃখকষ্টের ভেতর মৃত্যুবরণ করতে হয়। লেখক কাহিনীতে কোন প্রকার অহেতুক জট যেমন সৃষ্টি করেননি, তেমনি কোন প্রকার শিথিলতাও প্রদর্শন করেননি।

ফলে উপন্যাসটি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে গেছে গ্রাম ও শহরকে তিনি পরিপূর্ণভাবে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে একটা বিশেষ যুগজিজ্ঞাসা এই উপন্যাসের সর্বত্র পরিস্ফুট।

চরিত্রচিত্রণেও মোহাম্মদ শাহজাহান কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। বছিরদ্দির বুকভরা আশা এবং তার সমূলবিচ্ছিন্নতা, আবদুল মজিদ খাঁর স্নেহপরায়ণতা এবং সকৃতজ্ঞ অভিব্যক্তি, ডাক্তার আমির হোসেনের আপনভোলা ও পরোপকারী মানসিকতা, আবদুল করিমের স্নেহবাৎসল্য, আবদুল হামিদের ভেতরকার আধুনিক সনাতন জীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব সবই লেখক দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক শাহাদৎ হোসেন। লেখক অশেষ দরদ দিয়ে চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। শৈশবের ভ্রাতৃপ্রীতি কিভাবে ধীরে ধীরে ভিন্নধর্মী পরিবেশের প্রভাবে বিলীন হতে থাকলো তার একটি জাজ্বল্যমান চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কারণে তার অন্তরের অতৃপ্তি ও জ্বালা সহজেই পাঠকের চোখে পড়ে এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্ব পাঠককে অভিভূত করে তোলে। তার বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তক্ষরণ যাঁর চোখে পড়েছে একমাত্র তিনিই উপন্যাসের শেষ দৃশ্য অনুধাবন করতে পারবেন। শাহাদৎ-চরিত্রের আরেকটি বিশেষত্ব লেখক তার প্রেমের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করেছেন। সে আমেনাকে যখন ভালোবাসতো তখন ভালোবাসা তার কাছে শখের ব্যাপার, উপলব্ধি নয়। যখন তার ভেতর উপলব্ধির সূচনা হলো তখন তার সামনে এসে পৌঁছুলো মরিয়ম—আমেনা নয়। লেখক এই চরিত্র অঙ্কনের সময় বিশেষ সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

নারী-চরিত্রের ভেতর সর্বাধিক সার্থক হলো বড়-বৌ—বছিরদ্দির স্ত্রী। এই চরিত্রকে গ্রাম বাঙলার একটি নিখুঁত ছবিও আখ্যা দেওয়া যায়। শাহাদৎকে কেন্দ্র করে সে যে আকুলতা ও স্নেহ-পরায়ণতা প্রকাশ করেছে তা তো আসলে মাতৃত্বেরই অভিনয়—সন্তানহীন জননীর সেই চিরকালীন অভিব্যক্তি। লেখক এই

চরিত্রে কোন প্রকার জটিল দ্বন্দ্ব আরোপ না করে বাস্তববোধেরই পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি আগাগোড়াই চরিত্রটিকে অসীম ধৈর্যসহকারে অনুসরণ করেছেন।

আমেনা ও মরিয়ম পরস্পর বিরোধী ধ্যান ধারণার অভিব্যক্তি। আমেনা যেখানে ধর্মনির্ভর জীবনের সরলতাকে সহজাত বলে গ্রহণ করেছে, যেখানে মরিয়ম অতিআধুনিকতার মোহে আবিষ্ট হয়ে সেই মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলছে। ফলে চরিত্র-দ্বয়ের দ্বন্দ্বে মূলত: সেদিনের সামাজিক অবস্থাটাই ফুটে উঠেছে। তবে নামাজ ও ধর্মকর্মসংক্রান্ত বিতর্কের মাধ্যমে আমেনা-চরিত্রটিকে একটা আইডিয়া হিসেবে দেখিয়ে যেমন খেলো করে ফেলেছেন, তেমনি মরিয়মের ভেতর একটা উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করে লেখক তার ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতাকে পাঠকের সামনে নগ্ন করে তুলেছেন। লেখক উভয়ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করেছেন। বিয়ের ছমাস পর ন'মাসের সন্তান হওয়া তেমন অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু বিয়ের দিন যেখানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা অনেকে সাজিয়ে দেয়, সেখানে নিজেই সাজগোজ করে বের হওয়া শুধু অবাস্তব নয়, অসম্ভবও বটে। তবে মরিয়ম কর্তৃক আমেনার ভেতর ঈর্ষানল জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রাণান্তকর প্রয়াসের একটা মন-স্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

মোহাম্মদ শাহজাহানের ভাষা সহজ ও সরল। উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু উপমা লেখকের শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। যথা :

"কলোরাফরমে এলাইয়া যাওয়া রোগীর মত নিস্পন্দ"[৯৬]

অথবা "বাসন্তী পূর্ণিমার জোছনার ন্যায় অমেনা স্নিগ্ধময়ী আর মরিয়ম প্রখর রৌদ্রদীপ্তির ন্যায় তীব্র মাদকতায় পূর্ণ।"[৯৭]

অথবা, কত যাত্রী নামিল, কত উঠিল, পুরাতনকে ফেলিয়া নূতনকে লইয়া ব্যভিচারিণীর ন্যায় গর্ব্বিতভরে বাষ্পযান চলিয়া গেল।"[৯৮]

অথবা "সহসা কক্ষচ্যুত উল্কার মত আমেনার মন অজ্ঞাত হামিদের হৃদয়কক্ষে ছুটিয়া গেল।"[৯৯]

অথবা "বড় বৌর যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ভাটাপড়া নদীর মত জোয়ারের রেখা ছিল তাহার বিনম্র মুখের স্বর্গীয় আভায়।"[১০০]

অথবা, "বছিরদ্দির অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত একটা মর্ম্মান্তিক যাতনা অহর্নিশি ধূমায়মান হচ্ছে।"[১০১]

অথবা, "যেন তীরবিদ্ধ মৃগ তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা লুকাইয়া লইতেছে।"[১০২]

অথবা "মৃতের দিকে চাহিতে তাহার মনে হইল যেন একটা স্তুপাকার শোকের তীব্র আর্ত্তনাদ নিস্পন্দ শয্যায় লুটিয়ে পড়ল।"[১০৩]

এই উপন্যাসে মোহাম্মদ শাহজাহান সেদিনকার একটা বিশেষ চিত্র—প্রগতিবাদের সঙ্গে রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব—পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই দ্বন্দ্বে লেখক রক্ষণশীলতার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। লেখকের এই পক্ষাবলম্বন কখনো কখনো তাঁর শিক্ষাবোধকেও বিচলিত করেছে। আমেনা ও মরিয়ম চরিত্রে এই বিচলন সর্বাধিক চক্ষুগ্রাহ্য। তাই শাহাদতের ভ্রাতৃবিমুখতাও এই বিরোধের ফল বলে মনে হয়।

গোলাম মোস্তফা একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে লেখককে উৎসাহিত করেছেন।

॥ ২১ ॥

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বাঙালী মুসলীম নারীজাগরণের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। পরিবেশের বিপরীত স্রোতে সাঁতার কেটেও আপন অধ্যাবসায় ও শুভইচ্ছার প্রবল শক্তিতে ভর দিতে পারলে কুল পাওয়া যায়, বেগম রোকেয়া তার প্রমাণ। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য বাঙালী মুসলীম নারীসমাজের

জাগরণ। এরজন্যে একদিকে তিনি নানাপ্রকার সভাসমিতি গঠন করেছেন, অন্যদিকে চালিয়েছেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনী—যার মুখনিঃসৃত বাণী দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

বহু গল্প, প্রবন্ধ ও রসরচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি 'পদ্মরাগ'(১৯২৪) নামে একখানা উপন্যাসও রচনা করেছেন। অন্যান্য রচনার মতো উপন্যাসেও তিনি নারীজাগরণকেই প্রধান উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতে তিনি মূলতঃ তিনটি প্রধান ধারায় নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন : (১) জনহিতকর কাজ, (২) বৈবাহিক জীবন, (৩) নারীর সার্বভৌম অধিকার। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকার ভেতর বেগম রোকেয়া যুগপৎ এই তিনটি বিষয়ই স্থাপন করেছেন—যা তাঁর ধ্যান ও স্বপ্নই শুধু নয়, বিশ্বাসও।

'পদ্মরাগে'র কাহিনীতে কোনপ্রকার জটিলতা নেই, তবে কাহিনীটি দ্বন্দ্বমধুর। এতে যেসব চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাদের নিজস্ব এক-একখানা কাহিনী রয়েছে। অনেকে নানাভাবে নির্যাতিতা হয়ে অবশেষে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং 'তারিণী-ভবনে' এসে আশ্রয় পেয়েছে। এদের সম্পর্কে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ছিলো। "বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধা থাকিতে হইবে, বিনা কারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত-পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উলঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে,"[১০৪]—ইত্যাদি। এদের ভেতর সিদ্দিকাও ছিলো। এই চরিত্রের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া তাঁর ধ্যানের নারীশক্তি অবলোকন করেছেন। সে বিবাহিতা। কিন্তু কোন এক সময় তার স্বামী লতিফ, তার চাচার প্ররোচণায় সম্পত্তির লোভে সিদ্দিকাকে পরিত্যাগ করেছিলো। সিদ্দিকা তার তেজস্বী ভ্রাতার অনুপ্রেরণায় এই ত্যাগকে অস্বীকার করে স্বাবলম্বী হয়েছে। কিন্তু লতিফ পুনর্বার

বিয়ে করায় তার অন্তরের নারীত্বে ঘা লেগেছে বলে সে অবশেষে অবলীলায় লতিফকে পরিত্যাগ করে তার সার্বভৌম সত্তাকে উঁচিয়ে ধরতে পেরেছে। প্রবল দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাতের ভেতর এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। লতিফ যেভাবে সিদ্দিকাকে আকর্ষণ করেছে এবং পরিবেশকেও তার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছে, তাতে সিদ্দিকার পতন একপ্রকার অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো। কারণ আমাদের পাঠকরা সে জাতীয় পতনশীল পরিণতি দেখতে অভ্যস্থ। কিন্তু বেগম রোকেয়া অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কাহিনীর রাশ টেনে ধরেছেন এবং অতি পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। তাদের ভেতর বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে, হয়েছে শ্রেয়প্রেয় নিয়ে বহু বাদানুবাদ ; কিন্তু সিদ্দিকা তার আশা ও স্বপ্নকে গলা টিপে হত্যা করেছে শুধু নারীত্বের সার্বভৌম সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে। লতিফকে সে যে ভালোবাসে, তার অন্ততঃ দুটো প্রমাণ লেখিকা উপস্থিত করেছেন। এর একটা হলো নিজেকে চিরকুমারী জ্ঞান করার ক্ষেত্রে অনীহা—যা তাকে লতিফের তালাকনামা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে। কারণ সে মুক্তি চায়না। এই অনুভূতি তার বিবাহিতা জীবনের প্রতি অনিবার্য আকর্ষণের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা তার কাছে স্বামি-স্মৃতিরূপ বহুমূল্য সম্পদের মতো।[১০৫] অপরটা লতিফের ছবি সংবদ্ধ লকেট—যা সর্বদা তার কণ্ঠলগ্ন। এরপর কারো পক্ষেই দাম্পত্য জীবনের নিস্তরঙ্গ সুখ কামনা করা সম্ভব নয়। অতএব লতিফকে বিদায় নিতে হলো রিক্তহস্তে শুধু স্মৃতি নিয়ে—যা হয়তো তার জন্যে দুর্বহই।

কিন্তু এই পরিণতি কেন? উত্তর অতি সহজ। সিদ্দিকার মনে প্রশ্ন উঠেছে, "আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন?"[১০৬] এ কারণেই সিদ্দিকা সমাজকে দেখাতে চায়, "একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম

নহে।"[১০৭] বস্তুতঃপক্ষে আমাদের সমাজ যে গতানুগতিক ধারায় চিন্তা করে আসছে, তাতে কোন বিকল্প চিন্তাই করা যায় না। এই অচিন্তনীয় বিকল্পকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যেই লতিফ-চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। লতিফ বিদ্বান, অর্থশালী, কর্মঠ ও সংবেদনশীল। সে নারী দেখেছে বটে, কিন্তু তার ভেতর আগুন তো দেখেনি। সিদ্দিকার ভেতর সে সেই আগুনই প্রত্যক্ষ করেছে, যা ছাইচাপা থেকেও তার তেজ হারায়নি। লতিফের মতো একজন পুরুষের পক্ষে যখন সিদ্দিকাকে টলানো সম্ভব হলো না, তখন আর কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়। লেখিকা মৌলিক উপাদানের সাহায্যে চরিত্রদ্বয় সৃষ্টি করেছেন বলেই তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

সিদ্দিকা-চরিত্রের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া নারীহৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন, তার মুলে কাজ করেছে বিশ্বাস ও প্রত্যয়, আবেগ বা অভিমান নয়। বিশ্বাস ও প্রত্যয় বলিষ্ঠ বলেই সিদ্দিকা আবেগ বা অভিমানে ভেঙে না পড়ে অধিকার আদায়ের দুর্জয় ইচ্ছাকে গগনচুম্বী করতে সক্ষম হয়েছে। যে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি এই চরিত্রে ছড়িয়ে রয়েছে, তার অন্তর্দেশ তেমনি অতলান্ত বলেই তা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে।

'পদ্মরাগে'র গোটা কাঠমোটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বিশাল সমস্যার উপর। এই সমস্যাকে বেগম রোকেয়া "সমাজের নালীঘা" বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর সমাধান নির্ণয় করেছেন। একারণেই মুসলিম নারীজাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া অবিস্মরণীয়। এই উপন্যাসের ভাষা সহজ ও সরল। জোনাব আলী চরিত্রের মাধ্যমে লেখিকা যে ব্যঙ্গকৌতুক পরিবেশন করেছেন, তার সরলভঙ্গি পাঠককে শুধু আনন্দ দেয় না, বরং বিস্মিতও করে।

॥ ২২ ॥

আব্দুল ফাত্তাহ কোরেশীর "সালেহা" (১৯২৪)[১০৮] একটি সুখ-

পাঠ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসটি প্রথমে শাহাদাৎ হোসেন এবং পরে গোলাম মোস্তফা কর্তৃক সংস্কৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাহের ও সালেহা নামে দুটি ভাইবোনের জীবনের দুঃখপূর্ণ কাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। চাচীর অত্যাচার ও অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিলো। মাঝেমধ্যে উপদেশ বাক্যকণ্টকিত হলেও কাহিনীটি গতিশীল। তাহের ও সালেহার প্রতি তার চাচা-চাচীর ব্যবহার কখনো কখনো অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, তবু পাঠক কাহিনীটি সহজে অনুসরণ করতে পারেন। এছাড়া কাহিনীটির গতি স্বাভাবিক। তবে তাহেরের বিয়ের সময় তার হতভাগিনী বোনের কথা মনে না আসা বিস্ময়কর। লেখক এদিকটি একেবারেই ভেবে দেখেননি। উপন্যাসটিতে মুসলিম জীবনধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কলুষিত করতে পারেনি। লেখক মানবিক মূল্যবোধকে কোন বিশেষ গণিতে আবদ্ধ না রেখে জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই পাশাপাশি সমমর্যাদা লাভ করেছে।

'সালেহা' উপন্যাসটি মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন রচিত 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', ও 'গরীবের মেয়ে'র (১৯১৪-১৯২৩) সেই আদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু নজিবর রহমানের সেই সমাজ চেতনা, অনুশীলন ও শিল্পদৃষ্টি এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। তবে একটা ক্ষেত্রে 'সালেহা'র শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। লেখক কাহিনীতে কোন প্রকার অতিপ্রাকৃত ঘটনাজাল বিস্তার করেননি। অসুখের সময় তাহেরের মিলাদ শুনে এবং পানিপড়া পান করে জোহরাকে খানিকটা সুস্থ বোধ হয়েছিলো, কিন্তু সেটির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়—যার ভিত্তিমূল তাহেরের প্রতি আকর্ষণ। জামাল-সালেহা-পরিণয় বিস্ময়কর মনে হলেও লেখক তাকে যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন।

এই উপন্যাসের সর্বাধিক আকর্ষণীয় চিত্র হলো তাহেরের শিক্ষানুরাগ এবং এই অনুরাগকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তীব্র অধ্যাবসায়। সেদিন বিত্তহীন মুসলমানদের ভেতর এই গুণটির অভাব ছিলো বলেই তাদের পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। লেখক অত্যন্ত যত্নসহকারে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। এই নির্মাণকৌশলের ফাঁকে ফাঁকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রও অঙ্কিত হয়েছে-যাতে লেখকের ব্যাপক অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। এই রকম আর একটি চরিত্র মালেকা। মালেকা, তাহের সালেহার অত্যাচারী চাচা-চাচীর বড়মেয়ে। তার ভেতর স্থাপিত মানবিক আবেগ ও অনুভূতি স্বাভাবিক। কুসীদজীবী মণ্ডলজী, বা কাজি বাড়ির প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত বেচু মিঞা মীর, সাহেবের মালি বেসিটা-জাতীয় চরিত্র একেবারে বাস্তবজীবন থেকে আহৃত। এজাতীয় চরিত্রে লেখক যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তা তার মূল চরিত্রগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে।

আব্দুল ফাত্তাহ কোরেশী মুসলমান সমাজের যে স্তরের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। এই সমাজধর্মকে তার জীবন বোধের একটা অংশ হিসেবে মনে করলেও তার দৃষ্টি উদার ও বহুদূরপ্রসারী। এই সমাজের সদস্যরা পরবর্তীকালে নানাপ্রকার জটিল আবহাওয়ার কল্যাণে সঙ্কীর্ণচেতা হয়ে পড়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন স্তরে নানাপ্রকার সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

॥ ২৩ ॥

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনের 'অনাথিনী' (১৯২৬) সৈয়দ নওশের আলী সম্পাদিত 'সহচর'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অনাথিনী রাবেয়ার সঙ্গে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান জহুরের প্রেম এবং তার বিষাদময় পরিণতিই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। কাহিনীটি খুবই দুর্বল। আগাগোড়াই বিভিন্নপ্রকার আকস্মিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে কাহিনীটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—যার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক খুবই কম। জহুরের সঙ্গে রাবেয়ার মার প্রথম

দিনের পরিচয় তেমনি আকস্মিক ঘটনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রাবেয়ার মাকে জহুর যেভাবে নিজের খরচে চালিয়েছে তাকে শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও স্বীকার করা যায় না। নির্জলা দয়াপরবশ হয়ে কেউ এমনটি করেনা, বড়জোর কিছু পয়সা বেশি দেয়। তবে রাবেয়া জহুরের প্রেমের চিত্র অঙ্কনে লেখক সার্থকতা প্রদর্শন করেছেন। শুধু তাই নয় লেখক এতদ্বারা একটা মনস্তাত্ত্বিক চেতনাবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে বলতে পারছে না। তবু এই ক্ষেত্রে জহুরের দায়িত্বই বেশি। একমাত্র সে ই এগিয়ে গিয়ে রাবেয়ার কাছে তার প্রেম নিবেদন করতে পারতো। কিন্তু সেও রাবেয়ার অসহায়তার কথা বিবেচনা করে নিজের মুখ খুললোনা, রাবেয়াওনা। ফলে উভয়ের জীবনে নেমে এলো বিচ্ছেদ—এটাই উপন্যাসটির ট্রাজেডি। উভয়ের চরিত্রে স্থাপিত এই অভিব্যক্তি শিল্পময় ও সুবিন্যস্ত। এই কারণেই শেষ দৃশ্যে জহুর-রাবেয়ার হৃদয়ের আকুল আর্তনাদ পাঠককেও বিচলিত করে।

'অনাথিনী'র চরিত্রগুলো অস্ফুট। জহুর, রাবেয়া, শহীদ, আয়ষা যেমন সৎ ও সরলতার প্রতিমূর্তি, তেমনি জহুরের সৎমা, মামা-মামি, ওসমান প্রমুখ কুটিল ও অসততার জীবন্ত প্রতিচ্ছায়া। এসব চরিত্র অঙ্কনের সময় লেখক সাধারণ বাস্তববোধের কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছেন। তবে জহুরের পিতা আবদুল আজিজের চরিত্র তুলনামূলকভাবে মানবিক দোষগুণসমন্বিত। জহুরের প্রতি তার সৎমার ব্যবহার এবং এই ব্যবহারে জহুরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েও আবদুল আজিজ অসহায়। তার হৃদয়ের জ্বালা অসীম। সে উপলব্ধি করতে পারে "গৃহিণীকে শাস্তি না দিলে পুত্র বিরাগী হইয়া যায়, অপরদিকে পুত্রকে শান্ত করিতে না পারিলে গৃহিণীর কর্কশ বাক্য সহ্য করার পরও সংসারে বিশৃঙ্খলা আসে।"[১০৯] এই দোটানায় পড়ে বৃদ্ধ আবদুল আজিজ বিপর্যস্ত এবং অবশেষে মর্মান্তিক

পরিণতিরই শিকার।

এই উপন্যাসে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থান-পতনের একটা ক্ষীণরেখা অঙ্কিত হয়েছে জহুর পরিবারের উত্থান-পতনে এবং বড় লোকের বখে যাওয়া সন্তান ওসমানের পরিণতি বর্ণনায়।

॥ ২৪ ॥

মোহাম্মদ গোলাম জিলানির 'ব্যথিতের ডায়রি' (১৯২৬) গল্পোপন্যাস নয়, কারণ পরস্পরের পত্র বিনিময়ের ভেতর ঘটনার ক্রমবিকাশ ঘটেনি। নায়ক আজাদ কর্তৃক তার প্রেমিকা মাধবীকে লিখিত একখানা পত্রের মাধ্যমেই ঘটনা বিকশিত হয়েছে। গোটা উপন্যাসেই নায়কের ব্যথাতুর মনের করুণ অভিব্যক্তি ছড়ানো বলেই হয়তো একটা কাব্যময় ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

মাধবী বিধবা। তাকে তার ভ্রাতৃবন্ধু আজাদ ভালোবাসে। একদিন সেই ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে সে সবার কাছে অপমানিত হয়। কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করে মাধবী নিজেকে তার "পায়ের নীচে আশ্রয়" প্রদান করতে অনুরোধ জানায়।[১১০] অতঃপর মা উলুধ্বনি দিয়ে তাদের "বরণ করে নিলেন, বললেন, এস বাবা আজাদ, এস মা মাধবী, তোমাদের দুই হাত এক করে দিই। তোমাদের এই মিলনই যেন হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত মিলনরূপে পরিণত হয় হিন্দু মুসলমান দুইই আমার সন্তান।"[১১১]

এই পরিণতিতে লেখকের মুক্তবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে। তবে সংস্কারগত দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করলে কাহিনীটিকে দুর্বলই বলতে হয়। কারণ কোন হিন্দু মা-ই তার বিধবা মেয়েকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দেবেন না। বরং মধুর ভাই যদি এমনটি করতো তাহলে তা অধিকতর বাস্তবসঙ্গত হতো।

'ব্যথিতের ডায়রি' আকৃতিতে না হোক, প্রকৃতিতে বড়গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। কারণ কাহিনীটি এত সাধারণ ও একমুখো যে এতে উপন্যাসের বিস্তৃতি নেই বললেই চলে। পত্রাকারে লিখিত বলে

সংলাপও তেমন সার্থক নয়। কাহিনীটি মিলনাত্মক। তবু গোটা উপন্যাসজুড়ে এত কান্না ছড়িয়ে রয়েছে যে, অবশেষে পরিণতিটি আকস্মিক বলেই মনে হয়।

গ্রন্থটির সর্বত্র লেখকের মুক্তবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে। ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে যেমন তিনি উদার ও সহনশীল তেমনি সার্বিক মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও তিনি মুক্তবুদ্ধি ও সংবেদনশীল। গ্রন্থটির ভাষা কাব্যময় ও গতিশীল। ফলে সহজেই পাঠককে আকর্ষণ করে—যা তার শিল্পোৎকর্ষসূচক।

মোহাম্মদ গোলাম জিলানির 'ভুলের বাঁধন (১৯২৭) সেই তুলনায় অধিকতর সার্থক। লেখক একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত পটভূমিকা সামনে রেখে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। মানবজীবনে যে সীমাহীন ব্যথা-বেদনা ও পাওয়া-না-পাওয়ার মর্মান্তিক রহস্য লুকিয়ে আছে তা-ই এই পটভূমিকার অন্তরালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা কামাল ও লতিফা। তবে লতিফার সঙ্গে কামালের কোন সামাজিক সম্পর্ক নেই। যদিও কামালের স্ত্রী রয়েছে এবং লতিফাও বিবাহিতা, তথাপি তাদের অন্তরে যে আকর্ষণ পরস্পরকে কাছে টানছে অবশেষে তারই জয় হযেছে। কিন্তু কামাল ও লতিফার ভেতর মিলন হয়নি। লতিফা তার স্বামী জামালের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর একাকিত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার ভয়ে কামালকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলো কিন্তু কামাল তাকে কোনপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ না রেখে তার ভেতরের সীমাহীন সম্ভাবনাকে উস্কে দিয়েছে। অবশেষে লতিফা বুঝতে পেরেছে, মুক্তির ভেতরই আনন্দ—বন্ধনের ভেতর নয়। জামালের ব্যর্থতা লতিফাকে বুঝতে না পারা। কারণ লতিফাকে বুঝার মতো মানসিক ও আত্মিক যোগ্যতা তার নেই। তার বাবার অর্থলোলুপতা এবং কামাল লতিফার সম্বন্ধের প্রতি সন্দেহই এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী। কামাল-লতিফার প্রেমের প্রতি উন্মাদ মজিদের দৃষ্টি আকর্ষণ

উপলক্ষ্য মাত্র।

এই উপন্যাসের অন্যদিকে রয়েছে মজিদ-রাবেয়ার প্রেম। মজিদ রাবেয়াকে বিয়ে করেছিলো বটে, কিন্তু পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান এবং কামালের প্রতি রাবেয়ার আকর্ষণের ভুল ব্যাখ্যা তাদের জীবননাট্যে অকালযবনিকা টেনে দেয়। মজিদও তার পিতার ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে রাবেয়া আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার পর মজিদ রাবেয়ার চরিত্রের সংস্কারমুক্ত দিকটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ফলে সে উন্মাদ হয়ে যায় এবং রেবেকা নাম্নী জনৈকা বেশ্যাকে কেন্দ্র করে তার মনের কামনাবাসনার অর্গল খুলে দেয়। এই বেশ্যার ভেতর নারীত্বের তীব্র জ্বালা লক্ষ্য করে মজিদ তাকে রাবেয়া বলে ভজনা করতে থাকে। অবশেষে রেবেকার প্রতি অভিমানের বশবর্তী হয়ে সে বিষপানে আত্মহত্যা করে। রেবেকাও সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে।

উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র যথাযথ পরিস্ফুট। কোনপ্রকার অতিকথন যেমন উপন্যাসের গতি রুদ্ধ করতে পারেনি, তেমনি লেখক কোথাও তাঁর প্রকৃত মনোভাব লুকিয়ে রেখে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। লেখক নারীর ভেতর যে তীব্র জ্বালা লক্ষ করেছেন, তাকে অপরিসীম মমতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কামাল-শামসু, জামাল লতিফ, মজিদ-রাবেয়া, মজিদ-রেবেকা সর্বত্রই তিনি সাধারণ সম্পর্কের উর্ধ্বে একটি সার্বজনীন তত্ত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। কিন্তু মজার কথা হলো, এই তত্ত্বগত সত্য একমাত্র উপন্যাসে বর্ণিত নারীসমাজই উপলব্ধি করতে পেরেছে। পুরুষ সর্বদাই তাকে ভুল বুঝেছে, কিন্তু তার মূল্য দিয়েছে নারীরা।

আঙ্গিক দিক দিয়ে 'ভুলের বাঁধনে'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র (১৯১৭) মিল রয়েছে—ডব্লু, এইচ, হাডসন যাকে "নভেল অব লুজ প্লট" বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১১২] উভয় লেখকই যেন নিজ জবানীতে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

নির্লিপ্ত ও আত্মমগ্ন সংলাপের মাধ্যমে যেমন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সূচনা, তেমনি 'ভুলের বাঁধনে'রও সূচনা। সূচনায় মোহাম্মদ গোলাম জিলানি বলছেন :

"বিদ্যামন্দিরের সুউচ্চ প্রাচীর যখন পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন ভাল ছেলে সাজিবার বড় একটা নেশা ছিল। নেক্‌বখ্‌ত ধাম্মিক ও সাধু হইবার একটা তীব্র আকাঙ্খা এবং সেই সাথে বাহবা পাইবার নেশা যখন আমাকে খুব পাইয়া বসিয়াছিল, তখন চারিদিকে আমার প্রশংসা-ধ্বনিতে খুব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালের সুশীল সুবোধ ইত্যাদি প্রশংসার স্তূপ মাথায় করিয়া খুব ধাম্মিক ও ভালছেলে হইয়া যখন আমি একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার বেড়াজালগুলি কৃতিত্বের সহিত ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম তখন ভাবিয়াছিলাম এইবার বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিব। কিন্তু তাহা হইবার নয়। অতিরিক্ত প্রশংসা ও বাহবার চাপে আমার মস্তক যখন ভারাক্রান্ত হইয়া শুকাইয়া পড়িয়াছিল, তখন আমার ভেতরের পুরুষটীও যে সেই সাথে শুকাইয়া পরিয়াছে তাহার খবর যে দিন পাইলাম, সেই দিন জীবনের সমস্ত বাঁধা তারগুলিই যেন এলোমেলো হইয়া গেল। বাহিরের বাহবা তার সোনার শিকলে আমার অন্তরাত্মাকেও যে এমন কড়া বাঁধন দিতে পারে সে জ্ঞান কি পূর্ব্বে আমার ছিল?

তাই জীবনের মাঝপথে আসিয়া আজ মনের সাথে একটু বুঝাপড়া করিতে বসিয়া ভাবিতেছি কি ভুলটাই করিয়াছি। মদের মাতলামী ক্ষণিকের, কিন্তু এই যে মত্ততা, ইহা লোককে কেমন করিয়া চিরজীবনের মত ফুটবলের ন্যায় পাম্ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে, তাই ভাবিয়া হাসিও

পাইতেছে, দুঃখও হইতেছে "[১১৩]

শুধু তাই নয়, শ্রীকান্তের উদাসীন ও ভবঘুরে স্বভাবের সঙ্গে যেমন কামালের প্রকৃতির মিল রয়েছে, তেমনি কিছু বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মোহাম্মদ গোলাম জিলানির মিল রয়েছে। তার ভেতর প্রধান হলো দেহোপজীবিনীদের ভেতর নারীত্বের মহিমা আরোপ। গোলাম জিলানি রেবেকাকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন, তা শরৎচন্দ্র রচিত 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মী, 'দেবদাসে'র চন্দ্রমুখী, 'আঁধারে আলো'র বিজলীর সমধর্মী উভয়ক্ষেত্রেই নারীত্বের জ্বালা স্পষ্টভাবে চিত্রিত। এছাড়া আনন্দ রায় যে দৃষ্টিতে ভারতকে দেখেছেন, সেই একই দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মায়ের মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। মজিদ যখন উপলব্ধি করে,

> "সমগ্র ভারতবর্ষ যেন মূর্তি ধরে আমার নিকট হাজির হলেন। কি বিষাদ মাখা সেই চেহারা। দুই চক্ষে অশ্রু বিগলিত ধারায় ঝরে পড়ছে। বৈদেশিক অর্থ পিশাচের দল, দস্যু তস্করের ন্যায় তাঁর অঙ্গের সমস্ত আভরণ কেড়ে নিচ্ছে। জননী নিঃসহায়া অবস্থায় অশ্রু বর্ষণ করছেন। তাঁহার জীর্ণ শীর্ণ নিঃসহায় সন্তানেরা দূর থেকে ভীতির চখে এই দৃশ্য দেখছে আর কাঁদছে। না আছে তাহাদের দস্যুকে হত্যা করবার ক্ষমতা, না আছে প্রতিবিধানের সামর্থ। দস্যুহস্তে অপমানিতা দেশ উদ্ধারের কোন সম্বল তাহাদের নিকট নাই।"[১১৪]

তখন এই উপলব্ধি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

সমগ্র উপন্যাসে মোহাম্মদ গোলাম জিলানি নারীত্বের অবমাননার যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মূলে রয়েছে নারীর অবরোধ, তার শিক্ষার অভাব, এবং তার চরিত্রবিকাশে সীমাহীন সামাজিক ও পারিবারিক বাধা। এজন্যে নায়ক কামাল উপন্যাসের আগাগোড়াই

নারীজাতিকে এজাতীয় বয়ান থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অবশেষে তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে লতিফার সহযোগে 'মহিলা মুক্তি সমিতি' গঠনের মাধ্যমে। এই মনোভাবের পেছনে তৎকালে উত্থিত একটি ব্যাপক আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়। সেটি হলো বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত নারীমুক্তি আন্দোলন। উপন্যাসে আলোচিত অবরোধ ও অশিক্ষার মূলে রোকেয়া যে আঘাত হানেন তা-ই মুসলিম নারীজাতিকে মুক্তির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

মোট কথা, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই উপন্যাসের সূক্ষ্ম মূল্য অপরিসীম। সেদিন যে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো তার অন্তরের সীমাহীন আশা আকাঙ্খা নিয়ে, তাই এই উপন্যাসে কর্মমুখর। এই প্রচণ্ড কর্ম তৎপরতার ভেতর একটা বিশেষ অবস্থা লক্ষ্যণীয়। সেদিনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাজ করেছিল, তা এই উপন্যাসে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গে আরো একটা ঐতিহাসিক অন্দোলনের প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উত্থিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন—যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, কাজী আনোয়ারুল কাদীর, আবুল ফজল প্রমুখ। লেখকের সঙ্গে এই আন্দোলনের একটা যোগসূত্র ছিলো বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে লেখক এই উপন্যাসে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা কথিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অভিন্ন। এই আন্দোলনের যেসব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে সেদিনের বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করেছিলো তার ভেতর একটা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা—যা এই উপন্যাসগুলোতে প্রতিফলিত।

॥ ২৫ ॥

'চৌত্রির' (১৯২১)[১১৫] আবুল ফজলের (১৯০৬ জ.) প্রথম উপন্যাস। সে হিসেবে এই উপন্যাসে যে আবেগের প্রাধান্য রয়েছে সেকথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন।[১১৬] তবু এই উপন্যাসে জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির ছাপ দুর্লভ নয়। তসলীম ও রওশনের প্রেমকে লেখক যেভাবে পরিণতি প্রদান করেছেন, তাতে বেশ একটা বড় অংশ আবেগপ্রদ আইডিয়া জুড়ে থাকলেও এতে সেদিনকার মুসলিম সমাজের সার্বিক চিন্তার ছাপ রয়েছে। উপরন্তু কাহিনীটি বেশ জমজমাট। তসলীম রওশন প্রেমে অস্বাভাবিকতা যেমন নেই, তেমনি পরিবেশ নিরপেক্ষতাও নেই। তসলীম-রওশন প্রেমের জন্মবিকাশ এবং একটা আংশিক আঘাতের ফলে নেমে আসা বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে আবুল ফজল যে সংযম ও বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। তবে রওশনের পরবর্তী কার্যকলাপ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যদিও বা রওশনের পরবর্তীকালের বাচালতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রাণান্তকর প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করা যায়, তবু তার পরিণতি অস্বাভাবিক। শেষে অকস্মাৎ রওশনকে কেন মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হলো তা বলা খুবই মুসকিল। অবশ্য প্রথম জীবনে তসলীম-রওশনের নিবিড় যোগাযোগকে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এছাড়া অন্যকোন পরিণতি চিন্তা করা যায়না। চিঠিপত্রের যোগাযোগ কালে রওশন ও তসলীমের উপলব্ধি প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিলো। তসলীম ভাবে "রওশনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু সত্যই সে কি রওশনকে পায় নাই? তাহারা কোনদিন পরস্পর একটিবার চুম্বন বিনিময় করে নাই, রওশন বড় হইয়াছে অবধি কোনদিন তাহাকে স্পর্শ করে নাই সত্য, তথাপি সে কি তাহাকে পায় নাই বলিতে পারে? বিবাহ ত অনেকেই করিয়াছে, তাহারা কয়জন নিজেদের স্ত্রীকে এমনভাবে পাইয়াছে?

—২০

সেই কৈশোরের ভালবাসার উন্মেষ হইতে আজ পর্যন্ত সে কি এক মুহূর্তের জন্যও রওশনকে ভুলিতে পারিয়াছে ?"[১১৭] রওশন পত্রে লিখেছে, "আমরা কি পরস্পরকে কোনো বিবাহিত নরনারীর চেয়ে কম পেয়েছি ? আমরা হয়ত বলতে পারিনা, কিন্তু আমার কথা বলতে পারি। আমার চেয়ে কোনো বিবাহিতা নারী তার স্বামীকে বেশী পেয়েছে এ আমি ধারণা করতে পারিনা। এই রকম বলাতে হয়ত পাপ হচ্ছে, কিন্তু সত্যকে নিরুদ্ধ করার জন্য অন্তরে যে পীড়া তা এই পাপের শাস্তির চাইতেও কঠোর এমন মুহূর্তের কথা বলতে পারি না, যখন ভুলতে পেরেছি : এমন মুহূর্ত দিয়ে কোন্ স্ত্রী তার স্বামীকে পেয়েছে ?"[১১৮]

চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে আবুল ফজল সংযম ও সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। ফকীর মোহাম্মদের স্বার্থান্ধ ধর্মনিষ্ঠা এবং বেগম সাহেবার জীবনে তার প্রতিক্রিয়া, বেগম সাহেবার ধৈর্য এবং আত্মরক্ষার প্রাণান্তকর প্রয়াস, রওশনের মাতার নারীসুলভ দৃঢ়তা, তসলীমের শিক্ষানুরাগ এবং মানবিক আবেগ অনুভূতির উত্থান-পতন, রওশনের নীরব প্রেম-নিবেদন এবং অবশেষে সোচ্চার অনুভূতির মাধ্যমে তার বহিপ্রকাশ সবই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। এসব চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আবুল ফজল যে শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করেছেন তা উপলব্ধি করেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে সেদিনকার "বাঙলার শক্তিশালী গদ্যলিখিয়েদের মধ্যে সম-আসন দেওয়া যায়" বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।[১১৯]

এই উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণ হলো, তৎকালীন সমাজের বাস্তবচিত্র অঙ্কন। এই চিত্রের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষা এবং তার অভাবজাত কুসংস্কারের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আবুল ফজল প্রধানতঃ ধর্ম ও ধর্মনির্ভর-জীবনবোধকেই বেশি ব্যঙ্গ করেছেন। ধর্মের প্রতি লেখকের আকর্ষণ যাই থাকুকনা কেন, চর্বিতচর্বনের তিনি ঘোর বিরোধী। মিলাদ

ও খোৎবার ভাষা নিয়ে উপন্যাসে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তাতেই এই বিশ্বাস প্রতিফলিত। ইসলাম ধর্মে শিল্পচর্চা হারাম বলে নির্দেশিত হলেও এই উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা শিল্পেনিবেদিত প্রাণ। তাদের এই শিল্পানুরাগ শুধু বালসুলভ আবেগ বা অনুভূতির বহিপ্র্রকাশ নয়, বরং যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্বাসের প্রতিফলন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আবুল ফজল এই সময় (১৯২৩-২৭) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলনের সদস্যরা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মাধ্যমে ইসলামের এসব স্থবির ও অযৌক্তিক বিধানের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁরা সেদিন শিল্প-ভাস্কর্য, সুদ ইত্যাদি বিষয়ে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, আবুল ফজলের এই উপন্যাসে তার প্রভাব স্পষ্ট। এই মনোভাবের দরুন সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,[১২০] কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১২১] প্রমুখ এই উপন্যাসটির প্রশংসা করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্যে এই উপন্যাসের শিল্পসৌকর্যের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসচেতনতাও প্রাধান্য লাভ করেছিলো।

॥ ২৬ ॥

খোন্দকার মহাম্মদ আবুল্যতাহের 'চোখের আলো'তে (১৯২৭) তৎকালীন সমাজের কয়েকটি বিশেষ দিক প্রতিফলিত হলেও এর শিক্ষামূল্য একেবারেই নগণ্য—নেই বললেই চলে। এই উপন্যাসে লেখক সম্ভবতঃ শিক্ষা ও অশিক্ষার ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন—যা করিমন-ফতেমা ও রহিম-সফির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। পরিবেশ ও চরিত্রচিত্রনরীতি সম্পর্কে লেখকের কোন ধারণা নেই বললেই চলে। গোটা কাহিনীবিকাশে তাই চরিত্রের প্রায় কোন ভূমিকাই নেই। তার উপর নানাপ্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস আরোপ করে কাহিনীটিকে খেলো করে ফেলা হয়েছে। এসব অংশ কখনো কখনো পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে—বিশেষতঃ

শেষ পরিচ্ছেদটি।

তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ধারা সফির মাধ্যমে পরিস্ফুট। একদিকে ধনীর দুলালদের শিক্ষার প্রতি অনিহা, অন্যদিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষানুরাগ যথাযথ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ধর্মনির্ভর মুসলিম সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিই লেখকের মমতা বেশী। পাপ এবং পাপসম্পর্কিত ধারণাকে কেন্দ্র করেই এই বোধ পরিচর্যা লাভ করেছে। সেই হিসেবে এই গ্রন্থের খানিকটা সামাজিক মূল্য রয়েছে। সমকালীন জীবনের কতকগুলো জটিল সমস্যা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তবু গ্রন্থটিকে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা যায়না।

॥ ২৭ ॥

মোমতাজউদ্দীন আহমদের 'জীবন সাথী' (১৯২৭)-কে "পারিবারিক উপন্যাস" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপন্যাসখানা "চারিবৎসর পূর্ব্বে" লিখিত। সমস্ত কাহিনীটিই ধর্মীয় ভাবধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তবে কাহিনীটি একেবারেই দুর্বল। একটি অবরোধবাসিনী বালিকার সঙ্গে একজন বিলাসী ও মদ্যপ যুবকের আকর্ষণের উপর ভিত্তি করে উপন্যাসটি রচিত—যার উদ্দেশ্য বালিকার সম্পত্তি আত্মসাৎ। অবশেষে নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার দরুন যুবকের দুরভিসন্ধি কার্যকর হয়নি। কাহিনীটিতে কোন জটজটিলতা নেই।

তবে এই উপন্যাসে মোমতাজউদ্দীন আহমদ কিছু জটিল ও বহুআলোচিত সামাজিক সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদিও গ্রন্থটির প্রেরণামূল ধর্মীয় তবু এই গ্রন্থে মুসলমান পীর-কামেলদের মাজারের খাদেমগিরি এবং এজাতীয় পেশার সমালোচনা করা হয়েছে। লেখক এসব পেশাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এসব পরগাছার দল এজাতীয় কাজে শ্রমবিমুখ হয়েও আর্থিক সুবিধে পায় বলে প্রায়ই পারিবারিক

পেশা পরিত্যাগ করে। অবরোধ সম্পর্কেও এই গ্রন্থে লেখক তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। অবরোধের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে শিক্ষাবিমুখতার মাধ্যমে। এছাড়া এই গ্রন্থের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে আশরাফপ্রসঙ্গ। তখন এই শ্রেণীর প্রতি সাধারণের আকর্ষণ ছিলো বলে তারা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জাতে উঠতে চাইতো। তবে লেখক এই গোষ্ঠীর সাধারণ গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি জানেন,

"আচার, বিনয়, নিষ্ঠা, বিদ্যা অর্জ্জন,
বস্ত্র, বপু, বাক্য, প্রতিষ্ঠা, দীর্ঘদর্শন।
এই নবগুণ যার থাকে বিদ্যমান,
সেই জন হইবে কুলীনের সন্তান।"[১২২]

'জীবনের সাথী'র সামাজিক মূল্যই তার প্রধান আকর্ষণ।

॥ ২৮ ॥

আকবরউদ্দীনের 'মাটির মানুষ' (১৯২৯) মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী'তে বড়গল্প হিসেবে সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য গ্রাম্য দলাদলি এবং তার পরিণতি। দুর্নীতির দায়ে চাকরীচ্যুত দারোগা আবদুল লতিফ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। নিজে 'আতরাফ' শ্রেণীভুক্ত হয়েও কিভাবে আশরাফ শ্রেণীর প্ররোচনায় নিজ জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মামলামোকদ্দমা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে তাই এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

কাহিনীনির্মাণে লেখক দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। নিজের নির্বুদ্ধিতা এবং অন্যের উস্কানীতে কিভাবে বিভিন্ন প্রকার ঘটনা ধীরে ধীরে একটি খাতে প্রবাহিত হয়ে হতভাগ্য আবদুল লতিফকে তীব্র স্রোতের মুখে একখণ্ড তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তা লেখক একজন নিপুণ চিত্রকরের মতো অঙ্কন করেছেন। 'মিয়াপাড়া' ও 'নামপাড়া'র ভেতর দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হয়েছে বটে কিন্তু সামাজিক সুর

পুনর্বিন্যাস্ত হয়নি। নামপাড়ার যেসব ছোট লোকের বিরুদ্ধে লতিফ মিয়াপাড়ার প্ররোচণায় মামলা করে শেষ হয়েছে, পরিণামে তাকে তাদেরই অনুগ্রহে মরতে হলো এটাই তার প্রমাণ। মিয়াপাড়ার প্রধান যে ফজল মিয়া একদিন দারোগা সাহেবের কন্যা তার ছেলেকে বিয়ে করানোর জন্যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো, সেই ফজল মিয়াই শেষ মুহূর্তে আভিজাত্যের অহঙ্কারে লতিফের অন্তিম অনুরোধ প্রত্যাখান করলো। এই আঘাত লতিফ কিভাবে সহ্য করবে? লতিফ মিয়া শেষ মুহূর্তে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে বটে, কিন্তু তখন তার কিছুই করার ছিলোনা. শেষে তাকে একদিন শত্রু বলে চিহ্নিত 'নামপাড়া'র হিম্মত হাজির অনুগ্রহ নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। গোটা উপন্যাসে আকবরউদ্দীন যে পরিবেশচেতনার পরিচয় প্রদান করেছেন, তা সত্যি অপূর্ব। তবে লতিফের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর তার ছেলেকে খবর না দেওয়া, বা মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া নেপথ্যে রাখা কাহিনীর প্রধান ত্রুটি। এছাড়া কলেরায় পুত্রের মৃত্যু এই ঘটনার সঙ্গে তেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ লতিফ একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলো। অতএব আর কেন?

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই লেখক সচেতনভাবে অঙ্কন করেছেন। আবদুল লতিফ এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। আবদুল লতিফ নানাভাবে নামপাড়ার লোকদের হেয় করেছে, হিম্মতের মতো একজন উদার ও ধর্মভীরু মানুষের গায়ে হাত তুলে তার চূড়ান্ত অপমান করেছে। কিন্তু তবু লতিফের উপর পাঠকের যে সহানুভূতি তাতে চীড় ধরেনা। কারণ লতিফ যে একটা বিশেষ অবস্থার শিকার, একথা পাঠক এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হননা। এই অবস্থার মূলে জলসিঞ্চন করেছে "কৃষিজীবীর সন্তান বলিয়া তাহার মনের কোণে" সঞ্চিত দুর্বল অনুভূতি।[১২৩] লেখক লতিফের এই অবস্থান সম্পর্কে সচেতন বলেই দারোগাগিরি প্রসঙ্গে হিম্মতের শ্লেষোক্তির প্রতিক্রিয়া, স্ত্রীকে প্রহারের পর তার অনুভূতি, স্ত্রীর

আত্মহত্যার পর তার আত্মবিস্মৃত ভাব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এজাতীয় চরিত্র যে কোন উপন্যাসের জন্যে মূল্যবান সম্পদ। এছাড়াও লতিফের স্ত্রী মেহের আফজানের বাস্তববোধ ও আত্মসম্মান, হিম্মতের স্বাজাত্যানুভূতি ও সংবেদনশীলতা, ফজল ও হীরু খানসামার স্বার্থপরতা ইত্যাদি চিত্রে লেখকের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ছাপ রয়েছে।

নামপাড়া ও মিয়াপাড়ার ভেতরকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক রূপ লেখক উদ্‌ঘাটন করেছেন তা ছিলো সেদিনের একটি বহুল আলোচিত সমস্যা। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সমস্যাটি তুলে ধরেছেন এবং মানবস্বভাবের একটা বিশেষ দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই উপন্যাস পড়ে বুঝা যায়, আভিজাত্যের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, বরং মানসিক স্থিতিশীলতাই এর মূলে কাজ করে। ফজল ও হিম্মতের ভেতর পার্থক্য প্রদর্শন করেই লেখক একথা প্রমাণ করেছেন।

মোটকথা পরিবেশ রচনায়, কাহিনীনির্মাণে, চরিত্রচিত্রণে ও সমাজবিশ্লেষণে লেখক যে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন তাতে 'মাটির মানুষ'কে একটি সার্থক শিল্পকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আকবরউদ্দীন 'বেড়াজাল' ও 'অভিনেতা' নামে দুখানা উপন্যাসও রচনা করেছেন। এই উপন্যাসগুলো তিরিশের দশকে 'সওগাত' ও 'মাসিক মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়েছিলো। পুস্তকাকারে কথনো প্রকাশিত হয়নি।[১২৪]

॥ ২৯ ॥

বন্দে আলী মিয়ার 'ঘূর্ণি হাওয়া' (১৯৩০) উপন্যাসে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশমূল অঙ্কিত হয়েছে—যার মধ্যমণি গ্রামের বেশারত আলী নামে জনৈক দরিদ্র। সে অবশেষে পাটের ব্যবসা করে অর্থশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত বিত্তশালীদের মতো মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে এবং যথাসর্বস্ব হারিয়ে ফেলে।

অন্যদিকে রয়েছে বেশারত আলীর কন্যা হাসিনার সঙ্গে গ্রামের সাধারণ বিত্তশালী মোয়ায়েনের প্রেমের কাহিনী। যদিও অর্থের গরবে বেশারত আলী এই বিয়েতে অসম্মতি জানিয়েছিলো তবু শেষ পর্যন্ত বেশারত আলীর পতনের পর তাদের মিলন হয়। উপন্যাসে যুগ ধারাটি প্রতিধ্বনিত হলেও কাহিনী খুবই দুর্বল

তবে চরিত্রচিত্রণে লেখক খানিকটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বেশারতের অর্থের গুমরে সর্বস্ব হারানো, হাসিনার অহঙ্কার ও প্রেমনিষ্ঠা, ময়েনের উদার মনোভাব বেশ সফলতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।

বন্দে আলী মিয়ার ভাষা সহজ ও সরল। তাঁর উপমাগুলো পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যথা :

"সারাদেহে যৌবনশ্রী রসে ভরা ডালিমের মতন ফাটিয়া পড়িবার রকম হইয়াছে।"[১২৫]

অথবা, "গায়ের রঙটা কলমিলতার মতন শ্যামল এবং হাতগুলো সাপলার ডাঁটার মতন ছড়া ছড়া "[১২৬]

অথবা, মৌচাকেতে ঢিল পড়িলে মাছিরা যেমন করিয়া সাড়া দিয়া উঠে তেমনি চাঞ্চল্য ইহাদের মধ্যে দেখা গেল।"[১২৭]

অথবা, "মুখের উপর দুষ্ট ব্রণ হইলে যেমন করিয়া বারম্বার সেখানেই হাত পড়ে, তেমনি করিয়া আগোছাল চিন্তার মাঝে বার বার মনে পড়িতেছিলো হাসিনার কথা।"[১২৮]

অথবা, "মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন করিয়া সাপুড়ের চুবড়ির মধ্যে দ্বিধাহীন মনে প্রবেশ করে তেমনি অকুণ্ঠায় ময়েন আপনাকে হাসিনার সন্নিহিত করিল "[১২৯]

॥ ৩০ ॥

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লার (১৮৮০ ১৯৪৬) 'নেক নজর' (১৯৩০)-এর ভিত্তি ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ চিন্তাচেতনা। এর প্রথম পর্বে রয়েছে মনির ও সুন্দরীর প্রেম, শেষ পর্বে পরস্পরের বিচ্ছেদ এবং

মনির সেতারা ও সুন্দরী-শচীনের বিয়ে। এই প্রেমের ব্যর্থতা এবং অন্যত্র বিয়ের পেছনে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি কাজ করেনি। গোটাকাহিনীতে অস্বাভাবিক জটিলতা নেমে এসেছে স্বার্থান্ধ কেদার কবিরাজের কারসাজিতে। কারণ কেদার অর্থের লোভে সুন্দরীর অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলার ফলেই মনিরের মা অন্যত্র মনিরের বিয়ের সঙ্কল্প করে বসেন। সেই মেয়ের নাম সেতারা। সম্ভবতঃ মনিরের প্রতি সেতারার আকর্ষণ সুন্দরীর চোখে পড়েছিলো। তাতেই সে মনির-সেতারা সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন হয়ে পড়ে। শচীনের প্রতি সুন্দরীর আকর্ষণের ভিত্তি খুবই দুর্বল। কারণ, সুন্দরীকে দেখার জন্যে যেদিন শচীন তার বাড়িতে এসেছিলো সেদিন সুন্দরী তাকেই তার ভাবী বর মনে করে রেখে-ছিলো। লেখক শেষ পর্যন্ত সেই আকর্ষণকেই এই উপন্যাসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। যার ফলে গোটা উপন্যাসের একটা সুখকর পরিণতি নেমে এসেছে। মনিরের সঙ্গে কোন কারণে সুন্দরীর বিয়ে হলে সামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসা অস্বাভাবিক ছিলোনা। কারণ, সমাজ ও সংস্কার এদেশ থেকে কোনদিনই নির্মূল হয়নি

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুন্দরী। সুন্দরী মনিরকে ভালোবাসে কিন্তু সামাজিক বাধা সম্পর্কে সে সচেতন। যেকারণে অজয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হবার আগে বা পরে সে কোনপ্রকার বাধা প্রদান করেনি। অজয়ের মৃত্যুসংবাদ আসার পর তার সাদা কাপড় পরিধান এবং সিন্দুরের কৌটা ফেরৎ প্রদান অস্বাভাবিক মনে হলেও তার ভিত্তি রয়েছে। কারণ প্রথমদিন শচীনকে দেখে তার ভালোই লেগেছিলো। এবং তাকেই সে তার হবু বর মনে করেছিলো। সম্ভবতঃ এই কারণেই সে মনিরকে বিয়ে করার কোন সুযোগই গ্রহণ করেনি। হয়তো এই মনোভাবের পেছনে সেতারার প্রতি তার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণও কাজ করতে পারে। তবে মনির-সেতারার

বিয়ের ব্যাপারে এত উদযোগী হওয়া সত্ত্বেও সে আত্মহত্যা করতে গেলো কেন? আত্মহত্যাই যদি সে করবে তাহলে শেষে শচীনকে গ্রহণ করলো কেন? উপন্যাসের এই পর্বটি খুবই জটিল। কারণ ছুটো ঘটনা পরস্পরবিরোধী। লেখক বোধহয় এই পর্বে কাহিনীর পারম্পর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

গয়লা বৌ গিরিবালা এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। তার ভেতর মাতৃত্বের যে অফুরন্ত ধারা নির্ঝরের মতো ঝড়ে পড়ছে তার জ্বালা তাকে সারাজীবন ভোগ করতে হয়েছে। এই মাতৃত্বের তাড়নায় সে কখনো কুটিল ও কলহপরায়ণা, আবার কখনো মাষ্টারের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্টা। এই আকর্ষণ যে একদিন বাস্তব রূপলাভ, করবে তাকি সে জানতো? সে কি জানতো তার মেয়ে সুকুমারীকে শেষ পর্যন্ত এই মাষ্টারই বিয়ে করবে? চুনি-চরিত্রটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিশেষতঃ অজয়ের প্রতি আকর্ষণ চরিত্রটিকে মহত্তের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অবশেষে মোহিতের প্রতি সে যে করুণা দেখিয়েছে তা কোন বেশ্যার পক্ষে অস্বাভাবিক হলেও মানবিক।

এই উপন্যাসটির গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম প্রেম উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে লেখকের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কন করা। মনির ও সুন্দরীর প্রেমের বৈশিষ্ট্য হলো তা পরস্পরের ধর্মমতকে বিচলিত করেনি। আধুনিক কালের ধর্মনিরপেক্ষতা এজাতীয় মনোভাবেরই প্রতিফলন। শুধু এই সৌহার্দের চিত্রই তিনি অঙ্কন করেননি, বরং পরবর্তীকালে যেসব ছোটখাটো কারণে এই সৌহার্দে ফাটল ধরে তার চিত্রও তিনি তুলে ধরেছেন। মসজিদের সামনে বাজনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তারই প্রমাণ। এটি রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিজনিত কর্মকাণ্ডের ফল। অবশ্য একথা সত্য যে. মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লার অঙ্কিত এই ভাবধারা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথার্থ হলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে সঠিক নয়। কারণ এই সময় হিন্দুদের

পারিবারিক জীবনে এত ঔদার্য সৃষ্টি হয়নি। তবে লেখকের মানসিকতা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এছাড়া সমাজের নানাস্তরের যেসব সমস্যা তিনি পর্যালোচনা করেছেন তা চিরন্তন।

'নেক নজরে'র ভাষার পঠনপদ্ধতি এত জটিল যে, পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ইংরেজি ধরণের বাক্য গঠনের প্রতি লেখকের ঝোঁক গোটা উপন্যাসের সর্বত্র পরিলক্ষিত। যথাঃ

> "গয়লা বৌ উঠিয়া পড়িলেন অতঃপর—মেজগিন্নির মনটা ব্যথিত ও সমূহরূপে চিন্তাযুক্ত করিয়া।"[১৩০]

অথবা,

> "লক্ষ্মী মেয়ে কিনা বেলা হতে চল্লো, লক্ষ্য নাই খাওয়া দাওয়ার প্রতি কোন রকম।"[১৩১]

॥ গ ॥ লোককাহিনীনির্ভর উপন্যাস

॥ ১ ॥

শেখ ফজলল করিমের (১৮৮২-১৯৩৬) 'বিবি রহিমা' (১৯১৮) উপন্যাস নয়। "পবিত্র কোরআন শরীফ', 'রওজাতুল সাফা', 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম' এবং অন্যান্য উর্দ্দু-পার্শী গ্রন্থে বিবি রহিমা সম্বন্ধে যতটুকু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, রহিমা চরিত্রাঙ্কনে তাহাই"[১২৩] লেখকের অবলম্বন শুধু "বিষয়টিকে সুখপাঠ্য এবং সময়োপযোগী করিবার জন্য একটু উপন্যাসের রসে রসাইয়" দেওয়া হয়েছে। তবে এই লোকপ্রচলিত কাহিনীটি বেশ সুপরিচিত। তাই কাহিনীর জের টানার জন্যে লেখক 'আদি কথা' নামে একটি অধ্যায় যোগ করেছেন কাহিনী ও সংলাপ থাকলেও এই গ্রন্থে এমন কোন চরিত্র নেই যাকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করা যায়। উপরন্তু সর্প ও পশুপক্ষীর মুখে মানুষের বুলি, শয়তানের ফুঁতে অঙ্গ জ্বালা এবং পরে ব্যাথা ও ঘা সৃষ্টি, দৈববাণীতে উল্লিখিত গরম জলে স্নান করে আরোগ্যলাভ ইত্যাদি দৃশ্য অবতারণা করে লেখক গতানুগতিক লোককাহিনীর ধারাটিকে অক্ষুন্ন রেখেছেন।

যদিও কাহিনী প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলে কথিত, তবু এতে

তৎকালীন সমাজের খানিকটা ছাপ রয়েছে। মেয়েদের রান্নাবান্নায় পারদর্শী করে তোলা এবং বিয়ে ও কন্যা বিদায়ের দৃশ্যে অল্পবেশি বাঙলাদেশের আবহই স্বীকৃতি লাভ করেছে। তার সঙ্গে রয়েছে অগাধ প্রকৃতি প্রেম। উপরন্তু আধুনিক নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখকের ক্ষোভ এবং বাল্যবিবাহ সম্পর্কে ফ্রাহিমের উপলব্ধি, স্ত্রী-শিক্ষা, বিবাহে পণপ্রথা ইত্যাদি সমকালীন বঙ্গদেশের বহুআলোচিত সমস্যার বহিপ্র্কাশ মাত্র।

কথ্যরীতিতে লেখা 'বিবি রহিমা'র ভাষা সহজ ও সরল। শেখ ফজলল করিমের 'রাজর্ষি এবরাহিম' (১৯২৪) মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আরবদেশে প্রচলিত একটি কিংবদন্তিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। ইবরাহিম বিন আদহম (খৃঃ ৭৭৬ ৭৮৩) একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলখের অধিপতি ইবরাহিম সুফীবাদে দীক্ষাগ্রহণের পর সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং সেখানে নিজের সৎ উপার্জনের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন।[১৩৩] তাঁর রহস্যময় জীবন সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি চালু রয়েছে।[১৩৪] শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার তাঁর 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে কাহিনীটি ভিন্নরূপে পরিবেশন করেছেন।[১৩৫] সে হিসেবে গ্রন্থটি উপন্যাস নয়। কারণ এই গ্রন্থে এমন সব অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যাকে কোন যুক্তিতেই বাস্তব বলা যায় না। উপরন্তু কাহিনীতে লেখক আধুনিক ধ্যানধারণাও আরোপ করতে পারেননি। তবে সাধারণ লোককাহিনীর মতো গল্পটি গতিশীল। এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করে ফেলা যায়। কাহিনীতে যেমন কোন জট নেই, তেমনি চরিত্রেও কোন দ্বন্দ্ব নেই। 'বিবি রহিমা'র মতো এই গ্রন্থেও শেখ ফজলল করিম একনিষ্ঠ সাধনাকে পুরস্কৃত করেছেন। উভয় গ্রন্থে লেখক প্রকৃতিকে মানুষের বাস্তব সহচরী হিসেবে দেখিয়েছেন,—যে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় বনবাসী মানুষের নিত্যসহচরী। এই

প্রকৃতিপ্রেম লেখকের সহজাত বলে মনে হয়। এই গ্রন্থের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক সংসারজীবনকে বৈরাগ্যসাধনের সঙ্গে একীভূত করে সর্বত্র খোদার বিচিত্র লীলা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। 'বিবি রহিমা'তেও একই মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।

শেখ ফজলল করিমের ভাষা বিশুদ্ধ ও গতিশীল। তাঁর উপমা প্রয়োগ পাঠকের মনে দাগ কাটে। যেমন:

> "মোমবাতি পুড়িয়া পুড়িয়া, গলিয়া গলিয়া পরের ঘর আলোকিত করে, মেহেদী পাতা নিজে নিষ্পেষিত হইয়া তবে প্রিয়তমার গ রাঙাইয়া দেয়,—সত্যপ্রেমের ইহাই প্রথম পাঠ।"[১৩৬]

অথবা, "লোলুপ ভিক্ষুক সুখাদ্যের আশায় যেমন করিয়া ধনীর দ্বারে ছুটে, তিনিও তেমনি আকুল আগ্রহ লইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন।"[১৩৭]

অথবা, "ক্রোধকম্পিত কলেবরে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—যেন উগ্র দাহ্যপদার্থে বহ্নিসংযুক্ত হইল।"[১৩৮]

অথবা, "রমণী পদ্মপলাশলোচনা, কিন্তু নয়ন মুদ্রিত থাকায় মনে হইতেছে যেন বিষাদিনী কমলিনীকুল দিনান্তে মুদ্রিত নেত্রে তাহাদের প্রাণকান্তের চিন্তা করিতেছে।"[১৩৯]

॥ ২ ॥

শেষ হবিবর রহমানের 'পরীর কাহিনী' (১৯১৯) একটি রূপকথা। মানব সন্তানের সঙ্গে একটি পরীর প্রেমের কাহিনী এই গল্পের প্রধান উপজীব্য। তাদের প্রেম ব্যর্থ হলো পরী গোলবাহারের রূপে আসক্ত দৈত্য আর্দাহাসের ষড়যন্ত্রে। গোটা গ্রন্থটিতে নানাপ্রকার অতিপ্রাকৃত ঘটনা ছড়ানো। লেখক ঘটনাটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন। সেই হিসেবে এজাতীয় সব ঘটনাই তাঁর বিশ্বাসের আওতায় এসে গেছে। যদিও তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।

গ্রন্থটিকে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা চলে না। একমাত্র ভাষা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই গ্রন্থটি সার্থক নয়। তবে এই অতি প্রাকৃত ঘটনাজালের ভেতর লেখক যে জগতের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তার সঙ্গে গ্রন্থের অসংখ্য মানুষ পরিচিত। লোকজনকে জীনপরী বা ভূতে পাওয়া, তার জন্যে বিশষ এক ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা, এসব দৈত্যদানার কার্যকলাপের সঙ্গে গ্রামের বিভিন্ন রোগশোককে জড়িয়ে ফেলা, মহামারী এবং অন্যান্য উপসর্গে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জেকের ও হরিসংকীর্ত্তনে আত্মনিয়োগ সবই আমাদের গ্রামীণ সমাজের বাস্তবচিত্র—যা আজো কালান্তরের সূক্ষ্মপথ বেয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রবহমান।

॥ ৩ ॥

এম. নাসিরুদ্দীনের 'শিরী-ফরহাদ' (১৯১৯)[১৪০] পারস্যের একটি বহুবিখ্যাত লোককাহিনী অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসটি আকারে যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি পরিসরও সীমাবদ্ধ। শাহজাদা খসরুর অতৃপ্ত বাসনা দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা, সেই অতৃপ্তির ভেতরই তার সমাপ্তি। লেখকের পরিবেশচেতনা প্রখর, তবে সম্পূর্ণটাই কল্পনার উপর আঁকতে হয়েছে বলে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। অবশ্য কখনো কখনো বঙ্গ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো বলে তিনি তার ভেতর বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন।

উপন্যাসটির চরিত্র যথাযথ ফুটে উঠেনি। ফরহাদ এই উপন্যাসের নায়ক। লেখক ফরহাদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে খানিকটা সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। তবে তার আকস্মিক মৃত্যু বাস্তববোধবর্জিত ও অসংলগ্ন। তবু লেখক তাঁর অন্তর্জগৎ নির্মাণের সময় যথেষ্ট আবেগ ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে চরিত্রটি হৃদয়গ্রাহী রূপ লাভ করেছে। সেই তুলনায় খসরু ও শিরীর চরিত্র দুর্বল। শিরীকে পাওয়ার জন্যে শিপারকে প্রেরণ করার কোন প্রয়োজন ছিলোনা। কারণ শাহজাদার একটা নিজস্ব আকর্ষণ থাকা

স্বাভাবিক। উপন্যাসে এসব চরিত্র যে পরিমাণ স্থান দখল করে আছে সেই পরিমাণ গুরুত্ব লাভ করেনি। অবশ্য শিরীর শেষের দিকের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। শিরী যখন বলে "খোদার অভিসম্পাত! আমায় পুড়ে মরতে হ'বে রেজিনা। পারস্য ধ্বংস হয়ে যাবে—ঐ পাহাড়ের মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত করতে পাল্লে"[১৪১]—তখন তার অন্তর্দ্বন্দ্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রেজিনা। একমাত্র রেজিনাই ফরহাদের প্রেমের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। ফরহাদকে প্রলুব্ধ করার জন্যে শিরী কর্তৃক নিয়োজিত হওয়ার আগেই তার ভেতর এই বোধ উন্মেষিত হয়। ফলে গ্রন্থের শেষে শিরী খসরুর বৈরাগ্যের চেয়েও পাঠককে বেশি আকর্ষণ করে রেজিনার আত্মসমর্পণ। "সেই মন্দিরে গভীর নিশিথে কে এক কুমারী আসিয়া সমাধির উপর রাশি রাশি ফুল নিক্ষেপ করিয়া যায়। সমাধি প্রাঙ্গন নিজের দীর্ঘ কেশ দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া দেয়। আবার কখন কখন সমাধি তলে বসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে করজোড়ে বলিতে থাকে "হে মহাপুরুষ! তুমিই আমার হৃদয়ে পুণ্যের আলো জ্বেলে দিয়েছ, হতভাগিনী রেজিনা তোমার দয়াতেই আজ বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়েছে। তাই এই ছিন্ন ফুলগুলি গ্রহণ কর।""[১৪২] লেখক এতদ্বারা রেজিনার ট্রাজেডির প্রতিই যেন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ উপন্যাসে শিরীর প্রেম করুণারই নামান্তর। পক্ষান্তরে রেজিনার প্রেমে সত্যিকার আকর্ষণ ছিলো।

উপন্যাসটির ভাষা কাব্যময়। কারা শহরে ফরহাদের অবস্থান গ্রামবাঙলার কথা মনে করিয়ে দেয়।

॥ ৪ ॥

আবদুল মজিদ খোন্দকারের 'প্রেম-বিকাশ' (১৯২৫) একখানা ক্ষুদ্র উপাখ্যান। সম্ভবতঃ কোন লোককথা থেকে কাহিনীটি সংকলিত হয়েছে। কারণ লোককথার প্রায় সব লক্ষণই এই

উপন্যাসে বিদ্যমান। জনৈক শাহজাদা একজন সত্যিকার জীবন-সঙ্গিনী খুঁজতে খুঁজতে জনৈকা শাহজাদীর সাক্ষাৎ লাভ করে। কিন্তু তাদের প্রেম সার্থক হয়নি। তারা পরস্পরকে দেখেছে, উপলব্ধি করেছে, কখনো কখনো অশোভনীয় কৌশল অবলম্বন করে সাময়িকভাবে মিলিত হয়েছে, কিন্তু স্থায়ী সান্নিধ্য লাভ করতে পারেনি। অবশেষে বিরহে শাহজাদীর মৃত্যু ঘটেছে এবং শাহজাদা "প্রেয়সীর স্থূলদেহ ভুলিয়া সুক্ষ্মদেহের রূপে তন্ময় হইয়া স্থাণুবৎ নিস্পন্দভাবে মজিয়া রহিলেন।"[১৪৩]

'প্রেমবিকাশে' উপন্যাসের কোন লক্ষণই নেই। কাহিনী শিথিল, কোন চরিত্রই যথাযথ পরিস্ফুট নয়, সংলাপ একেবারেই দুর্বল। প্রেমিকের বিরহে প্রেমিকার মৃত্যু গতানুগতিক ও দ্বন্দ্বহীন লোক কাহিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। গোটা গ্রন্থটিই দীর্ঘ স্বগতোক্তি এবং পারস্পরিক কথাবার্তার ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এসব দীর্ঘ বক্তৃতা প্রায়ই পুনরাবৃত্তিতে পরিপূর্ণ এবং সে কারণে যেকোন পাঠক-এর জন্যে বিরক্তি উৎপাদক। শেষের দুই অধ্যায় অপ্রয়োজনীয় নীতিকথায় পরিপূর্ণ।

তবে লেখক .কাথাও কোথাও সমাজচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। এসব সামাজিক সমস্যাকে কখনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস প্রশংসনীয়। কোথাও কোথাও কাহিনীর প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে সরাসরি ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও মুক্ত। মৌলবী ও পীর সাহেবের ভূমিকা তাই যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য—যা সেদিনের জন্যে ছিলো একান্ত দুর্লভ। উপরন্তু বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও লেখকের এই ভূমিকা প্রশংসা পেতে পারে। কারণ তিনি যেজাতীয় কাহিনী চয়ন করেছেন, তাকে রক্ষণশীল বলাই বেশি সঙ্গত।

॥ ঘ ॥ প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সূচিত নবজাগরণের প্রাণমূলে

যে "অসাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদী উদার মানবিকতা"[১৪৪] কাজ করেছিলো, অচিরেই তার গতি রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এই শতাব্দীর শেষ পাদে এসে তা উৎকট সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়। এই মনোভাব থেকেই উদ্ভব হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের অন্ততঃ দুটো দিক পরবর্তীকালে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এর একটা হলো ইংরেজের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য, অপরটি মুসলিমবিদ্বেষ। যদিও এই উভয়বিধ মনোভাবই ইংরেজের বিকৃত প্রচারণার ফল, তবু কেউ যদি তাকে নির্জলা উদ্দেশ্যপ্রবণতার মাপকাঠিতে বিচার করতে চান তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায়না।

এই মনোভাব গোড়া থেকেই বাঙলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে ফলে সেদিনের সাহিত্যিকবৃন্দ একদিকে বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইংরেজের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন, অন্যদিকে মুসলিম রাজপুরুষদের ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃত করে কাব্য, নাটক, ও উপন্যাসে স্থাপন করেন। এসব সাহিত্যিক বিভিন্ন শিক্ষাপ্রকরণের মাধ্যমে মুসলিমপ্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে বিদ্বেষ প্রচার করলেও পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাসের মাধ্যমেই এই ভাব সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয়। এই ভাবের মূলে নীতিগত প্রশ্ন একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকলেও মুসলমানদের ভেতর সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মুসলিম রমণীর হিন্দু যুবকের প্রতি আসক্তি—যার সূচনা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৮-১৮৯৪) 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) থেকে। এই উপন্যাসে মারাঠা বীর শিবাজীর (১৬২৭-১৬৮০) সঙ্গে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কন্যা রওশন আরার প্রেমের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এই উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে কনটারের 'রোমান্স অব হিষ্টরি—ইণ্ডিয়া' থেকে।[১৪৫] তার পরের আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৯৬৫) যেখানে রাজপুত সেনাপতি জগৎসিংহের সঙ্গে পাঠান শাসনকর্তা কাৎলু খাঁর কন্যা আয়েষার আসক্তির চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাধিক মুসলিমবিদ্বেষ প্রচার করেছেন 'রাজসিংহ'[১৪৬] উপন্যাসে। এই উপন্যাসে মোঘল হেরেমের যেসব চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে সে সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকারও ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।[১৪৭] এজাতীয় মনোভাবের 'উৎস, ইতিহাস নয়, উৎস ব্যক্তি, জ্ঞান নয় মানসিকতা।''[১৪৮] যদিও এর পেছনে কোন না কোন ভাবে ইতিহাস প্রেরণা জুগিয়েছে—যাতে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরোপের উদ্দেশ্য প্রতীকায়ন [১৪৯] এই মনোভাব আজ সর্বজনস্বীকৃত। মীর মশাররফ হোসেনেও এই প্রতীকায়ন সহজে চোখে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করা সাধারণ পাঠকের মজ্জাগত ত্রুটি, অতএব তাঁরা বঙ্কিমের এই বোধের স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থ। অনুরূপ তাঁর শিল্পীসত্তার গভীরে অনুপ্রবেশ এবং তার অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পাঠকের ব্যর্থতা সমান।

অতীত ইতিহাস নিয়ে রচিত এজাতীয় উপন্যাসের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি অনেক পরে আকৃষ্ট হয়। ১৯০৪ সালে এজাতীয় রচনার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় মতীয়র রহমান খানের 'যমুনা' উপন্যাসে। তার আগে পর্যন্ত মুসলমানেরা মাতৃভাষা বিতর্কে ব্যস্ত ছিলেন বলে সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যখনি তাঁরা বাঙলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন, তখনি তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। শুরু হয় এজাতীয় প্রতিক্রিয়াজাত রচনা।

প্রতিক্রিয়াজাত রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, উৎকট যুক্তিশূণ্য হিন্দুবিদ্বেষ—যা অতীত ইতিহাস থেকে আহূত। মুসলিম বীরের প্রতি হিন্দু রমণীর প্রণয়াসক্তি এই আসক্তির মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস—যা নায়ক বা নায়িকাকে অযৌক্তিক-ভাবে বীরত্বের উত্তুঙ্গ শিখরে স্থাপন করেছে। এর সঙ্গে রয়েছে সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চমন্যতা—যা প্রায়ই ভিত্তিহীন। কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ কাহিনীর বিকৃত বিস্তৃতিও লক্ষ্য করা যায়। এজাতীয়

উপন্যাসের চিহ্নিতকরণে আমাদের প্রধান মাপকাঠি হলো শিক্ষাগুণ। একারণে হিন্দু রমণীর সঙ্গে মুসলিম পুরুষের প্রেমকাহিনীভিত্তিক বহু উপন্যাসকে যেমন প্রতিক্রিয়াজাত অধ্যায়ের বাইরে রাখা হয়েছে,[১৫০] তেমনি স্পষ্টতঃ প্রচারধর্মী হওয়া সত্ত্বেও বহু উপন্যাস গুরুত্ব সহকারে আলোচিত বা বিশ্লেষিত হয়েছে।[১৫১]

॥ ১ ॥

মতীয়র রহমান খানের (১৮৭২-১৯৩৭) রচনাগুলো প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। এই "উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতাদোষ দুষ্ট উপন্যাসের মুসলিমবিদ্বেষী চরিত্রগুলির পাল্টা হিসাবেই তিনি তাঁহার নায়ক-নায়িকাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"[১৫২] একারণে এসব উপন্যাসের শিক্ষামূল্য শূন্যের কোটায়।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'যমুনা' (১৯০৪) সর্বপ্রথম মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ইসলাম-প্রচারক' এ আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পটভূমিকায় মারাঠা পক্ষের বিশ্বাস রাওয়ের কন্যা যমুনার ধর্মান্তরণ এবং আহমদ শাহ আবদালির সঙ্গে তার বিয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কাহিনীটিকে উপন্যাস না বলে বড়গল্প বলাই সঙ্গত। কারণ কাহিনীর গতি একমুখো এবং আগাগোড়াই নির্দ্বন্দ্ব। আবদালির উপর যমুনার প্রথম দৃষ্টি পতন থেকে শুরু করে তাঁর পদে স্থান কামনা এবং ধর্মান্তরণের পর বিবাহ সহজ ও সরল গতিতে এগিয়ে গেছে।

সেই তুলনায় 'মোক্ষপ্রাপ্তি' (১৯১০) অধিকতর সফলতার দাবিদার। অবশ্য এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুও প্রায় 'যমুনা'র অনুরূপ। একটি বণিক পরিবার এবং একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের ইসলাম ধর্মগ্রহণ এই কাহিনীর প্রধান চিত্রিত বিষয়। তবে লেখক একটি জনপ্রিয় ও বাস্তব ভিত্তির উপর উপন্যাসটি দাঁড় করিয়েছেন। বণিক কৃষ্ণদাসের উপর সমাজপতিদের অত্যাচারের যে

চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। লেখক তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সেই ভিত্তিকে ব্যবহার করেছেন এবং কতকাংশে সফলও হয়েছেন। কাজী নুরউদ্দীনের ভেতর উদার্য আরোপের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামচন্দ্রকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করিয়ে লেখক খানিকটা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেছেন। তবে এজাতীয় ঘটনা ও ধর্মান্তরণের জন্যে তাঁর নির্বাচিত সময়টি অনুকূল নয়। কারণ "মুসলমান আধিপত্যের সায়াহ্নে এবং ইংরেজ রাজত্বের অরুণোদয়ে"র[১৫৩] প্রাক্কালে হিন্দুর পক্ষে মুসলমান হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

লেখক 'মোক্ষপ্রাপ্তি'র চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফলতা লাভ করেননি। সবগুলো চরিত্রই এক ধাঁচে গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রামচন্দ্র। কারণ একমাত্র রামচন্দ্রের ভেতর পরস্পরবিরোধী ভাবানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। সে নিজ ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও পুরোহিতদের অন্যায় আচরণ এবং ইসলাম ধর্মের তথাকথিত ঔদার্য তাকে ধীরে ধীরে তার নিজস্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। লীলাকে পানি দেওয়া এবং গোপার প্রতি আকর্ষণ জনিত দুর্বলতার প্রাক্কালে তার এই দ্বন্দ্ব সব চেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিলো।

মতীয়র রহমান খান হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেবদেবীদের "পরনারীচোর লম্পট", "গুরুপত্নীবিলাসী সহস্র চক্ষু মঘবাল", "স্বীয় কন্যাবিহারী ব্রহ্মা"[১৫৪] অথবা "লম্পটকুল শিরোমণি, গোপাবিলাসী বনমালী"[১৫৫] ইত্যাদি নানাভাবে বিদ্রূপ করেছেন এবং তাদের তুলনায় নিজ ধর্মবিশ্বাসকে উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামচন্দ্রকে এই কাজে নিয়োজিত করে চূড়ান্ত উদ্দেশ্যপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করেছেন। মতীয়র রহমান খান সংস্কৃতানুসারী সাধু বাঙলায় তাঁর উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন। একারণে তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপমা

সংগ্রহ করেছেন হিন্দু পুরাণ ও জীবন থেকে।[১৫৬]

॥ ২ ॥

প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাস রচয়িতাদের ভেতর সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) শ্রেষ্ঠ। তিনি মোট চারখানা উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি "বাঙ্গালী লেখকগণের" মুসলিমবিদ্বেষে বিক্ষুদ্ধ হয়ে এসব উপন্যাস রচনা করেছেন—যদিও তিনি উপন্যাস রচনার ঘোরতর বিরোধী।[১৫৭] লেখকের আশা "বাঙালীদিগের রচিত উপন্যাস পাঠ করিয়া যাঁহারা নিদারুণ মর্ম্মজ্বালা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই উপন্যাস পাঠে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"[১৫৮] অতএব এজাতীয় উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনপ্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই।

শিরাজী সাহেবের চারখানা উপন্যাসই ঐতিহাসিক। অন্ততঃ এসব উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি ঐতিহাসিক, এবং মুখ্য পটভূমিকা ইতিহাস থেকে আহৃত। তবে ঘটনাজালের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক কোথাও ক্ষীণ, কোথাও বা তা বিকৃত। অনেক ক্ষেত্রে সত্যতা নিরূপণ করাই দূরূহ। যেমন, 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসে ঈশা খাঁর সঙ্গে কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মত, ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণির রূপে মুগ্ধ হয়ে চাঁদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে সোণামণিকে অপহরণ করে এনে বিয়ে করেছিলেন।[১৫৯] পরে এই রমণী মুসলমান হয়ে যান এবং সেই শোকে ও দুঃখে চাঁদ রায় প্রাণত্যাগ করেন।[১৬০] ঈশা খাঁর মার নাম আয়েশা নয়, ফাতেমা খানম।[১৬১] 'তারাবাঈ' উপন্যাসে তারাবাঈকে শিবাজীর কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে তারাবাঈ শিবাজীর সেনাপতি হাম্বির রাওয়ের কন্যা। পরে তাঁর সঙ্গে শিবাজীর পুত্র রাজারামের বিয়ে হয়।[১৬২] উপরন্তু এই উপন্যাসে আফজল খাঁ হত্যার যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তার সঙ্গে ইতিহাসের কোন

সম্পর্ক নেই। আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ করে আফজল খাঁই প্রথম শিবাজীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিবাজীর প্রত্যাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।[১৬৩] আবার সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফি খাঁ এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্র্যাণ্ট ডাফ প্রমুখ আফজল খাঁর হত্যার জন্যে শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতাকে দায়ী করেছেন।[১৬৪] সত্য ঘটনা যাই হোক না কেন শিবাজীর অলীক কাহিনীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 'ফিরোজা বেগম' উপন্যাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। এই উপন্যাসে নবাব নজীবউদ্দৌলা, নবাব সুজাউদ্দৌলা, আহমদ শাহ আবদালী প্রমুখ মুসলিম শক্তি এক পক্ষে, অন্যদিকে সদাশিব রাও, রঘুজী ভোঁসলে প্রমুখ মারাঠাবৃন্দ। অথচ মারাঠাদের পক্ষে অশেষ শৌর্যবীর্যের পরিচয় প্রদানকারী সেনাপতি ইব্রাহিম কার্দির নাম এই উপন্যাসের কোথাও নেই। কারণ, শিরাজী এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধরূপে চিত্রিত করেছেন। ধর্মযুদ্ধ হলে 'কাফেরে'র পক্ষে মুসলমান কিভাবে থাকবেন?—যদিও 'নুরউদ্দীন' উপন্যাসে রুমি খান নামক মুসলিম সেনাপতি চিতোররাজ উদয় সিংহের পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। অবশ্য রুমী খান নামে কোন সেনাপতির নাম উল্লিখিত পর্বে পাওয়া যায় না। তবে শের শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে রুমী খান নামে একজন সেনাপতি সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে।[১৬৫] এজাতীয় বহু ইতিহাস বিকৃতির প্রমাণ দেওয়া যায়।

'রায়নন্দিনী' (১৯১৫) উপন্যাস যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র প্রতিক্রিয়াজাত তা নাম থেকেই বুঝা যায়। এই উপন্যাসের মূল ঘটনা মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁর সঙ্গে জমিদার কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর প্রেম ও পরিণয়। এই উপন্যাসের অন্যপ্রান্তে রয়েছে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মাহতাব খাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে অরুণাবতীর প্রেম ও পরিণয়। এসব ঘটনার

ঐতিহাসিকতা নিরূপণ করা অনাবশ্যক। কারণ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প উদ্‌গীরণ করেছেন, ইতিহাস তার বহু নিম্নে চাপা পড়ে গেছে। তবে আমরা উপন্যাসটির শৈল্পিক উৎকর্ষ বিচার করতে পারি।

এই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি হলো মানবিক অনুভূতিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করা। এই পর্যবেক্ষণের নগ্নরূপ ধরা পড়ে ঈশা খাঁ ও স্বর্ণময়ীর সংলাপে, মাহতাব খাঁর প্রত্যাখান সত্ত্বেও প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতী কর্তৃক তাঁকে অনুসরণ এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মাহতাব খাঁকে স্বামিত্বে বরণ, অভিরাম স্বামী[১৬৬] নামে সন্ন্যাসীর কামলালসার চিত্র, পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এবং "শ্রীপুরেশ্বরের কুলগুরু মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম যশোদানন্দ ঠাকুরের"[১৬৭] ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনায়। এসব ঘটনা যে উৎকট হিন্দুবিদ্বেষ এবং অযৌক্তিক মুসলিমপ্রীতির প্রতিক্রিয়া তা যে কোন পাঠকের চোখে পড়বে। শিরাজী এত করেও হিন্দুজীবনের প্রভাব এড়াতে পারেননি। একারণে তাঁর অঙ্কিত শাহ মহিউদ্দিন কাশ্মিরী "একখানা ব্যঘ্রচর্ম্মাসনে এক তেজঃপুঞ্জ মুর্ত্তি দিব্যকান্তি দরবেশ"—যিনি "রাত্রিতে সামান্য কিছু দুগ্ধ, রুটী ও ফলমুল ভক্ষণ করিতেন। মৎস, মাংস স্পর্শও করিতেন না"—শুধু তাই নয় "প্রাচীন হিন্দুরা মুসলমান ছিলেন, ইহা তিনি বেদ ও উপনিষদ হইতে প্রমাণ করিয়া হিন্দু পণ্ডিতদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন।"[১৬৮]

শিরাজীর এই একদেশদর্শী মনোভাব ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও। ফলতঃ শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপন্যাস বিচারের কোন উপায় নেই।

শিরাজীর 'তারাবাঈ' উপন্যাসের একপ্রান্তে রয়েছে মুসলিম সেনাপতি আফজল খাঁর প্রতি শিবাজীর কন্যা তারাবাঈর আকর্ষণ, অন্যপ্রান্তে বিজাপুর সুলতানের অধীনস্থ জায়গীরদার সরফরাজ

খানের কন্যা আমেনা বাণুর প্রতি মারাঠা বীর শিবাজীর আসক্তি। এই কাহিনীতেও নানাভাবে শিবাজীর বিকৃত মানসিকতার ছাপ পড়েছে। আমেনা কর্তৃক শিবাজীকে পর্যুদস্তকরণ, তারাবাঈ কর্তৃক বিঠঠলজীর প্রতিমায় পদাঘাত, আফজল খাঁকে বিয়ে করার জন্যে তারাবাঈর করুণ প্রার্থনা ও পত্র ইত্যাদি ঘটনাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করার কোন উপায় নেই। তবে এই উপন্যাসে শিবাজী-চরিত্রে কখনো কখনো হীনতা আরোপ করা হলেও চরিত্রটি তুলনামূলকভাবে অধিকতর পরিস্ফুট। কারণ ইতিহাসে শিবাজীর কার্যকলাপের যে চিত্র রয়েছে তার অনেকগুলো আজ মারাঠী গবেষকদের দ্বারা খণ্ডিত হলেও হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্যে তিনি যে বহু কূটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা সত্য। লেখক ইতিহাসের সেই জীর্ণ পাতাটিকে যথাযথ কাজে লাগাতে পেরেছেন। শুধু চরম মুহূর্তে কুলরক্ষার জন্যে ধর্মীয় উন্মাদনাকে ব্যবহার করেছেন। এটি তাঁর সাধারণ ও বহুলঅনুসৃত টেকনিক।

'ফিরোজা বেগম' (১৯২৪) উপন্যাসে দুটো দিক ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের যে মূল সত্যটি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো আভ্যন্তরীণ দলাদলির দরুন মুসলিম শক্তির অধঃপতন। এর আওতায় যেসব ঐতিহাসিক চরিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো হলো নবাব নজীবউদ্দৌলা, সম্রাট শাহআলম, নবাব আলিবর্দী খাঁ, নবাব সুজাউদ্দৌলা, আহমদ শাহ আবদালি প্রমুখ। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন সদাশিব রাও, ভাস্কর পণ্ডিত, রঘুজী ভোঁসলে প্রমুখ মারাঠা বীর। এই উভয় পক্ষকে দুদিকে রেখে শিবাজী এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধে রূপদান করেছেন। এই মানসিকতার ছাপ উপন্যাসে এত বেশি পড়েছে যে, তিনি কোথাও কোথাও এই উপন্যাসে ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দশ পৃষ্ঠাব্যাপী উদ্দীপনাময় কবিতা তার প্রমাণ। ইতিহাসের যে সত্য তিনি এই উপন্যাসে উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছিলেন সেটি যদি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে

পাঠকের চোখে ফুটে উঠতো তাহলেই তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতো। শুধু তাই নয়, তাহলে এতদ্বারা মুসলিম শক্তির প্রকৃত অবস্থাও পাঠক উপলব্ধি করতে পারতেন। এমন বিস্তৃত ও মৌলিক উপাদান নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে গিয়েও শিরাজী তাঁর স্বাভাবিক মনোভাব পরিহার করতে পারেননি। ফিরোজা বেগমকে কেন্দ্র করে সদাশিব রাও ও ভাস্কর পণ্ডিতের ভেতর কথোপকথন তার প্রমাণ। এই কথোপকথনের ছলে যেভাবে লেখক মুসলিম-মারাঠা প্রসঙ্গ এনেছেন তা হাসিরই উদ্রেক করে।

'নূরউদ্দীন' (১৯২৩) উপন্যাসে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী মানবিক আবেগ-অনুভূতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয়, এই অনুভূতি কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি লেখকের শিল্প দৃষ্টিকেও দৃঢ়তা প্রদান করেছে। এই উপন্যাসের সূচনাতেই তার আভাস লক্ষ্য করা যায়—যার মৌন আবেদন অসাম্প্রদায়িক এবং উদার মানবিকতা। তবে এই উপন্যাসের উপজীব্যও মুসলিম পুরুষের সঙ্গে হিন্দু রমণীর গতানুগতিক প্রেম-কাহিনী। চিতোরের রাণা উদয় সিংহের কন্যা স্বর্ণবাঈ ও রুক্মিণী-বাঈ, যথাক্রমে উদয় সিংহের সেনাপতি রুমী খান এবং মালবের সুলতান রুকনউদ্দীনের পুত্র নূরউদ্দীনের প্রতি আসক্ত। গোটা উপন্যাসে এই দুই জোড়া নরনারীর প্রেমকাহিনীই বিবৃত হয়েছে। প্রথম দিকে গো-কোরবানীকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের ভেতর যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত হলেও উপন্যাসের বাকি অংশে প্রাধান্য পেয়েছে নূরউদ্দীন-রুক্মিণীর প্রেম ও পরিণয়। লেখক এই অংশটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। বিশেষতঃ তাদের স্বেচ্ছা-নির্বাসিত আরণ্যজীবনের চিত্রটি সত্যি মধুর। এই পর্বে লেখক বেশ সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

শিরাজী 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' এবং 'জাহানারা' নামে দুখানা

ঐতিহাসিক রচনা শুরু করেছিলেন—যার প্রথমটি মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ইসলাম-প্রচারক'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো।[১৭০] অপরটি তাঁর বাসভবনে কাগজপত্রের স্তুপের ভেতর পাওয়া গেছে।[১৭১]

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর উপন্যাসগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রত্যুত্তরে লিখিত হলেও শিরাজী কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এড়াতে পারেননি। 'ফিরোজা বেগম'-এর নায়িকার পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ এবং কর্মক্ষেত্রে অবতরণ বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠ'-এর শান্তির কথা যেমন মনে করিয়ে দেয়, তেমনি 'নূরউদ্দীন'-এর কাপালিক সন্ন্যাসীপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সেই কাপালিক এবং তার আরণ্যক জীবনের কথা মনে আসে। তবে বঙ্কিমের কাপালিকের তুলনায় শিরাজীর কাপালিক অধিকতর মানবিক ও শিল্পমণ্ডিত। শিরাজী আগাগোড়াই চরিত্রটির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—এমন কি রুক্মিণীকে বলি দেওয়ার প্রাক্কালেও। 'নূরউদ্দীন' উপন্যাসে রুমী খানের সোদারতা হীরাবাঈ ও স্বর্ণবাঈর ভেতর প্রেমের প্রতিযোগিতা স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র সম্রাট শাহজাহানের কন্যাকে রওশন আরা এবং সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কন্যা জেবুন্নিসা—"পিসি-ভাইঝি উভয়ে"র "মদনমন্দিরে" প্রতিযোগিতার[১৭২] কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ছাড়া 'নূরউদ্দীন'-এ রুক্মিণীর বিয়েকে কেন্দ্র করে জয়পুর ও মালবরাজের বিরাগ ভাজন হওয়া এবং তার জন্যে যুদ্ধের আশঙ্কার চিত্রটির সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র (১৮৬১) রাজকুমারী প্রার্থী দুদলের মনোভাবের মিল রয়েছে।

শিরাজী তাঁর উপন্যাসে হিন্দু নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। যদিও ইতিহাসে এর বিপরীতক্রমও দুর্লক্ষ্য নয়।[১৭৩] তিনি সর্বদাই ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছেন ব্রাহ্মণসমাজকে। অথচ এই মনোভাবের সঙ্গে ইতিহাসের কোন মিল

নেই। কারণ, প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ ধর্মান্তরিত হয়েছে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা।[১৭৪] শিরাজীর মতো বহু মুসলমান লেখকই এই সত্যটি ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চান। একই কথা সংস্কৃতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মোঘল বাদশাহের আমলে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়প্রবণতা দেখা গেছে তাও এঁরা অস্বীকার করেছেন। শিরাজী সেকালের গোঁড়া মুসলমান ও হিন্দুদের মতো 'বাঙালী' বলতে হিন্দুদেরই বুঝাতে চান।[১৭৫]

ভাষার ক্ষেত্রেও শিরাজী মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুসারী। শুধু শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, বাক্যগঠনপ্রণালীতেও তিনি বঙ্কিমানুসারী। তবে তাঁর উপন্যাসে কিছু 'মোসলমানী' শব্দ রয়েছে—যেগুলো বেমানান। এসব শব্দের ভেতর কুদরাত, পিরহান, গাফেল, কেবলা, বয়েত, বে-এখতেয়ার, নমুদার, লজ্জিজ ও লফিস. রাহাবর, পেশানী, ছঙ্গদেন, বেমেছাল খুবসুরত, খোশনমা ইত্যাদি শব্দ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিরাজীর উপমাও সুন্দর ও বিষয়ানুগ। যথা :

"সেই ভীষণ অন্ধকারে দিগ্বিদিকে বৃক-তাড়িত শৃগালের ন্যায় ছুটিয়া পলাইল।[১৭৬]

অথবা, "অনলস্পর্শে তুবড়ীবাজি যেমন অসংখ্যস্ফুলিঙ্গে প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, স্বর্ণময়ীর অনুরাগপূর্ণ হিত-পরামর্শে অভিরাম স্বামীর হৃদয় আশা, আনন্দ ও উৎসাহে তেমনি নাচিয়া উঠিল।[১৭৭]

অথবা, "চন্দ্রের নিকট তারকা যেমন, পদ্মের নিকট শাপলা যেমন, কর্পূর আলোর নিকট মৃৎ প্রদীপের আলো যেমন, ময়ূরের নিকট পাতিহংস যেমন, আফজাল খাঁর নিকট শিরাজীও সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছে'।[১৭৮]

অথবা, "উন্নত বিশাল বক্ষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বাত্যাহতা স্ফীতবক্ষা তরঙ্গায়িত পদ্মার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উন্নত এবং

অবনত হইতেছে ."[১৭৯]

॥ ৩ ॥

মোজাম্মেল হক একজন সমন্বয়বাদী সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। এই পরিচিতির যে রূপই থাকনা কেন, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দরাফ খাঁ গাজী'তে (১৯১৯) এর কোন প্রভাব নেই। উপন্যাসের বিজ্ঞাপন দেখলেই বুঝা যায়, এটি জনৈক হিন্দু লিখিত 'দরাফ খাঁ' নামে একখানা উপন্যাসের প্রতিবাদে লিখিত। প্রতিবাদে লিখিত হওয়া বড় কথা নয়, বড় কথা হলো প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাসের তাবৎ গুণাগুণ উপন্যাসটিতে বিদ্যমান—যা এই প্রশ্নের সার্থকতার পথে একটি বিরাট বাধা।

ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে মোজাম্মেল হক হিন্দুদের যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে শুধু যে তাঁর এই সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে তা নয়, কখনো কখনো তিনি নিজেই হাস্যকর হয়ে পড়ছেন। কারণ, এসব চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতিও হারিয়ে ফেলেছেন। নচেৎ তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন, মুসলমানের কাছে যাই হোক কোন হিন্দুর কাছেই অকারণে আজানের আওয়াজ "দেবালয় মুখরিত-কর শঙ্খ-কাঁসর-ঘণ্টার কর্কশ কোলাহল"[১৮০]-এর তুলনায় মধুর মনে হতে পারেনা। কিংবা অকারণে তার বাড়িও সুন্দর মনে হতে পারেনা—চেহারা সুরত হলেওবা। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি গাজী সাহেবের ভেতর নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি আরোপ করেছেন—যার বলে প্রতিবেশী সাধারণ হিন্দুরা আকৃষ্ট হয়েছে। এসব দৃশ্যের কোন বাস্তব ভিত্তিও তিনি রচনা করতে পারেননি। গাজী সাহেব এবং তার সঙ্গীরা ধর্ম সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন, সেগুলো প্ররোচনামূলক—যাতে হিন্দুবিদ্বেশ প্রচ্ছন্ন। ফলে এজাতীয় দীর্ঘ বক্তব্য বিরক্তিকর। এই উপন্যাস পাঠ করে এদেশে মুসলিম আগমন সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের যে ধারণা হবে তা মোটেই সুখকর

নয়। কারণ এতে মুসলমানদের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। কখনো কখনো সংলাপে হিন্দুবিদ্বেষও প্রচার করা হয়েছে।

এই উপন্যাসে দুজন বিশেষ ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট রূপে চিত্রিত করা হয়েছে তার একজন "মহামতি সোমেশ্বর আচার্য্য, পাণ্ডুয়া-রাজধানীর বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী সেই দিগ্বিজয়ী মহাতার্কিক পুরুষ"[১৮১] অপরজন "শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত"[১৮২] গণপতি মিশ্র। উভয়েই ব্রাহ্মণ। লেখকের এজাতীয় চরিত্র নির্বাচনও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ, একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বঙ্গদেশের নবদীক্ষিত মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ নির্যাতিত বৌদ্ধসমাজ, অপরটি অস্পৃশ্য হিন্দুসমাজ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে সন্ন্যাসীদের "অপরাধীর ন্যায় নতমুখে" বসে থাকার দৃশ্যও অনুরূপ।[১৮৩]

লেখক সর্বাধিক বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন, মোস্তাফা বোখারীর চেহারা সুরত না দেখে শুধু বর্ণনা শুনে তার প্রতি লীলাবতীর আকর্ষণের চিত্র অঙ্কন করে। এই আকর্ষণকে কোন প্রকার মনস্তাত্ত্বিক নিয়মপ্রণালীর আওতায় আনা যায়না। একমাত্র রূপকথা-জাতীয় উপাখ্যানের সঙ্গেই এর তুলনা চলে। গোটা চরিত্রটিই লেখক বিকৃতবুদ্ধিপরিচালিত হয়ে অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু একদেশদর্শী মনোভাবের দরুন তা ব্যর্থ হয়ে গেছে কাহিনীর সর্বাধিক হাস্যকর দিক হলো লীলাবতীর মা কর্তৃক মোস্তফা বোখারীর নিকট লীলাবতীকে বিয়ে করার জন্যে পত্র প্রেরণ। এই দৃশ্যে কোন প্রকার যুক্তির বালাই নেই। বিশেষতঃ গণপতি মিশ্রের মতো একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রীর এজাতীয় আচরণ অকল্পনীয়। এই আচরণ স্বীকার করলে হিন্দুধর্মের হাজার হাজার বছরের সুদৃঢ় ভিত্তকেও অস্বীকার করতে হয়।

উপন্যাসের কোন চরিত্রই ফুটে উঠেনি। কারণ, লেখক একটা

বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন বলেই এমনটি হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ নির্মাণে মোজম্মেল হক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিশেষতঃ পুকুরের ঘাটে স্নানরতা নারীর পরস্পরের কুশলবিনিময় ও পরচর্চার দৃশ্য চমৎকার ফুটে উঠেছে।

'দরাফ খাঁ গাজী' পাঠ করে মনে হয়, এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি মিশ্র ভাষারীতির কাব্য থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। এই উপন্যাসে এমন কতগুলো আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে যেগুলো সেজাতীয় কাব্যে প্রচুর পাওয়া যায়। যথা, 'আঞ্জাম হউক', 'ইসলাম জারি', 'গোলাম আপনার হুকুমের তাবেদার', 'দুশমন জের হয়ে যাবে', 'রাহাভটকা', 'বাবার মত আকলমন্দ' ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মোজাম্মেল হক মিশ্রভাষারীতি কব্যের উপর ভিত্তি করে কয়েকখানা উপাখ্যানও রচনা করেছেন। উপরন্তু এই গ্রন্থটিতে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে।

॥ ৪ ॥

সৈয়দ আবুল হোসেন চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের সমালোচনার নামে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থগুলোকে তিনি "দেশহিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ" বলে উল্লেখ করেছেন। এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'দুর্গেশনন্দিনী বা ত্রিজারজা'র নাম পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন, "এতদ্বারা সবিনয় নিবেদন করা যাইতেছে যে,—যেন দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই, এই পুস্তকখানি উত্তমরূপে পাঠ না করিয়া তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ না করেন। দেশদূত, বসুমতী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, নায়ক, মোসলেম হিতৈষী প্রভৃতি সংবাদ পত্র সকল যেন, মস্তিষ্কদোষ সংশোধনে অগ্রসর হইয়া, সত্য হিতৈষণার পরিচয় দেন। বাহ্যিক নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া এমন মনে করিবেন না যে, আমরা কোন মন্দ অভিসন্ধি লইয়া দেশের দুরাত্মা সাজিয়া

হিন্দু মুসলমান মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছি। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে, দেখিবেন—আমরা বঙ্গভাষার মস্তিষ্কক্ষেত্রে চাষ দিয়া ঘাসের স্থলে শস্যশ্যামলা করিতে দাঁড়াইয়াছি এবং সেই জন্য দেশ হিতৈষীদিগের সাহায্য চাহিতেছি।" এই স্বীকারোক্তি পড়লেই লেখকের অসৎ উদ্দেশ্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এই গ্রন্থমালায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের যেসব উপন্যাসকে সমালোচনার স্থির লক্ষ্য করেছেন সেগুলো হলো 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'ইন্দিরা', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', ও 'সীতারাম'। সৈয়দ আবুল হোসেন সমালোচনার নামে এসব উপন্যাসেতে কাহিনীকে ইচ্ছেমত সাজিয়েছেন, নতুন করে তৈরী করেছেন এবং কখনো কখনো বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হলো, বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলোকে বিকৃত করা। ফলে এসব গ্রন্থের কোনপ্রকার শিল্পগুণ যেমন নেই, তেমনি সেগুলো রুচিবোধের পরিচায়কও নয়। তিনি সব চরিত্রকেই তাঁর ইচ্ছেমতো রদবদল করেছেন। এই রদবদলের প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হয়েছে নারী চরিত্রগুলো। ফলে তাঁর হাতে চিত্রিত প্রতিটি নারী যৌনতাড়নায় বিহ্বল এবং অসুস্থ লালসা চরিতার্থ করার জন্যে যত্রতত্র দেহদানে অকুণ্ঠিতা। এজাতীয় বিকৃতবুদ্ধিচালিত মনোভাব পাঠকের অন্তরাত্মাকে প্রবল বিদ্রোহে বিক্ষুব্ধই করে না, বরং তার ভেতর প্রচণ্ড ঘৃণারও উদ্রেক করে। এই ঘৃণ্য বিবেকের দ্বারা পরিচালিত বলে স্বতঃস্ফূর্ত :

এই উদ্ভট গ্রন্থগুলো উপন্যাসের অধ্যায়ে আলোচিত হবার অযোগ্য। তবু আলোচনা করা হলো এজন্যে যে, লেখক সব কটি গ্রন্থই উপন্যাসের ধাঁচে গড়ে তুলেছেন। তবে সব গ্রন্থের প্রথম বা দ্বিতীয় অধ্যায়ে রচনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয়ও রয়েছে।

যেমন, 'দুর্গেশনন্দিনী বা ত্রিজারজা' বা 'সীতারাম বা কাগজরাজ্য' গ্রন্থে আয়েষা বা জয়ন্তী প্রসঙ্গে যে কল্পনা তিনি করেছেন তা যত নোংরাই হোক না কেন, তার প্রশংসা করতেই হয়। এসব চরিত্র দেখে মনে হয়, লেখক যদি তাঁর শক্তিকে সুপথে পরিচালিত করতেন তাহলে মুসলিমরচিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখতে পারতেন।

সৈয়দ আবুল হোসেনের ভাষা সহজ ও সরল। তিনি গ্রন্থগুলো বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষায় রচনা করেছেন। তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রায়ই অশালীন ও অশোধনীয় করে ফেলেছেন। যদিও তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী বা ত্রিজারজা' গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় "কোন মন্দ অভিসন্ধি লইয়া দেশের দুরাত্মা সাজিয়া হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য সৃষ্টি" করার উদ্দেশ্যে এইসব গ্রন্থ লিখিত হয়নি বলে দাবি করেছেন, তবু গ্রন্থ লিখিত হওয়ার পর যে হিন্দু মুসলিম মিলনের সম্ভাবনা একেবারেই তিরোহিত হয়ে যাবার কথা তা অস্বীকার করা যায় না।

শুধু হিন্দু-মুসলিম মিলনের কথা নয়, এসব গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সাহিত্য আন্দোলনকেও ব্যঙ্গ করেছেন এবং তাকে মুসলিম জাতির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন; রাজনৈতিক কারণে আন্দামান গমন, 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান, 'মুসলিম সাহিত্য সমিতি' গঠন, মহাত্মা গান্ধীকে মহারাজ আখ্যাদান, স্বরাজ আন্দোলন ইত্যাদিকে তিনি যেমন ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলেছেন—তেমনি মুসলিম সাহিত্যকে হিন্দু-সাহিত্য থেকে পৃথক করার দাবিও তিনি উত্থাপন করেছেন। এই উক্তি থেকে বুঝা যায় প্রতিক্রিয়াশীল লেখকেরা বহুপূর্ব থেকেই এজাতীয় ষড়যন্ত্র পাকিয়ে আসছিলেন—পাকিস্তান হওয়ার পর যা কার্যকর করার অক্লান্ত চেষ্টা চলেছিলো। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধকে কেন্দ্র করে সুরেন বাবুর জন্যে তিনি কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করেছেন। গ্রন্থে এসব ঘটনার উল্লেখ তাঁর রাজনীতি

সচেতনতার পরিচয় যেমন দিচ্ছে, তেমনি এক্ষেত্রে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবও উদ্ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর এই প্রয়াস গোড়া থেকেই বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলো।[১৮৪]

॥ ঙ ॥ বিবিধ

উপরে যে ভাগ করা হয়েছে তার বাইরে দুখানা উপন্যাস রয়েছে। সেকারণে সেগুলো আলাদা আলোচনা করা হলো। এর একটা ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা ; অপরটি বিংশ শতাব্দীর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনাটি হলো শেখ আবদুর রহিমের (১৮৫৯-১৯৩১) 'প্রণয়যাত্রী'(১৮৯২)। 'প্রণয়যাত্রী' "বিখ্যাত লেখক ওয়াশিংটন আরভিং (১৭৮৩-১৮৫৯)-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "টেল অফ আল হামরা"র 'পিলগ্রিমেজ অফ লাভ' নামে গল্পটীর অনুবাদ"[১৮৫] জ্যোতিষির গণনা, পক্ষীগণের সঙ্গে কথোপকথন, অলৌকিক অশ্ব ও বর্মের সাহায্যে অপরিসীম সাহস ও বলের সঞ্চার, সোলেমানের আসনে বসে অসীম আকাশে অদৃশ্য হওয়া ইত্যাদি লোককাহিনীরই ছাপ। এসব মূলেও ছিলো। কারণ "সেটিও একটি লোক-প্রচলিত উপাখ্যান।"[১৮৬] একারণেও যেমন গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলা সঙ্গত নয়, তেমনি উপন্যাসের বিস্তৃতি ও ক্রমবিকাশের অভাবজনিত কারণেও একে উপন্যাস না বলাই বিধেয়। তবে অনুবাদ হিসেবে লেখক যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যি দুর্লভ। কাহিনীতে এমন স্বচ্ছন্দ গতি প্রায় অনুবাদেই রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এ কারণেই "আবদুর রহিমের 'প্রণয়-যাত্রী' মূলের সার্থক পুনঃসৃষ্টি। ভাষায় ও ভঙ্গিতে অনুবাদপন্থী না হয়ে মৌলিক রচনার স্বাদ আছে এতে।"[১৮৭]

এই গ্রন্থের সবগুলো চরিত্রই যথাযথ ফুটে উঠেছে। বেনাবেনের গম্ভীর ও জ্ঞানদৃপ্ত অভিব্যক্তি যেমন পাঠককে আকর্ষণ করে, তেমনি তাঁর কর্মপ্রয়াসও পাঠকের ভেতর কৌতুক সৃষ্টি করে। বেনাবেনের দুর্ভাগ্য, যৌবনের স্বাভাবিক উদ্যমকে বাধা দেওয়ার জন্যে তিনি যে

—২২

পন্থা অবলম্বন করলেন তা-ই তাঁর জন্যে কাল হয়ে গেলো। এই দৃশ্যে লেখকের সক্ষমতার ছাপ রয়েছে; শ্যেনপক্ষী, পেচক ও শুক পাখির চরিত্রে তাদের বাস্তব প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। এসব পাখির রূপকে লেখক কখনো কখনো আমাদের সমাজচিত্রটি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন; শ্যেনপক্ষী অত্যাচারী শক্তির এবং কপোত অত্যাচারিতের প্রতীক। এই দুই দলের মধ্যস্থলে অবস্থান করছে পেচক ও শুক পাখির মতো শিক্ষাভিমানী ও জ্ঞানগর্বী সুবিধাবাদী সমাজ। হয়ত উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে এই তিনদলের অস্তিত্ব ও কর্মপ্রণালী শেখ আবদুর রহিমকে গ্রন্থটি অনুবাদে অনুপ্রাণিত করেছিলো।

বিংশ শতাব্দীতে লিখিত যে গ্রন্থটিকে সাধারণ আলোচনার বাইরে রাখতে হয়েছে সেটি একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস। গ্রন্থটি হলো নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর কন্যা কমরন্নেছা খাতুন (পান্না বেগম) রচিত 'গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার' (১৯২৯)। হারাধন গঙ্গোপাধ্যায় নামক ধনশালী জমিদারের কন্যা অপহরণ এবং প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ডিটেকটিভের সাহায্যে সেই কন্যা উদ্ধারের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস রচিত। কাহিনী তেমন জমাটবদ্ধ নয়। বিশেষতঃ পূর্ব থেকে অপহরণকারী এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম প্রকাশ হয়ে পড়ায় উপন্যাসের 'সাসপেন্স' ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার মতে "বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে ইংরেজির অনুবাদ ভিন্ন আদি ডিটেকটিভ গ্রন্থ খুবই বিরল।"[১৮৮]

পাদটীকা

১ মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৮৫)

২ 'আলমগীর', নিবেদন।

৩ প্রাগুক্ত।

৪ Stanley Lane-Poole, 'Aurangzib' (Bombay, 1964) 25-26.: "Brave as a lion, frank and open as the day". "He was the terror of the battle-field".

৫ Ibid.

৬ Sir Jadunath Sarkar, 'History of Aurangazib', Voi. I & II (Calcutta, 1973) 273. S. Lane-Pooe. op cit. 59.

৭ S. Lane-Poole, op. cit., 25.

৮ আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসন', (দ্বি-স ; ঢাকা, ১৯৭৪) ৩৯৩।

৯ প্রাগুক্ত, ৩৯৪।

১০ 'সোলতানা রাজিয়া', অবতরণিকা।

১১ 'হিরণ-রেখা', ভূমিকা।

১২ প্রাগুক্ত, ঊনবিশ পরিচ্ছেদ। হিরণ-রেখা।

১৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী', দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিতা।

১৪ 'হিরণ-রেখা', অষ্টম পরিচ্ছেদ : প্রেমের জাগরণ।

১৫ 'বাংলা বিশ্বকোষ', প্রথম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৭২) ১৩৯।

১৬ K. K. Datta, 'An Advanced History of India' (London, 1963) 466.

১৭ 'মধুর কুসুম', ভূমিকা।

১৮ Yahya Armajani, 'Middle-East Past and Present (New Jersey, 1970), 270.

১৯ Ibid, 271.

২০ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'ভূমিকা' নূরন্নেছা গ্রন্থাবলী (ঢাকা, ১৯৭০)

২১ Iswari Prasad, 'A Short History of Muslim Rule in India (1939) 83.

২২ খাজা নিযামউদ্দীন আহমদ, 'তাবাকাত-ই-আকবরী' প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ। (ঢাকা, ১৯৭৮) ১৬৬-৬৭। K. S. Lal, 'History of the Khaljits (Allahabad, 1950) 67-68

২৩ K. K. Datta, op. cit., 301.

২৪ Iswari Prasad, op. cit., 91.

২৫ K. S. Lal, op. cit., 123-124.

২৬ Iswari Prasad, op. cit., 91.

২৭ K. S. Lal, op. cit., 123.

২৮ 'জানকী বাঈ', অধ্যায় ১৭ঃ "সৈনিকগণ বাহিরে যাইবা মাত্র রাজমাতা ও কুমারী বাঈ, ধীরে ধীরে আহত যুবকের নিকট উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু জানকীর মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না, বা তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা তখন ছিল না। তিনি কেবল মাত্র আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে যুবকের সুন্দর মুখের দিকে ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। এই সময় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন, ভিতর হইতে শত শত প্রশ্ন, শত সহস্র প্রাণের উদ্বেগ, একত্রে মুখ নিঃসৃত হইতে গিয়া বালিকার দম বন্ধ হইবার উপক্রম; তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল।"

২৯ 'স্বপ্নদৃষ্টা', চতুর্থ ভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

৩০ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (তৃ-স : চট্টগ্রাম, ১৯৬৮) ১৭।

৩১ 'প্রেম-দর্পণ', প্রথম প্রতিবিম্ব।

৩২ প্রাগুক্ত, ত্রয়োদশ প্রতিবিম্ব।

৩৩ প্রাগুক্ত, তৃতীয় ও অষ্টম প্রতিবিম্ব।

৩৪ প্রাগুক্ত, প্রথম ও ষষ্ঠ প্রতিবিম্ব।

৩৫ 'সাধনার জয়', নিবেদন।

৩৬ প্রাগুক্ত, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

৩৭ প্রাগুক্ত।

৩৮ যথা ঃ নিচাময়, মিসিয়া, সুধু পানি (জল), সমিরণ, উপরালা, যুড়িয়া, হর্শাভা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

৩৯ যথা ঃ শমসু, নমাজ, মোছম্মন, নজাবত আলি, কমবণ নেহার ইত্যাদি।

৪০ 'আকর্ষণ', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

৪১ প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

৪২ প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

৪৩ 'বঙ্গের জমিদার', প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৪৪ প্রাগুক্ত।

৪৫ 'সৈয়দ সাহেব', প্রথম পরিচ্ছেদ।

৪৬ প্রাগুক্ত।

৪৭ 'পল্লী-সংসার', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৪৮ প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।
৪৯ প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।
৫০ প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।
৫১ প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।
৫২ প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
৫৩ 'নদীবক্ষে', দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।
৫৪ "আপনার লিখিত "নদীবক্ষে" উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষী গৃহস্থের যে সরল-জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি—এই কারণে আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন।"
৫৫ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে।
৫৬ এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য।
৫৭ 'আজাদ', অধ্যায়, ৫।
৫৮ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ১৯।
৫৯ 'নদীবক্ষে', প্রথম পরিচ্ছেদ।
৬০ প্রাগুক্ত, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
৬১ প্রাগুক্ত, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
৬২ 'আজাদ, অধ্যায়, ৪।
৬৩ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ৬।
৬৪ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ২১।
৬৫ 'সরলা', সপ্তম, দশম, একাদশ পরিচ্ছেদ।
৬৬ প্রাগুক্ত, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।
৬৭ প্রাগুক্ত, উপসংহার।
৬৮ 'ভাঙাবুক', অধ্যায়, পঁয়ত্রিশ।
৬৯ ফেকাশাস্ত্রের যে কোন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৭০ 'ভাঙাবুক', অধ্যায়, পঁয়ত্রিশ।
৭১ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, এক। : "ভাবিয়াছিলাম, এই বেদনার কাহিনী জীবনে কাহারো নিকট ব্যক্ত করিব না। আমার এই অত-বড় ভালবাসা-জনের হাতের-দেওয়া ব্যথার আঘাত সারাজীবন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব ; বাহিরে লোক-চক্ষুর গোচরে আনিবার অবমাননা দ্বারা তাহার পবিত্রতার হানি করিব না। কিন্তু

পারিলাম না। এতবড় একটা গভীর মর্মব্যথা হৃদয় মধ্যে কিছুতেই চাপিয়া রাখা গেল না। তাই মনে করিয়াছি, হৃদয়ের এই কালো দাগ—এই দুঃখের ছাপ সকলকে দেখাইয়া দিয়া রুদ্ধ ব্যাথায় ভরপুর এই ক্ষুদ্র বুকটা হালকা করিব। দেখি তাহাতে শান্তি পাওয়া যায় কি-না।''

৭২ 'রূপের নেশা', অধ্যায়, বাইশ : ''হিন্দু ছাত্রদের এদিকে খুব প্রাণের টান দেখতে পাওয়া যায়। এই সেইদিন রাত্রিকালে ঐ পথের ধারে কোথাকার একটা মলিন বস্ত্রপরিহিতা ভিখারিনী জ্বর হয়ে গাছতলায় পড়ে ছিল।...শুনে আমি হোস্টেলে এসে একটা ছেঁড়া গেঞ্জী নিয়ে যেয়ে তাকে দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ করলাম। কিন্তু পরদিন সকালবেলা কলেজে খবর হলে দেখি যে, চারজন ছাত্র একটি বাঁশের খাট সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেল। সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ফলে সে সেরে উঠেছে। অবশ্য সে ভিখারিনীটি জাতিতে মুসলমান''।

৭৩ লায়লী উপন্যাসে কোন তারিখ নেই। তবে "কবিবর বাবু কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা"র শেষে "১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৬ সন" লিখিত রয়েছে।

৭৪ 'লায়লী', ২য় ভাগ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৭৫ প্রাগুক্ত, ২য় ভাগ, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

৭৬ প্রাগুক্ত, ২য় ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৭৭ প্রাগুক্ত, ২য় ভাগ, বিংশ পরিচ্ছেদ।

৭৮ প্রাগুক্ত, ১ম ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৭৯ প্রাগুক্ত, ১ম ভাগ, দশম পরিচ্ছেদ।

৮০ 'খেয়াতরী' ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

৮১ প্রাগুক্ত, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ; : "শ্যামলী রতীশের হাত ধরিয়া বিনীত স্বরে কহিল, মাফ কর মেরোনা, ওকে ছেড়ে দাও।"

৮২ 'পথের দেখা', প্রথম পর্ব্ব।

৮৩ 'যোবেদা', নবম পরিচ্ছেদ : দীপ-নির্ব্বাণ।

৮৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'চন্দ্রশেখর', ষষ্ঠ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

৮৫ 'যোবেদা', নবম পরিচ্ছেদ : দীপ-নির্ব্বাণ।

৮৬ প্রাগুক্ত, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : মধুর-মিলন।

৮৭ প্রাগুক্ত, বিংশ পরিচ্ছেদ : নব-বধূ।

৮৮ ১৩৮১ (১৯৭৪) পর্যন্ত মনোয়ারা' উপন্যাসের মোট তেইশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৮৯ 'অপরিচিতা', অধ্যায়, ২।

৯০ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ১০।

৯১ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ২২।

৯২ প্রাগুক্ত।

৯৩ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, "ভূমিকা", নূরেন্নেছা গ্রন্থাবলী, (ঢাকা. ১৯৭৩)

৯৪ 'স্বপ্নদৃষ্টা', দ্বিতীয় অংশ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৯৫ 'সফুরার পরিণাম', নিবেদন।

৯৬ 'নিমক-হারাম', অধ্যায় ৯।

৯৭ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ১০।

৯৮ প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১৪।

৯৯ প্রাগুক্ত।

১০০ প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১৭।

১০১ প্রাগুক্ত, অধ্যায় ২০।

১০২ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ২৩।

১০৩ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ২৭।

১০৪ 'পদ্মরাগ', চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ "আগুনের সৌন্দর্য্য"।

১০৫ প্রাগুক্ত, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ 'বিদায়'।

১০৬ প্রাগুক্ত, ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ 'সন্ধির চেষ্টা'।

১০৭ প্রাগুক্ত।

১০৮ 'সালেহা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ১৮ই মার্চ।

১০৯ 'অনাথিনী', অধ্যায়, এগারো।

১১০ 'ব্যথিতের ডায়রি', অধ্যায় ১৩।

১১১ প্রাগুক্ত।

১১২ W. H. Hudson, 'An Introduction to the study of literature' (2nd ed.) reset reprinted, London (1965) 139.

১১৩ 'ভুলের বাঁধন', সূচনা। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের প্রথম অনুচ্ছেদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বুঝা যাবে।

১১৪ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ১৭।

১১৫ 'চোচির', পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে।

১১৬ আনোয়ার পাশা, 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' (চট্টগ্রাম, ১৯৬৭) 'যদি আমরা লিখতাম' বেতার কথিকা প্রসঙ্গে আবুল ফজলের উদ্ধৃতি ; ৫১।

১১৭ 'চৌচির', আবুল ফজল-রচনাবলী, (চট্টগ্রাম, ১৩৮২) ৬১।

১১৮ প্রাগুক্ত, ৬৩।

১১৯ আবুল ফজল রচনাবলীর ৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

১২০ "আপনার 'চৌচির' গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও পড়েছি। আমার পক্ষে এই গল্প বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এই প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি।" আবুল ফজলকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, 'আবুল ফজল রচনাবলী', ৯৬০-৬৪।

১২১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা মুসলিম সাহিত্য", 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে', (কলকাতা, ১৩৬৯) ৩৫৩ ঃ "তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চৌচির—এ মুসলমানের অন্তর্জীবন আঁকিবার খানিকটা প্রয়াস আছে।"

১২২ 'জীবনের সাথী'।

১২৩ 'মাটির মানুষ', অধ্যায়, ৩।

১২৪ রশীদ আল ফারুকীকে লিখিত লেখকের পত্র। ('সংবাদ' ২৮ আশ্বিন, ১৩৩৫)

১২৫ 'ঘূর্ণি হাওয়া', অধ্যায়, এক।

১২৬ প্রাগুক্ত।

১২৭ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, দশ।

১২৮ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, এগারো।

১২৯ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, তেরো।

১৩০ 'নেকনজর', অধ্যায়, চার।

১৩১ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, সাত।

১৩২ 'বিবি রহিমা', নিবেদন।

১৩৩ The Encyclopaedia of Islam, Vol. II, ed. M. Th. Hoestone (London, 1927) 432.

১৩৪ Ibid, 433.

১৩৫ শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার, 'তাযকেরাতুল আওলীয়া' প্রথম খণ্ড। (অনুবাদ ঃ চতুর্দশ স ; ঢাকা, ১৯৭৯) ৯২-৯৩।

১৩৬ 'রাজর্ষি এবরাহিম', ১৩ পৃ।

১৩৭ প্রাগুক্ত, ১৫ পৃ।

১৩৮ প্রাগুক্ত, ৭২ পৃ।

১৩৯ প্রাগুক্ত, ১০২-৩ পৃ।

১৪০ এই গ্রন্থে কোন প্রকাশকাল নেই। তবে আমার ব্যবহৃত বইটিতে 'বেঙ্গল লাইব্রেরি'র মোহর রয়েছে, তাতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ লেখা আছে। সম্ভবতঃ এই সনেই বইটি প্রকাশিত হয়।

১৪১ 'শিরী-ফরহাদ', ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

১৪২ প্রাগুক্ত, উপসংহার।

১৪৩ 'প্রেম-বিকাশ', প্রবোধন।

১৪৪ মুনীর চৌধুরী, 'তুলনামূলক সমালোচনা' (ঢাকা, ১৯৬৯) ২৫৬।

১৪৫ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ-স : কলকাতা, ১৩৬৯) ১৮৬।

১৪৬ ১৮৮২ খ্রীঃ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং সম্পূর্ণ নতুন রূপ ও ভঙ্গিতে এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৪৭ যদুনাথ সরকার, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকা।

১৪৮ মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ৩০।

১৪৯ প্রাগুক্ত, ২৯-৩০।

১৫০ আজ্জমন্দ আলীর 'প্রেম-দর্পণ', মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের 'পল্লী-সংসার', মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর 'আকর্ষণ', মোহাম্মদ গোলাম জিলানির 'ব্যথিতের ডায়রী' ইত্যাদি বহু উপন্যাস রয়েছে।

১৫১ শেখ হবিবর রহমানের 'আলমগীর', মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর 'কালাপাহাড়' কে এস আজহারুল ইসলামের 'আলোকের পথে', মোহাম্মদ কোরবান আলীর 'মানোয়ারা' ইত্যাদি।

১৫২ আবদুল কাদির, "মতিয়র রহমান খানের সাহিত্য সাধনা", মতীয়র রহমান খান গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্ট (ঢাকা, ১৯৬০) ১৯।

১৫৩ 'মোক্ষপ্রাপ্তি' প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ গোঁড়ায় গোঁড়ায়।

১৫৪ প্রাগুক্ত, দশম পরিচ্ছেদ ঃ নবজীবন।

১৫৫ 'যমুনা', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৫৬ দ্রষ্টব্য ঃ "নিষ্কাম জিতেন্দ্রিয় মহাতপা", "পুণ্যতোয়া জহ্নু কন্যা প্রতিদিন যে পরিমাণ জলরাশি সমুদ্র গর্ভে ঢালিতেছেন, তাহারও পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু বিধবার উষ্ণাশ্রুর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব", "আহত হর্য্যক্ষ-সদৃশ্য ভয়ঙ্কর" ইত্যাদি।

১৫৭ 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের উপক্রমণিকা।

১৫৮ প্রাগুক্ত।

১৫৯ মহেন্দ্রনাথ করণ, 'হিজলীর মসনদ-ই-আলা' (দ্বি-স ; কলকাতা, ১৯৫৮) ১৬২

১৬০ বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা, ১৯৭৫) ৪২৬।

১৬১ মহেন্দ্রনাথ করণ, প্রাগুক্ত, ১৬১।

১৬২ যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, "তারাবাঈ" 'ভারতকোষ' তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৩৭৪) ৭১৩।

১৬৩ K. K. Datta op. cit. 513-514.

১৬৪ Ibid,

১৬৫ আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯৭৭) ৪৪১।

১৬৬ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসেও অভিরাম স্বামী নামে একজন সন্ন্যাসীর চরিত্র রয়েছে। অভিরাম স্বামী চরিত্রের যে দিকটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাগুণে শিল্পময় হয়ে উঠেছে, শিরাজী সেই দিকটির বিকৃত অংশ চিত্রিত করেছেন, শিল্পবোধের ধারেও যেতে পারেননি।

১৬৭ 'রায়নন্দিনী', অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ কুলগুরু যশোদানন্দের ইসলামে দীক্ষা।

১৬৮ প্রাগুক্ত, ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ শাহ মহিউদ্দীন কাশ্মিরী।

১৬৯ নূরেউদ্দীন', দশম পরিচ্ছেদ। ঃ 'উষ্করী নয় গোশত্' আর হিন্দু নয় দোস্ত।"

১৭০ আবদুল কাদির, শিরাজী রচনাবলী (ঢাকা, ১৯৬৭) ৩৯৭

১৭১ প্রাগুক্ত, ৪০৫।

১৭২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রাজসিংহ', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৭৩ জাহানারা জনৈক রাজপুতকে ভালোবাসতেন বলে তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য ঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী অনূদিত 'জাহানারার আত্মকাহিনী' (দ্বি-স ; কলকাতা, ১৩৮৫)

১৭৪ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা ১৯৬৬) ৬৮০।

১৭৫ 'রায়নন্দিনী'র উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

১৭৬ প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ লুণ্ঠন।

১৭৭ প্রাগুক্ত, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ গুরু শিষ্য।

১৭৮ 'তারাবাঈ', চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৭৯ প্রাগুক্ত, একাদশ পরিচ্ছেদ।

১৮০ 'দরাফ খাঁ গাজী', ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য।

১৮১ প্রাগুক্ত, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : ধর্ম্ম-বিচার।

১৮২ প্রাগুক্ত।

১৮৩ প্রাগুক্ত, দশম পরিচ্ছেদ : আবার পূর্ণ সফলতা।

১৮৪ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, (ঢাকা, ১৯৬৯) ১১২।

১৮৫ 'প্রণয়-যাত্রী' দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯২০) বিজ্ঞাপন।

১৮৬ আনিসুজ্জামান, "ভূমিকা", 'প্রণয় যাত্রী', শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী (ঢাকা ১৯৬৭) ১৫১ ।

১৮৭ প্রাগুক্ত, ১৫৪।

১৮৮ 'গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার' নূরন্নেছা গ্রন্থাবলী, ৬২৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে জীবনবোধ

১৮৮৫খ্রীঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর এই দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় তা নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের ভেতর এগিয়ে এসে ১৯৩০খ্রীঃ একটা রাজনৈতিক স্থিরতা লাভ করে—যার এক বিন্দুতে রয়েছে রাভী নদীর তীরে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু কর্তৃক স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন, অন্য মেরুতে স্বাধীন ভূখণ্ড স্থাপনের দুর্জয় আকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। এই পরস্পরসম্পূরক ঘটনাবলীর ফাঁকে ফাঁকে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার সবটাই যে চক্ষুগ্রাহ্য এমন কথা বলা যায়না। তবু 'রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় তার খানিকটা আভাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটি তত্ত্বগত ব্যাখ্যা—যার বেশির ভাগই মস্তিষ্কপ্রসূত। ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে অতীতের ঘটনাবলীকে একীভূত করে একটা সংহত রূপ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তার সার্বিক অবস্থান খুঁজতে হলে ব্যবহারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত সঙ্কুল ঘটনাবর্তে ঝাঁপ দিতে হবে—যার উৎস সৃষ্টিশীল রচনা। কারণ এসব রচনায় প্রচ্ছন্ন ধ্যান ধারণা সত্যিকার জীবনবোধ থেকে উৎসারিত। ব্যাপক মতভেদ ও পরস্পরবিরোধিতা অনেকক্ষেত্রে এজাতীয় অনুসন্ধান প্রয়াসকে কণ্টকাকীর্ণ করে তুললেও এর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত তথ্যই নির্ভেজাল।

সেই নির্ভেজাল সত্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আমরা এই অধ্যায়ে, পূর্বে আলোচিত উপন্যাসগুলোতে লেখকবৃন্দ জীবনের নানাদিক কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করবো। জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের যোগসূত্র স্পষ্ট ও সরাসরি। অতএব তাকে জীবনের বাইরে কোন অবস্থাতেই কল্পনা করা যায়না। শুধু তাই নয়, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টির মূলে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের

যে উপলব্ধি কাজ করে তাকে সংশ্লিষ্ট উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায়ও নেই। তবু প্রায়ই দেখা যায়, লেখকেরা সম্পূর্ণ জীবননির্ভর উপন্যাস রচনা করতে গিয়েও অনেকস্থলে তার বিশেষ ভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সত্য আবিষ্কারে যত্নবান। সত্য ও সুন্দর যেমন নানাভাবে মানুষের কল্পনাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে, তেমনি এই ভাবকে পাঠকের সামনে চক্ষুগ্রাহ্য করার জন্যে লেখকেরাও অবিরাম চেষ্টা করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে লেখকের সেই বিশেষ প্রয়াসটিই অনুসন্ধান করবো। এ যেন অনেকটা লবনাম্বু সমাকুল মহাসমুদ্রের গায়ে ভাসতে গিয়ে সুপেয় জলের সন্ধান।

এই উদ্দেশ্যে আমরা একটা বিশেষ মাপকাঠি স্থাপন করে তাকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করেছি। সেই ভাগগুলোতে যেসব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক জীবন। কারণ পঁয়তাল্লিশ বছরে (১৮৮৫-১৯৩০) বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তা-ই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের উৎস। একে গাঢ়তা প্রদান করেছে ইতিহাসবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা। এই কারণে সমাজের নানা স্তরে বিন্যস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে প্রায় সব ক্ষেত্র থেকেই অবলোকন করা সম্ভব ও উচিত। অতএব উক্ত বিষয়গুলোকেই এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করবো। সেগুলোর পর্যায়ক্রম হবে : (১) সামাজিক, (২) সাংস্কৃতিক, (৩) ধর্মসংক্রান্ত, এবং (৪) ইতিহাসবোধ ও রাজনীতিচেতনা।

॥ এক ॥

ক.

হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে এসে যে সব সমস্যা মুসলিম-মানসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো তার ভেতর একটা উল্লেখযোগ্য-স্থান জুড়ে রয়েছে অভিজাত প্রসঙ্গ—মুসলমানী ভাষায় যাকে 'আশরাফ' বলা হয়। ইসলাম ধর্মে প্রকৃতপক্ষে কোনপ্রকার

জাতিভেদ নেই। এটি তার একটি বৈশিষ্ট্য—যা পরবর্তীকালে ধর্মান্তরণের মাধ্যমে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দু সমাজের প্রভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এই জনসাধারণই সমাজে অনভিজাত—তৎকালে যাঁরা 'আতরাফ' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একারণে এই ব্যবস্থাকে 'শ্রেণীভেদ' আখ্যা দেওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

মুসলিম রচিত বাঙলা উপন্যাসে আশরাফ-আতরাফ প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে। মোহাম্মদ আবদুল হাকিম 'পল্লী-সংসার' উপন্যাসে মুসলমান সমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো (১) আশরাফ—সৈয়দ, শাহ, কাজী, মিঞা, খোন্দকার ও চৌধুরী, (২) উন্নতশীল মধ্য সমাজ—তালুকদার, আয়মার, হাওলাদার, বিশ্বাস, খাঁ, সরদার, মুনশী, ঠাকুর, মিনা ও মণ্ডল, (৩) আতরাফ—"ইহাদের অধিকাংশই বঙ্গীয় হিন্দুদিগের বংশধর।" লেখকের গোত্রজ্ঞান সীমিত। তা নাহলে তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন, মণ্ডল, বিশ্বাস, ঠাকুর ইত্যাদি হিন্দুদেরই পদবী। অতএব তাঁরা হিন্দুদের থেকে আগত। একজন ঔপন্যাসিক আশরাফের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন, "আশরাফ ভিন্ন অন্যান্য সকলেই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।...ইহারা কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য ঘৃণা করেন।...এই আশরাফগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘৃণাপ্রযুক্ত প্রায়ই দরিদ্র। উপযুক্ত বিদ্যা অভাবে চাকুরী দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেও অক্ষম.[১]

আশরাফশ্রেণীর অহমিকার মূলে জীবনের ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে একটি উপন্যাসে। নায়ক একজন উপজাতীয় নারীর প্রেমে পড়ে তাকে যথারীতি বিয়ে করেছিলো কিন্তু পারিবারিক অভিজ্ঞতা-বোধের চাপে তাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে—এমন কি তার

ধর্মান্তরণও অস্বীকৃত হয়েছে। কারণ "আভিজাত্যগৌরবহীনা পাহাড়িয়া জাতি সম্ভূতা" রমণীকে গ্রহণ করা যায়না।[২] কোন কোন ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাসে দেখিয়াছেন, আশরাফেরা মক্তবে আতরাফ ছাত্রদের পড়ার ব্যাপারে ভয় পেয়ে নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করছেন, "পাছে প্রতিবেশী সাধারণ লোকের ছেলেরা নিজেদের ছেলেদের অপেক্ষা বেশী বিদ্যা উপার্জন করিয়া বসে"[৩] অথবা চাষার ছেলে পড়লে আশরাফেরা অপমানিত হয়।[৪] একই আভিজাত্য সংরক্ষণের জন্যে আশরাফেরা আতরাফদের মসজিদ তৈরিতেও বাধা দিচ্ছে।[৫] অন্য একটি উপন্যাসে জনৈক মুক্তবুদ্ধি ও উদারচেতা ডাক্তারের স্ত্রীও নিজ বাড়িতে "আশরাফের ছেলে না হলে রেখে কাজ নেই" বলে অভিমত প্রকাশ করেছে।[৬] ঠিক একই সমস্যার মাধ্যমে অন্য একজন শিল্পী শ্রেণীসচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন।[৭] কোন কোন উপন্যাসে এই বোধের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়েছে—কখনো ছেলেমেয়ের বিয়ে শাদির ব্যাপারে নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি আরোপের মাধ্যমে[৮], বা এজাতীয় ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে রসাতলে নিমজ্জনের মাধ্যমে[৯], কখনো বা এই অর্থহীন গৌরবে একাসনে খেতে অনীহা প্রকাশ করে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে[১০]। এসব অভিজাতরা 'আতরাফ' আলমের পেছনে নামাজ পড়তেও অস্বীকৃত।[১১]

আশরাফ শ্রেণীর এই মেকী আভিজাত্যের চোখঝলসানো রূপে বিভ্রান্ত হয়ে অর্থের দ্বারা জাতক্রয়ের চিত্রও এসব উপন্যাসে দেখা যায়। একটি উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি অর্থাগমের ছলে টিনের ঘর করে "বেশারত আলী খোয়াড়ওয়ালা।" থেকে "মুনসী বেশারত আলী চৌধুরী"তে রূপান্তরিত হয়েছে[১২], অথবা আশরাফ বিয়ের মাধ্যমে "অর্থের নিকট কৌলিন্য নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার" করেছে।[১৩] কোথাওবা একটি সম্পর্কের মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জন করে আর একটি সম্পর্কের দিকে চেয়ে আছে।[১৪] আবার কোন

কোন উপন্যাসে এই বোধটিকে বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছে, যাতে মিথ্যা দম্ভের বদলে যুক্তিবাদী মনই প্রাধান্য পেয়েছে।[১৫]

আশরাফ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই সমস্যাটি যে ভাবেই আসুকনা কেন, প্রায় কোন লেখকই এই প্রবণতাটিকে সমর্থন করেননি। তাঁরা নানাভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে সমস্যাটি উপস্থাপিত করেছেন।

খ.

মুসলমানদের নানাপ্রকার জীবিকা সম্পর্কে এসব উপন্যাসে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব জীবিকার ভেতর তাদের জীবনের সুখ-দুঃখই শুধু নিহিত নয়, বরং এতদ্বারা মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের গোড়াপত্তনও হয়েছে। একারণেই জীবিকার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে মুসলিম সমাজ অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো তাদের ভেতর শিক্ষার আলো বিচ্ছুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার পথে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তার দ্বারাই মধ্যবিত্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়—যে সমাজ পরবর্তীকালে মুসলিম-মানস বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করে।

বঙ্গদেশের কৃষকদের বেশির ভাগই মুসলমান—এই উপলব্ধির অভাবে একদিন এদেশে বিপর্যয় নেমে এসেছিলো। কারণ এই বিপুল কৃষকশ্রেণীর বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন জমিদার—যাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। এই চেতনা যে মুসলমানদের ভেতরই বেশি ছিলো তা সহজে বুঝা যায়। এসব উপন্যাসে বঙ্গদেশের কৃষককুলের অবস্থা নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে—যাতে এক শ্রেণীর লোকের সাধারণ বর্ণনা বিধৃত। এর ভেতর সর্বাধিক দুর্ভাগ্যজনক হলো এই কৃষিজীবীদের ভাগ্যপরিবর্তনপ্রয়াসে অভিজাত শ্রেণীর বাধাদান। "যাহারা কৃষিকর্ম করে তাহারা চাষা—ছোটলোক। চাষারা শিক্ষিত হইলেও তাহাদের সঙ্গে এক বিছানায় বসিলে আশরাফী মর্য্যাদা নষ্ট

হয়।''[১৬] অতএব তাদের লেখাপড়া করার অধিকারও নেই। তবু কেউ জোর করে গড়তে চাইলে তাতে উত্থিত হয় নানাপ্রকার আপত্তি[১৭], না শুনলে নেমে আসে অসহনীয় নির্যাতন।[১৯] এসব কারণেই কখনো কখনো কৃষকের সন্তানেরা সুদিনে আশরাফদের পদলেহন করেছে বটে, কিন্তু পরিণামে তাদের জীবনে নেমে এসেছে সীমাহীন অন্ধকার।[২০]

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চাকুরী বাঙালীদের সর্বাধিক প্রিয় পেশা। এজন্যে তাঁরা নানাস্থলে নানাভাবে উপহসিত হয়েছেন[২১] কিন্তু তবু তাঁদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এতদ্বারা অল্প আয়াসে অর্থোপার্জন সহজ বলেই বাঙালীরা সযত্নে আজো সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। অবশ্য অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। তবে পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিলো। কারণ নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতার দরুন অভিজাতশ্রেণী ক্ষয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলো। ফলে চাকুরীর প্রতি তাঁদের ঘৃণা যত দুর্বার হোকনা কেন, তাঁদের ইংরেজি শিক্ষিত ছেলেরা চাকুরী গ্রহণে পরাঙ্মুখ হতে পারেনি[২২]; আবার শিক্ষার অভাবে চাকুরী করতে পারছেন না এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে।[২৩] যেহেতু ক্রমশ বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্রই এসব উপন্যাসে বেশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সেহেতু চাকুরীর ক্ষেত্রেও এই আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়েছে। ফলে বেশির ভাগ চাকুরেই ইনস্পেক্টার[২৪], ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট[২৫], সাবরেজিষ্টার[২৬], সাবজজ[২৭] ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে রয়েছেন। সরকারী অনুগ্রহে চাকুরীপ্রাপ্ত[২৮] চাকুরেরা প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদের সম্পর্কে খুবই সচেতন।[২৯] এসব উপন্যাসে শিক্ষকতাকে খুবই সম্মানিত পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে—কোন কোন ক্ষেত্রে বহুকাঙ্খিত ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী পরিত্যাগ করে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করতেও দেখা গেছে।[৩০] এই মনোভাবের সঙ্গে আদর্শচেতনাও জড়িত। চাকুরীর

ক্ষেত্রে সুপারিশও চালু ছিলো।[৩১]

মুসলমানদের জীবিকার একটা বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে ব্যবসা—যা মুসলমানদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উত্তরণের একটা বড় অবলম্বন। একটি উপন্যাসে দেখানো হয়েছে গ্রামের মুসলমানদের বেশির ভাগ ব্যবসায় লিপ্ত।[৩২] এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় হলো পাটব্যবসা—যা সমগ্র পূর্ববঙ্গে বিস্তৃত। এই ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থাগমের চিত্র যেমন রয়েছে[৩৩], তেমনি কোন কোন উপন্যাসে ধান, চাউল, তামাক, কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়।[৩৪] আবার কোন ব্যক্তিকে ব্যবসার মাধ্যমে জমিদারী ক্রয় করতেও দেখা যায়।[৩৫] ইসলাম ধর্মে সুদ হারাম।[৩৬] কিন্তু আধুনিক অর্থনীতির গোটাটাই দাঁড়িয়ে আছে সুদের উপর এই উপলব্ধি থেকেই মুসলিম লেখকদের অনেকেই সুদের ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছেন। কোনক্ষেত্রে সুদখোর ব্যক্তিকে উদার ও পরোপকারী হিসেবে চিত্রিত করা হলেও[৩৭], কোন কোন স্থলে এজাতীয় লোক হীনচিত্রেও চিত্রিত হয়েছে।[৩৮] সুদের ব্যাপারটিকে অনেকে যুক্তি দিয়েও বিশ্লেষণ করেছেন।[৩৯] তবে সুদের প্রতি মুসলমান লেখকদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ তাঁদের অর্থনীতিবোধের পরিচায়ক।

জমিদারীপ্রথা তখন আভিজাত্যের মূলে জলসিঞ্চন করছিলো। কারণ সরকার ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে অসহায় হয়ে এই শ্রেণীটিকে সঙ্ঘবদ্ধ করছিলো এবং এতদ্দ্বারা তার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াস পাচ্ছিলো। কিন্তু মুসলমান জমিদারদের অবস্থা তখন অন্য রকম। এসব উপন্যাসে তার কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যায়, যাতে দুটো অবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর একটা হলো জমিদারী পতনের কারণ, অপরটি তাদের অত্যাচার। জমিদারী পতনের মূলে দুটি কারণ প্রাধান্য পেয়েছে। এর একটা হলো মামলা-মোকদ্দমা—যা কখনো ঘটেছে হিন্দুর সঙ্গে[৪০], কখনো বা মুসলমানের সঙ্গে।[৪১] কখনো বা আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখার জন্যে ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্তও জমিদারী বিক্রয় করতে দেখা গেছে।[৪২] কোন কোন উপন্যাসে বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাজনিত অপব্যয়কেও এর জন্যে দায়ী করা হয়েছে।[৪৩] এসব জমিদারের সন্তান-সন্ততিরা কখনো কখনো জীবিকার মাধ্যম যেমন পরিবর্তন করেছে[৪৪] তেমনি ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছে[৪৫] —এই আকর্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের রাজনীতিসচেতনও করে তুলেছে।[৪৬] জমিদারের অত্যাচারের চিত্রও এসব উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে—যা কখনো কখনো সামাজিক অপরাধে রূপান্তরিত হয়ে নানাপ্রকার দুঃখ-বেদনার কারণ হয়েছে।[৪৭] এজাতীয় অত্যাচার প্রতিরোধের জন্যে ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনও দুর্লক্ষ্য নয়।[৪৮]

মুসলিম সমাজে ধর্ম্মব্যবসার মাধ্যমে উপার্জ্জনের রেওয়াজও তখন ছিলো। এর ভেতর পীর-মুরিদী, ওয়াজমওলুদ, মোয়াযনী ইত্যাদি নানাপ্রকার মাধ্যম বিবৃত হয়েছে।[৪৯] কিন্তু উপজীবিকাগুলো প্রায়ই লেখকদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

গ.

এসব উপন্যাসে নানাভাবে নারীপ্রসঙ্গ এসেছে। ইসলাম ধর্ম্মে নারীর অবস্থান যাই হোক না কেন, মুসলিম সমাজে এ নিয়ে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কারণ নারীসমাজ সর্বদাই নানাভাবে পুরুষের দ্বারা নির্যাতিতা। এই নির্যাতনের প্রত্যক্ষ রূপ অবলোকন করি না বলে আমরা তার প্রতিক্রিয়াও উপলব্ধি করতে পারি না। এসব উপন্যাসে তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রভাবে নারীর সাধারণ বিকাশ চাপা পড়ে গেছে। তবু মাঝে-মধ্যে এনিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

নারীর প্রধান আকর্ষণ তার রূপ। অতএব যুগ যুগ ধরে নারীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ পতঙ্গের মতো তার প্রতি প্রধাবিত হয়েছে, তার মন নারীর "মোহিনী-মূর্ত্তির সুতীক্ষ্ণ নয়নবাণে বিদ্ধ" হয়েছে[৫০] অতএব স্বাভাবিকভাবেই এসব উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে

রয়েছে নারীর রূপকল্পনা। এই কল্পনায় কোন বালিকার বিশাল পটলচেরা চক্ষু দুটি হইতে প্রেমিক জনকে আয়ত্ব করিবার জন্য গম্ভীর কটাক্ষ শর নিক্ষিপ্ত হয়—তাহার আকর্ণ-বিস্তারিত ধনুকস্বরূপ ভ্রূযুগল, তাহার ঈষদুচ্চ অথচ সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক চারু নাসিকা, সুন্দর পাতলা ওষ্ঠাধর, হংস সদৃশ গ্রীবাদেশ, চারু মৃণাল ভুজ, ক্ষীণ কটি দেশ, সুন্দর চরণারবিন্দ এসব দর্শনে লোক মুগ্ধ হয়, সমস্ত শরীরে তাহার সৌন্দর্য্য খেলিতেছে, সরলতা তাহার চারু বদনমণ্ডলে বিরাজমান"[৫১ক] , কখনো অন্যকে মনে হয়, "বোধহয় বিধাতা বিরলে বসিয়া এই অপার্থিব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নিগ্ধ জ্যোতিপূর্ণ আয়ত নয়ন, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা, মুক্তাপাতির ন্যায় দর্শনাবলী। ললাট ক্ষুদ্র—দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় সুষমা-দীপ্ত। কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশ রাশি অতি আনন্দদায়ক। তাহার সর্বাঙ্গেই যেন লাবণ্যলহরী ক্রীড়া করিয়া ফিরিতেছে।"[৫১] এজাতীয় রূপবর্ণনার আদর্শ যে মধ্যযুগীয় তা যে কোন পাঠকের চোখে পড়বে। এছাড়া অল্পকথায় নারীর রূপকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসও অনেক উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।[৫২]

নারীপ্রসঙ্গ যখনি আলোচিত হয়, তখনি অবরোধের কথা এসে পড়ে। মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে অবরোধপ্রসঙ্গ নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে সাধারণভাবে প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই অবরোধপ্রথা চিত্রিত হয়েছে। সে কারণে এসব উপন্যাসে প্রায়ই পূর্বরাগ নেই। কিন্তু এই প্রথার অন্তরালে নিষ্পেষিত নারীসত্তার আর্তনাদ ও অবমাননা বহু লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে তাঁদের অনেকে এই প্রসঙ্গে ধর্মের বিধান অস্বীকার করতে চেয়েছেন কখনো কখনো তা সাধারণ আচরণের ভেতর[৫৩] , কখনো প্রকাশ্য বিরোধিতার মাধ্যমে।[৫৪] তবে পাড়াগাঁয়ে বোরখার প্রচলন ছিলো না[৫৫] নারীর রূপ যাতে পুরুষের দৃষ্টিসীমায় না আসে, তার জন্যে সাধারণ অবরোধ ছাড়াও নানাপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো।

ট্রেনে মেয়েদের আব্রু থাকেনা বলে অভিজাত কর্তারা ট্রেনে মেয়ে চলাচলের বদলে নৌকায় যাতায়াতই বেশি পসন্দ করতেন[৫৬], গরুর গাড়িতে করে এলেও ট্রেনে ওঠার সময় বা ট্রেন থেকে নামার সময় চারিদিকে কাপড়ঘেরা পাল্কীর সাহায্য গ্রহণ করা হতো।[৫৭] পাল্কীর মুখ খুলে ট্রেনের দরজার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হতো। গ্রামাঞ্চলে নারীরা বেশির ভাগই নৌকায় চলাচল করতো।[৫৮] কারণ নৌকায় পর্দার সুবিধে তুলনামূলকভাবে বেশি। এর প্রতিক্রিয়াও বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়েছে—যা সাধারণতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ করেছে।[৫৯] এছাড়া চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। কোন কোন উপন্যাসে এই বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে[৬০], কখনো বা সর্বাঙ্গে কাপড় দিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে একটা আপোষ রফা টানা হয়েছে।[৬১] হিন্দু সমাজেও অবরোধ ছিলো।[৬২] কোন কোন উপন্যাসে এই প্রথার সমর্থনও দুর্লক্ষ্য নয়।[৬৩]

পর্দা, অবরোধ এবং এজাতীয় নানাপ্রকার নির্যাতন সত্ত্বেও এই সময়কার ঔপন্যাসিকেরা বিভিন্নভাবে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধের জয়গান করেছেন। এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যদিও নারীরা প্রায় উপন্যাসেই নিজেদের পুরুষের দাসী ও চরণাশ্রিতারূপে প্রকাশ করেছে, তথাপি পুরুষেরা তাদের মর্যাদা স্বীকারে কুণ্ঠিত নয়।[৬৪] এই বোধ কখনো এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, পুরুষ নারীর প্রভাব অস্বীকার করতে তো পারছেইনা, উপরন্তু তাকে নারীর লোভ ও লালসার যোগানদার হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে—তার ইচ্ছে থাক বা না থাক।[৬৫] নারী ইচ্ছে করলেই তার অধিকার আদায়ের জন্যে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাতে নারীত্বের বিজয় নেই[৬৬], বরং স্বামী পরিত্যাগ করলে আইনের সাহায্যে তাকে বশীভূত না করে দেখানো উচিত যে, বিবাহিত জীবনই নারীর জন্যে শেষ কথা নয়।[৬৭] কোন উপন্যাসে নারীর অসহায়তার জন্যে ক্ষোভ

প্রকাশ করা হয়েছে, কেন নারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়না ?[৬৮]

এছাড়া নারীর নানাপ্রকার দোষত্রুটিও উপন্যাসগুলোতে দেখানো হয়েছে, সেগুলো নানাপ্রকার সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এসব দোষত্রুটির ভেতর রয়েছে স্বামীর ঘরের জিনিষ পত্র চুরি করে বাপের বাড়িতে পাচার করা[৬৯], সৎসন্তান বা আশ্রিতের প্রতি দুর্ব্যবহার[৭০] নারীর পরনিন্দা[৭১], সপত্নীবিদ্বেষ এবং তৎসংক্রান্ত অনুভূতি[৭২] ইত্যাদি। এছাড়া ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নারীকে স্বামীহন্ত্রীরূপেও দেখানো হয়েছে, যার মূলে কাজ করেছে সপত্নীবিদ্বেষ।[৭৩]

ঘ.

এসব উপন্যাসে বিবাহ সম্পর্কেও নানাপ্রকার ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে আলোচনায় বিধবা বিবাহও রয়েছে। যদিও বিধবা বিবাহ মুসলমানের জন্যে কখনোই সমস্যা ছিলোনা, তবু বর্ণহিন্দুদের দেখাদেখি এই সমাজেও সমস্যাটি দেখা দেয়। বিধবা-বিবাহ চালু থাকায় এসব উপন্যাসে আক্ষেপ করার চিত্র যেমন রয়েছে[৭৪], তেমনি কখনো কখনো যে বিধবা বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাও দেখানো হয়েছে।[৭৫] বিধবা বিবাহ চালু থাকলেও কুমার পুত্রের সঙ্গে বিধবা নারীর বিয়ের ব্যাপারে সংস্কার তখনো বিদ্যমান ছিলো।[৭৬] এমনিতে ব্যাপকভাবে বিধবাবিবাহ চালু থাকলেও[৭৭], আশরাফ সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিধবা বিবাহের ব্যাপারে একেবারেই গররাজি ছিলেন।[৭৮]

হিন্দু সমাজের প্রভাবে বিস্তৃত যৌতুকপ্রথাও এসব উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে যৌতুক প্রদানের রীতি স্বীকৃত হলেও এর বিরুদ্ধেও মতামত প্রদান করা হয়েছে।[৭৯] যৌতুকের জন্যে লাঞ্ছনার চিত্রও[৮০] বিরুদ্ধ মতেরই শামিল। অবশ্য কোন কোন উপন্যাসে শ্বশুরের খরচে লেখাপড়ার চিত্র যেমন রয়েছে[৮১], তেমনি অভাবের তাড়নায় শ্বশুরের কাছে পড়ার খরচ দাবিও চোখে পড়ে[৮২]

তবে অধিকাংশ উপন্যাসে এই প্রথার প্রচলন প্রচ্ছন্নভাবে দেখানো হয়েছে।

বিবাহপদ্ধতির চিত্রও এসব উপন্যাসে দেখা যায়। বিবাহ যে পটভূমিতে দেখানো হোক না কেন, প্রায় চিত্রেই বাঙালীয়ানা আরোপ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।[৮৩] এছাড়া বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত বিবাহের বেশির ভাগেই গতানুগতিক বিবাহপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।[৮৪] তবে বিবাহের কনেদেখা এসময়কার মুসলমান লেখকদের জন্যে একটা সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিলো। কারণ ধর্মের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ভেদ করে এই নিয়মের স্বরূপ আবিষ্কার করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিলোনা, ফলে হিন্দুদের কনেদেখা যেমন সমালোচিত হয়েছে[৮৫], তেমনি বিয়ের আগে বরকনে পরস্পরকে দেখার ও জানার সুযোগ পায়না বলে আক্ষেপও করা হয়েছে।[৮৬]

বাল্যবিবাহ মুসলমান সমাজে খুব উৎসাহিত হতো বলে মনে হয় না। কারণ প্রায় উপন্যাসেই পাত্রীর বয়সের ব্যাপারে লেখকগণ সচেতন। ফলে বাল্যবিবাহপ্রথা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত যেমন হয়েছে[৮৭], তেমনি "অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে, তাদের সন্তান-সন্ততি প্রায়ই রুগ্ন, ক্ষীণকায় এবং স্বল্পায়ু হয়" বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।[৮৮] বিবাহের অনুভূতি প্রায়ই পরস্পর সম্পূরক। অর্থাৎ নারী যেমন পুরুষের দাসী হিসেবে তার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে[৮৯], তেমনি পুরুষও বিয়েকে নারীর পায়ে দাসখৎ লিখে দেওয়া বলে উল্লেখ করেছে[৯০] এছাড়া বিয়ের পর বরকনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি (শাহ-নজর)[৯১], ফুলশয্যা, ও ফিরানী[৯২] ইত্যাদি বিষয়েও লেখকদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, বিবাহবিচ্ছেদের (তালাক) চিত্র মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে একেবারেই দুর্লভ—অন্ততঃ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো নয়। তবে পারিবারিক আভিজাত্যবোধের তাড়নায় একটি বিবাহ বিচ্ছেদের চিত্র দেখা যায়—যেখানে নায়ক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

কাজটি করেছে।[৯৩] এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তালাক প্রদানের একটি চিত্রও রয়েছে।[৯৪] এই দুটো বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্যযোগ্য। তা হলো নায়কের প্রতিক্রিয়া এবং নায়িকার শোচনীয় পরিণাম। এই উভয় দিকই লেখকের মানসিকতা জানার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন।

মুসলিম সমাজে সর্বাধিক জটিল সমস্যা হলো বহুবিবাহ। ইসলাম ধর্মে একত্রে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা সিদ্ধ।[৯৫] সে হিসেবে এই প্রথাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কোন স্ত্রীর পক্ষেই সপত্নী নিয়ে পরিপূর্ণ সুখে বসবাস করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ প্রেম-পরিণয়ের ব্যাপারে এত স্পর্শকাতর যে, এক্ষেত্রে কোনপ্রকার যুক্তিতর্ক চলেনা। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করলে এর অশুভ প্রভাব সমাজে পড়বেই। তবু কেউবা বহুবিবাহ সমর্থন করেছেন[৯৬], অনেকে এর সমালোচনা করেছেন বিরুদ্ধ মতামত প্রদানের মাধ্যমে।[৯৭] অনেকেই সতীনের সঙ্গে সুখে সংসার যাপনের চিত্র যেমন এঁকেছেন[৯৮], তেমনি অনেকেই দেখিয়েছেন পাত্র-পাত্রী প্রথমে সুখী না হলেও নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে পরে সুখী হয়েছে।[৯৯] আবার বহু নারী সারাজীবন সুখের মুখ দেখেনি।[১০০] গোলাম মোস্তফা এই ব্যাপারে দুকূল রক্ষা করেছেন। কারণ তাঁর উভয় উপন্যাসেই প্রথম স্ত্রী স্বামীর অতৃপ্তি উপলব্ধি করে তাকে দ্বিতীয় বিয়েতে প্ররোচিত করেছে বটে, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে একজনের মৃত্যুর পর তাদের জীবনে সুখ নেমে এসেছে[১০১], অন্যত্র বিচ্ছেদ ও মৃত্যুজনিত কারণে নেমে এসেছে ট্র্যাজেডি, সুখ নয়।[১০২] সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতামত বহু বিবাহের প্রতিকূলেই ছিলো।

ঙ.

বঙ্গদেশের দুটি প্রধান অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান। অতএব সমাজ জীবনে তাদের সম্পর্কের প্রভাব পড়বেই। সেজন্যে এসব উপন্যাসেও

তার বহু রূপ রয়েছে। কোন কোন ঔপন্যাসিক নির্জলা হিন্দুজীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন, যাতে মুসলিম চরিত্র নেই বললেই চলে।[১০৩] এতদ্দ্বারা মুসলমানদের উৎসাহ, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের যেমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি সৌহার্দ্যেরও। এছাড়া প্রায় সব উপন্যাসেই হিন্দু চরিত্র রয়েছে।[১০৪] এসব চরিত্র নির্মাণে মুসলমান লেখকদের উদার ও নিরপেক্ষ ভূমিকা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। এছাড়া হিন্দুঘরে মুসলমানের সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমেও[১০৫] উভয় সম্প্রদায়ের ভেতর ভালো সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মুসলমানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হিন্দুদের অংশগ্রহণের চিত্রে[১০৬] হিন্দু মুসলমান সুসম্পর্কের আভাস যেমন রয়েছে, তেমনি হিন্দু-মানসের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতনতার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। এই সচেতনতা স্বতোৎসারিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই হিন্দু লেখকদের উপন্যাসে তুলনামূলকভাবে মুসলিম চিত্র খুবই কম ছিলো। অবশ্য এর কারণ রয়েছে। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের আকাঙ্খার কথাও এসব উপন্যাসে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে।[১০৭]

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সর্বাধিক বিতর্কিত দিক হলো হিন্দু-মুসলিম প্রণয়। এই প্রণয়চিত্রের একদিকে আছে হিন্দু লেখকদের উপন্যাসে বিধৃত হিন্দু পুরুষের সঙ্গে মুসলিম মহিলার প্রেমের প্রতিবাদ ; অন্যদিকে উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ প্রেমের চিত্র। প্রথম কারণটিতে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। একারণে এসব চিত্রের[১০৮] শৈল্পিক মূল্য শূন্যের কোঠায়। কারণ তাঁরা এসব উপন্যাসের মাধ্যমে চরিত্রসৃষ্টির চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন মুসলমানদের একতরফা গুণাবলী বিশ্লেষণে— যা নানাভাবে হিন্দু মহিলাদের তাদের প্রতি আকর্ষণ করেছে। এসব লেখকের সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান আছে বলেও মনে হয়না। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে নরনারীর হৃদয়নিঙড়ানো ভালোবাসার চিত্র—যার

সামাজিক ব্যাখ্যা সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। এসব প্রেম কাহিনীর পেছনে লেখকের পূর্বরাগচিত্র অঙ্কনের আকাঙ্খাই বেশি কাজ করেছে। কারণ, অবরোধের কঠিন নিগড়ে বাঁধা মুসলিম পারিবারিক জীবনে পূর্বরাগের সুযোগ একেবারেই ছিলোনা—হিন্দু তো দূরের কথা, মুসলমানের পক্ষেও মুসলিম অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো। একারণে মুসলিম নরনারীর ক্ষেত্রেও পূর্বরাগের সুযোগ ছিলো অত্যন্ত সীমিত। ফলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে হয়েছে হিন্দু পরিবারের সঙ্গে মিশে। প্রণয় একতরফা হওয়ার কারণও তাই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম ও পরিণয় উপলব্ধি করার মতো শিক্ষা—যা হিন্দুসমাজেই সুলভ, মুসলমান সমাজে নয়। এসব উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, হৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। এসব লেখক জানেন, সমাজ ও ধর্মকে স্বীকৃতি প্রদান করা ছাড়া কারো কাছ থেকেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাওয়া যায় না। এসব প্রেমের ক্ষেত্রে মিলনের চিত্র যেমন রয়েছে[১০৯] তেমনি ব্যর্থতার চিত্রও কম নয়।[১১০] আবার কিছু কিছু একতরফা প্রেমের চিত্রও রয়েছে।[১১১]

কিছু কিছু উপন্যাসে নদী বা পুকুরের ঘাটে হিন্দু রমণীদের স্নানের দৃশ্য দেখা যায়।[১১২] এসব দৃশ্যে লেখকেরা শুধু সৌন্দর্যই দেখেছেন। ফলে কোন প্রকার বিকৃতি দৃশ্যগুলোকে ভারাক্রান্ত করতে পারেনি। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'নদীবক্ষে' এই ধরণের দৃশ্যে কোন কোন চরিত্র বিকৃত রুচিকর মন্তব্য করেছে বটে, কিন্তু নায়ক তার প্রতিবাদ করেছে। এসব দৃশ্যে মুসলিম রমণীর অনুপস্থিতির কারণও উল্লিখিত অবরোধ প্রথার কড়াকড়ি। ব্যতিক্রম শুধু নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আনোয়ারা'।

চ.

এছাড়া শহর ও গ্রামের নানাপ্রকার সমস্যাও এসব উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। এসব সমস্যার নানামুখী গতি লেখকদের সমাজচেতনা

সূচিত করে।

এসব সমস্যার ভেতর রয়েছে ব্যবসায়ীদের ভেতর দুর্নীতি। *শহরের বিভিন্নস্থানে ব্যবসায়ীদের কারসাজি, খাদ্যদ্রব্যে নানাপ্রকার* ভেজাল[১১৪] এসব দুর্নীতির শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এছাড়া যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বি র্যয়ে অর্থাগমের চিত্রও দেখা যায়।[১১৫] এসব কাজকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এগুলো সামাজিক অপরাধ বৈ আর কিছুই নয়। বহু উপন্যাসে ডাকাত এবং তাদের অবস্থার চিত্রও রয়েছে। এসব ডাকাতের সাধারণ ঘটনাধারাতো আছেই[১১৬], কখনো কখনো ডাকাতের ভেতরে লেখকেরা মনুষ্যত্ববোধও আবিষ্কার করেছেন।[১১৭] গ্রামের ভেতর অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার গানবাজনার আসর এসব চুরি-ডাকাতির উৎস।[১১৮]

ঘুষ উৎকোচের চিত্রও এসব উপন্যাসে পাওয়া যায়। কেউ ভালো ঘরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে গ্রামের মোড়লদের ঘুষ দিচ্ছে[১১৯], কেউবা ঘুষের টাকায় জমিদারী কিনে হজ করে এসে ধর্মীয় প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের দুর্গতি টেনে আনছে।[১২০] উপরন্তু ঘুষ খাওয়ার অপরাধে চাকুরীচ্যুতির প্রমাণও আছে।[২২১] এছাড়া রয়েছে নারী অপহরণ ও নারী নির্যাতন। নারী অপহরণের পেছনে নানাপ্রকার কারণ কাজ করেছে। কখনো এই কাজ সংঘটিত হয়েছে ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করার জন্যে[১২২], কখনো বা বিয়ে করার উদ্দেশ্যে[১২৩], কখনো প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্যে[১২৪] নারী নির্যাতনের ভেতর রয়েছে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সন্দেহ[১২৫], প্রহার[১২৬], সাময়িকভাবে পরিত্যাগ[১২৭], নানাভাবে স্ত্রীকে স্বামীগৃহে যেতে বাধ্যকরণ[১২৮] এবং তালাক।[১২৯] এর ভেতর তালাক ও প্রহারের প্রতিক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রেই ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

থানা-পুলিশ ও মামলা-মোকদ্দমার চিত্রও এসব উপন্যাসে প্রচুর পাওয়া যায়। এসব চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেন

যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যি দুর্লভ। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' এবং 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে তিনি তো প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া কোন কোন উপন্যাসে সাধারণ মামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ব্যবহার ও অর্থগ্রহণের চিত্র যেমন রয়েছে[১৩০], তেমনি দাঙ্গা উপলক্ষ্যে পুলিশী সুলভ প্রকৃত আসামীর স্থলে নিরপরাধ লোক গ্রেফতারের চিত্রও রয়েছে।[১৩১] বৃটিশ রাজত্বের কল্যাণে সর্বস্বান্ত হওয়ার যেসব পথ সম্পর্কে আমরা অহরহ সচেতন, তার ভেতর প্রধান ভূমিকা পালন করেছে মামলা-মোকদ্দমা। এসব উপন্যাসের অনেক ক্ষেত্রেই মামলা মোকদ্দমায় পড়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার চিত্র যেমন রয়েছে[১৩২], তেমনি এসব মামলাকে কেন্দ্র করে শুভবুদ্ধির জাগরণও দুর্লক্ষ্য নয়।[১৩৩]

এছাড়াও রয়েছে গ্রাম্য দলাদলি[১৩৪] গ্রামে দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা[১৩৫], অতীত ও বর্তমানের সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা[১৩৬] ইত্যাদি।

মুসলমানদের বিশেষণ নিয়ে তৎকালে বহু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। একশ্রেণীর হিন্দু লেখক মুসলমানদের এমন সব বিশেষণে ভূষিত করেছেন যে, তা অনেকক্ষেত্রেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমন অবস্থা মুসলমানদের উপন্যাসেও যে নানাপ্রকার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে তা খুবই স্বাভাবিক। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী তাঁর 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের উপক্রমণিকায় বাঙালী ও মুসলমানদের আলাদাভাবে দেখিয়েছেন—যাতে বরাবরই 'বাঙালী' বলতে হিন্দুদেরই বুঝানো হয়েছে। হিন্দু কর্তৃক ভদ্রলোক বেশি না মুসলমান বেশি প্রশ্ন[১৩৭] এবং "ভদ্রলোকের পাড়ায় মুসলমানকে" থাকতে না দেওয়ার ইচ্ছার[১৩৮] মাধ্যমে যেমন এই প্রশ্নটিকে সামনে টেনে আনা হয়েছে, তেমনি এই প্রবণতাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপও করা হয়েছে।[১৩৯] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা উনবিংশ শতাব্দীর আরো দুয়েকজন লেখক মুসলমানদের বিশেষণ নিয়ে যেমন নানা

ভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন, তেমনি জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের মতো লেখকও এই প্রভাব এড়াতে পারেননি। শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে খেলার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে "বাঙালী ও মুসলমান" ছাত্রদের ভেতর একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন।[১৪০] সে হিসেবে মুসলমান লেখকেরা বরং চেতনাবোধের পরিচয়ই প্রদান করেছেন। কারণ সবক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য ছিলোনা।

এসব উপন্যাসের কোন কোন স্থলে মৃত্যু দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। এসব দৃশ্যে একক মৃত্যুর চিত্রই বেশি।[১৪১] কখনো বা মৃত্যুদৃশ্য নেপথ্যে রেখে কাহিনীর গতি সামনের দিকে টেনে নেওয়া হয়েছে[১৪২] মৃত্যুর একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী তাঁর 'আত্মদান' উপন্যাসে। নায়ক খোরশেদ আলির মৃত্যুসংবাদ শুনার পর গ্রামবাসীদের সেই বাড়িতে আগমন এবং মৃতদেহ কবরস্থ করার প্রাক্কালে বাড়ির নারীপুরুষের বুককাটা আর্তনাদ একেবারে বাস্তব থেকে আহৃত। এসব উপন্যাসে জন্মদৃশ্যগুলোও চক্ষুগ্রাহ্য নয়।

॥ দুই ॥

ক.

মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষা। কারণ শিক্ষা ছাড়া সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা ছিলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এসব উপন্যাসে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে অনেকে আভাস প্রদান করেছেন। গ্রামে স্কুল-কলেজের অপ্রতুলতার দরুণ লেখাপড়ার সুযোগ ছিলোনা। বিত্তশালীদের ধারণা, গ্রামের "স্কুলে ব্যবসায়ী হিন্দু ও কৃষিজীবী মোসলমানের ছেলে-পিলেই অধিকাংশ পড়ে। তাহাদের উচ্চশিক্ষার আবশ্যক কি?"[১৪৩] তবু বহু উৎসাহী দরিদ্র সন্তান প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে শিক্ষা-

লাভ করেছে।[১৪৪] এদের বেশির ভাগেরই অবলম্বন ছিলো জায়গির। অনেককেই আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতেও হয়েছে।[১৪৫] দারিদ্র ছাড়াও মুসলিম শিক্ষাবিস্তারের পেছনে আভিজাত্যের অহমিকা এবং আলেমদের ফতোয়াও প্রভূত পরিমাণে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। কারণ তাঁরা শিক্ষাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন।[১৪৬] তবে অনেকগুলো উপন্যাসেই নায়ক-নায়িকার ভেতর শিক্ষানুরাগ দেখা যায়।[১৪৭] তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে ইংরেজি শিক্ষাপ্রবর্তন করতে না পারলে মুসমমানদের উন্নতি নেই।[১৪৮] এমনকি জমিদার বা জমিদার তনয়ের ভেতরও এই উৎসাহ দুর্লক্ষ্য নয়।[১৪৯] ফলে তারা নানাভাবে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পথে সহায়তা করেছে। কখনো অর্থের বিনিময়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে[১৫০], কখনো বা নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের মুসলমানদের শিক্ষার পথ সুগম করতে হয়েছে।[১৫১] এমনকি মৃত ব্যক্তির নামে পাঠাগার[১৫২] ও বিদ্যালয়[১৫৩] স্থাপনের দৃষ্টান্তও রয়েছে।

শুধু তাই নয়, এসব উপন্যাসে স্ত্রীশিক্ষার আভাসও রয়েছে। যদিও তখনো পর্যন্ত স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার নামে অনেকেই আঁৎকে উঠছে[১৫৪], তবু স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এসময়কার ঔপন্যাসিকেরা যথেষ্ঠ আগ্রহের পরিচয় প্রদান করেছেন। এই পরিচয় নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কখনো প্রয়োগিক শিকার গুণগাণ প্রসঙ্গে[১৫৫], কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিক্ষাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে[১৫৬] কখনো কখনো ব্যক্তিগত বা সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টায়[১৫৭], কখনো বা মৃত ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার্থে স্ত্রীশিক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে।[১৫৮] তবে স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গ সর্বদাই স্ত্রী·শিক্ষার বিরোধিতা করেছে[১৫৯] —তাতে ব্যাপকভাবে জলসিঞ্চন করেছে অবরোধ প্রথা।

এই সময় অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চবংশে শিক্ষার কদর ছিলোনা। উচ্চবংশে শিক্ষার অমর্যাদা কখনো বিত্তশালী মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্যে দরিদ্রের ভেতর থেকে শিক্ষিত ও চরিত্রবান ছেলে অন্বেষণে

আত্মপ্রকাশ করেছে[১৬০], কখনো বা সাধারণ বিরোধিতার ফলে শিক্ষালাভের সুযোগ না ঘটায়।[১৬১] কারণ গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদের উচ্চশিক্ষার প্রতি কোন আকর্ষণই ছিলোনা।[১৬২]

এছাড়াও নানাভাবে এসব উপন্যাসে শিক্ষাপ্রসঙ্গ এসেছে। বৃত্তি পাওয়ার পর শিক্ষকদের দাওয়াৎ করে খাওয়ানো[১৬৩], জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিত্র-ভাস্কর্য সম্পর্কে সচেতনতা[১৬৪], বিজ্ঞানবিদ্বেষ[১৬৫], কবি ও কবিতার নিন্দা[১৬৬] ইত্যাদি। এই সময় সরকারী সাহায্য ছাড়াও স্কুল পরিচালনার প্রমাণ যেমন পাওয়া যায়[১৬৭], তেমনি স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাল্পতার খতিয়ানও মিলে।[১৬৮]

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের উন্মেষ পর্বটি একটি বিশেষ কারণে মুসলমানদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। তখন মাতৃভাষা নিয়ে মুসলমানদের ভেতর যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছিলো। ফরিদপুরের নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৮০ খ্রীঃ হাণ্টার কমিশনের সামনে সাক্ষ্যপ্রদানকালে আশরাফ মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু বলে ঘোষণা করার পর থেকেই এই বিতর্কের সূচনা। সম্ভবতঃ একারণেই এসব উপন্যাসে মাতৃভাষা প্রসঙ্গ এসেছে। এসব উপন্যাসের অনেকগুলোতেই পাত্রপাত্রীদের বাঙলা বই পড়তে দেখা যায়।[১৬৯] এসব বইয়ের ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়' ও 'সীতার বনবাস', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইত্যাদি। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ইংরেজির তুলনায় বাঙলা ভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[১৭০] এই মনোভাব সেকালের পক্ষে ছিলোবৈপ্লবিক। শুধু তাই নয়, নারীদের ভেতরও রীতিমতো ভালো বাঙলাচর্চার দৃষ্টান্ত রয়েছে[১৭১] উর্দু, আরবী ও ফারসী ভাষার চর্চাতো তখন ছিলোই। কখনো নায়ক-নায়িকা শুধু উর্দু শিখেছে[১৭২], কখনো বা তাদের শিক্ষা শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ ছিলো।[১৭৩] ব্যবহারিক জীবনে উর্দু বেশ চালু ছিলো। একারণেই উর্দু জানা ছাড়া কলকাতায়

টিউশনি পাওয়া যেতোনা।[১৭৪]

খ.

গ্রাম-বাঙালা জুড়ে কুসংস্কারের আখড়া। এসব কুসংস্কারের উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, এর কিছু কিছু আবহমানকাল থেকে লোকজীবনে প্রচলিত, কিছু ধর্মভিত্তিক, আবার অনেকগুলো বিদেশ থেকে আসত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ফলে আজ নগর জীবনে এসব কুসংস্কার বিলুপ্ত হতে চলেছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনো তার প্রতাপ কম নয়।

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে এসব কুসংস্কার নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নবজাত শিশুর প্রতি অধিক মনোযোগকে কেন্দ্র করে যেসব কুসংস্কার গড়ে উঠেছে তার ভেতর একটা হলো নবজাত শিশুর শিয়রে দোয়াত-কলম প্রদান—যার দ্বারা শিশুর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তেমনি সুতিকাকক্ষের দ্বারদেশে মাছ ধরার জালের টুকরো এবং তেরিশ কাঁটার একটা ডাল থাকলে শিশুর কোন অনিষ্ট হয়না।[১৭৫] অনুরূপ তাবিজ, ফুঁ দেওয়া, তেলপড়া, পানিপড়া ইত্যাদির চিত্রও এসব উপন্যাসের কোন কোনটিতে দেখা যায়।[১৭৬] মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তাঁর একটি উপন্যাসে হিন্দুদের অনুকরণে বধুবরণের জন্যে দেউড়ীতে কলাগাছ ও মঙ্গলঘট এবং ঘটের মুখে ফুল ও ফুলের পাতা স্থাপনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।[১৭৭] পানি তুলতে কলসীর দড়ি ছেঁড়াকে শুভ কাজের পক্ষে বিঘ্ন মনে করে আত্মীয় স্বজনের মনে আরোপিত বিশ্বাসও[১৭৮] এই কুসংস্কারেরই প্রকারভেদ। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে দুটো বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন। এর একটা হলো, দূর থেকে আসায় স্ত্রী তার স্বামীকে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করছে, অনুরূপ বাইরে থেকে আসার পর মা তার ছেলেকে কোন জিনিসে হাত দিতে বারণ করছে। একই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে নায়ক শুভকাজে বাইরে যাওয়ার সময় তার প্রেমিকা তাকে পেছন থেকে ডাকায় মা শঙ্কিত হয়ে তাকে

আবারো ঘরে ঢুকে একটু বসে রওয়ানা হতে বলছে। এসব যে হিন্দুরই অনুকরণ এবং এরকম আশঙ্কায় যে কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, সেকথাও অন্য চরিত্রের মুখে বলা হয়েছে।[১৭৯] এই পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসই গ্রামের ক্ষেত্রে বাস্তব। "জুমার নমাজান্তে বিবাহের লগ্ন" স্থিরীকৃতির[১৮০] পেছনেও সেই একই পরস্পরবিরোধী ধ্যানধারণা কাজ করেছে।

কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এসব উপন্যাসে মুক্তবুদ্ধি-চর্চারও প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। কখনো পাত্রপাত্রীর হাবভাব ও চালচলনে এই বোধ চালিয়ে দেওয়া হয়েছে[১৮১], কখনো বা হিন্দু মুসলমানের ভেতর একই দোষগুণ প্রদর্শনের মাধ্যমে[১৮২], কখনো ধর্মের উদার ব্যাখ্যাপ্রদানের মাধ্যমে।[১৮৩] এই বোধ ঐতিহাসিক সত্য-নিরূপণের ক্ষেত্রেও দুর্লক্ষ্য নয়—যেখানে মানবিক আবেগ-অনুভূতির কাছে হিন্দুমুসলিম একাকার।[১৮৪] শেখ আবদুর রহিম বুদ্ধিজীবীদের উচ্চাকাঙ্খার নিন্দা করে বিকাশের ক্ষেত্রে এক একটি বাধা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন।[১৮৫] নিছক জানার জন্য সংস্কৃতচর্চাও এই ধারণার পরিপোষক।[১৮৬] এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের বিশ্বাস। নায়ক-নায়িকার সংলাপের মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন, মসজিদের চেয়ে স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপন অনেক ভালো। সংলাপটি উদ্ধৃত হলো :

> "একদিন নূরী স্বামীকে কহিল, আল্লার ফজলে এখন তো আমাদের স্বচ্ছল অবস্থা। বাড়ীর উপর একটি মসজিদ দিলে হয় না।
>
> নূর। মসজিদে টাকা ব্যয় হইবে, মাদ্রাসা ও তোমার স্কুলের ভিত্তি সমূহ করিয়া লওয়া আমি ভাল মনে করি।
>
> নূরী। ধর্ম্মকার্য্যে অসত ?
>
> নূর। এরূপক্ষেত্রে ঘোর অসতই বটে। নূরী নূরের মুখের দিকে চাহিল।

নূর সাহেব কহিলেন, যেখানে পানির অভাবে লোকে কষ্ট ভোগ করে, সেখানে পুকুর খনন না করিয়া মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিলে কোন পুণ্য বা লাভ নাই। এই তথ্যটি দেশের মুসলমানেরা তলাইয়া বুঝিতেছে না। কলিকাতা, ঢাকা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বড় বড় শহরে যেখানে সেখানে অসংখ্য মসজিদ দেখা যায় কিন্তু জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মফঃস্বলেও প্রায় একই দশা। কিন্তু এইটি মোসলমানদিগের অবনতির একটি মুখ্য কারণ।''[১৮৭]

সেদিনের পক্ষে এজাতীয় চিন্তাভাবনা কি পরিমাণ বৈপ্লবিক ছিলো তা আজ অনেকের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব হবেনা। কারণ লেখক যুগ ধর্মের বিরুদ্ধে মতামত প্রদান করেছেন।

গ.

চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্য্য কলাপের মাধ্যমে সেদিন মুসলমান লেখকেরা নিজেদের ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন। এতে স্বাতন্ত্র্য ও সমন্বয় উভয় ধারারই সন্ধান পাওয়া যায়।

ধুতি তখনকার দিনে সাধারণভাবে চালু ছিলো। ফলে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধার্মিক অনেকেই ধুতি পরতো।[১৮৮] টুপি সাধারণভাবে চালু থাকলেও শিক্ষিতরা পরতোনা।[১৮৯] টুপি নিয়ে স্কুলের ছাত্ররা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করতো।[১৯০] ছড়ি ও "আনোয়ার পাশা টুপি" ছাড়াও[১৯১] আতর মাখানোকেও আভিজাত্যের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হতো।[১৯২] এছাড়াও হুঁকার সাহায্যে ধূমপান ব্যাপকভাবে চালু ছিলো[১৯৩] মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের অনেক স্থলেই লাঠির মহিমা কীর্তিত হয়েছে—কখনো ব্যবহারের ক্ষেত্রে[১৯৪], কখনো গুণগাণ ও আক্ষেপের মাধ্যমে।[১৯৫] সম্বোধনেরর ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে 'আদাব'

বিনিময়ের চিত্র রয়েছে,[১৯৬] কারণ, 'আসসালামো আলায়কুম'-এর বদলে আদাব প্রদান করাটাকে সেদিন ভালোলোকের সঙ্গে উঠাবসা করার সুফল হিসেবে গণ্য করা হতো।[১৯৭] এছাড়া বিদেশী জিনিস-পত্রের প্রতি আকর্ষণ একদেশদর্শী সংস্কৃতিচর্চার ফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মুসলমানের নাম প্রায়ই আরবী। তবে কোথাও বাঙলা নামে মুসলমানেরা আপত্তি করে বলে স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে[১৯৯], আবার মুসলমানের নাম উচ্চারণে অবাঙালী ও হিন্দুদের অসুবিধের কথাও তর্কচ্ছলে বিবৃত হয়েছে[২০০]—যদিও এর মূলে কাজ করেছে সত্যিকার ভাষাবিভ্রাট। কারণ মুসলমানের নাম প্রায়ই আরবী ভাষায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এসব উপন্যাসের লেখকবৃন্দ নানাভাবে বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করা হয়েছে,[২০১] কোথাও বা শহরের ক্লেদাক্ত চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এই ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে[২০২], কখনো কখনো বিজাতীয় শিক্ষা ও পোশাকপরিচ্ছদ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যসভ্যতা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।[২০৩] এছাড়া রয়েছে ফ্যাসানের সমালোচনা[২০৪], পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে মুসলিম সভ্যতার তুলনা-মূলক আলোচনা[২০৫], জমিদার ও নবাবদের ইংরেজানুকরণ[২০৬] এবং জমিদারদের গ্রামত্যাগ[২০৭] ইত্যাদি। কোন কোন উপন্যাসে এই সভ্যতা আধুনিকতার ধ্যানধারণা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে।[২০৮] এই ধ্যানধারণার মূলে জলসিঞ্চন করেছে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি সরল আকর্ষণ। এছাড়া কোথাও কোথাও বাবু-সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে অত্যন্ত কঠোরভাবে।[২০৯] ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা কৌতুককর ব্যাপার হলো. প্রায় উপন্যাসেই চাকর, মালি এবং এজাতীয় নীচশ্রেণীর লোকেরা উর্দু বা হিন্দুস্থানীতে কথাবার্তা বলে[২১০] এই মনোভাবের উৎস কোথাও ব্যক্ত হয়নি। তবে এর পেছনে সেদিনের মাতৃভাষাবিতর্ক কাজ করে থাকতেও পারে।

॥ তিন ॥

ক.

আধুনিক ধ্যানধারণার ঘাতপ্রতিঘাতে আজ ধর্মের আবেদন অনেক কমে এসেছে। কিন্তু মুসলিমরচিত উপন্যাসের আদিযুগে ধর্ম নানা-ভাবে এই সমাজকে প্রভাবিত করেছিলো। যদিও বাঙালী সর্বদাই সমন্বয়বাদী হিসেবে সুপরিচিত, তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসন ও শোষণ প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের ভেতর জটিল ভেদনীতির সূচনা করে। এই ভেদনীতি যেসব মাধ্যমকে অবলম্বন করে বাস্তব রূপ লাভ করেছে তার ভেতর ধর্মেরও একটা বিশেষ ভূমিকা ছিলো।

এসব উপন্যাসে সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে হিন্দুধর্ম। অনেক গুলো উপন্যাসে হিন্দুধর্ম ও আচারঅনুষ্ঠানের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সমালোচনা রয়েছে। এসব সমালোচনা সবই যে বিদ্বেষপ্রসূত তা নয়। তবু টিকি নিয়ে ব্যঙ্গ করা বা হিন্দুদের গুম্ফকে "উড্ডীয়মান শ্বেতশকুনে"র সঙ্গে তুলনা করা কিংবা পূজার ঠাকুরের অন্তরের বিশ্বাসকে উপহাস করা তীব্র বিদ্বেষরই বহিপ্রকাশ।[২১১] পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস হিন্দুদের ধর্মেরই অংশ, তবু তা নিন্দিত হয়েছে[২১২], অনুরূপ নিন্দিত হয়েছে রথ দেখা।[২১৩] কারণ রথ দেখার নামে মানুষ মূলতঃ নাকি পাপই সঞ্চয় করছে।[২১৪] স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হিন্দুসমাজের নিন্দা-ভাষণ[২১৫] সুবোধ্য, কিন্তু হিন্দুদের গোলাম, ভাই বা কাফের সম্বোধন সম্পূর্ণ বিদ্বেষপ্রসূত।[২১৬]

হিন্দুপ্রসঙ্গে সর্বাধিক কৌতুককর দিক হলো, হিন্দু কর্তৃক হিন্দু ধর্মের নিন্দা। এই নিন্দার মূলে জলসিঞ্চন করেছে ধর্মান্তকরণ। এসব চিত্রও নানাভাবে উপন্যাসে প্রদর্শিত হয়েছে। কখনো সরাসরি হিন্দুধর্ম ও আচারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের মাধ্যমে[২১৭], কখনো বা যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম সৈন্যের সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখে হতাশ হয়ে হিন্দুদের ভীরুতার নিন্দা করতে গিয়ে[২১৮], নতুবা হিন্দু দেবদেবীর

অবমাননা করে[২১৯] তারা নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেছে। এছাড়া মুসলমানদের চেহারা দাড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ যেমন হিন্দুদের ভালো লেগেছে[২২০], তেমনি তাদের আজানের আওয়াজ "দেবালয় মুখরিত-করা কাঁসর-ঘণ্টার কর্কশ কোলাহল"—এর তুলনায় মধুর মনে হয়েছে[২২১] এসব কাজ বা কথা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে না। এছাড়া বহু উপন্যাসে উৎকট হিন্দুবিদ্বেষও নানাভাবে প্রচারিত হয়েছে। এই বিদ্বেষের ক্ষেত্রে সৈয়দ আবুল হোসেন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও মোজাম্মেল হকের ভূমিকা অগ্রগণ্য। প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাস রচনা করা সত্ত্বেও মতীয়র রহমান খান এজাতীয় যুক্তিহীন বিদ্বেষ তেমন প্রচার করেননি। এই ক্ষেত্রে কাজী ইমদাদুল হক শিক্ষাঙ্গনে মুসলমানদের চাকুরীপ্রসঙ্গে হিন্দু প্রধান শিক্ষকের যে ভূমিকার কথা বিবৃত করেছেন[২২২], বা কাজী আবদুল ওদুদ উঠতি মুসলমান চাকুরেদের আড্ডায় হিন্দু প্রতি-যোগীদের সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন[২২৩] সেগুলো ছিলো সেদিন বাস্তব সত্য—তা যত অপ্রিয়ই হোকনা কেন।

তবে অন্য ধর্মপ্রসঙ্গে মুসলমান লেখকেরা তুলনামূলকভাবে উদার। এই উদার ব্যাখ্যার শীর্ষে রয়েছে ব্রাহ্ম ধর্ম। এই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে যেসব কারণ প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত সেগুলো হলো তাদের সংস্কারহীন জীবনযাত্র[২২৪], ঔদার্য[২২৫], সেবাপরায়ণতা[২২৬], স্ত্রী-স্বাধীনতা[২২৭] ইত্যাদি। তবু গোঁড়া হিন্দুরা তাদের দেখতে পারেনা "শুধু ঈর্ষা আর নীচ-মনার দরুন।"[২২৮] শুধু তাই নয়, তাদের বিশ্বাস "মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় যদি বঙ্গদেশের মুসলমানের অবস্থা ভাল থাকিত, তবে চিন্তাশীল উন্নত হিন্দু সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া এসলামের নূতন শাখা বাহির করিতেন না।"[২২৯] কোন ধর্ম সম্পর্কে এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে? খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণের মূল কারণও সেই সেবাপরায়ণতা—যা মিশনারীদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে।[২৩০] বৌদ্ধদের

সম্পর্কে সরাসরি কোন মন্তব্য নেই, তবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন দুর্লক্ষ্য নয়।[২৩১] ঐতিহাসিক পটভূমিকায় হিন্দুধর্মে প্রচলিত সহমরণ প্রথাও কোন কোন উপন্যাস প্রদর্শিত হয়েছে।[২৩২]

খ.

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার। এই প্রচার কাজে লেখকেরা নানাপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কোন কোন লেখক তাঁদের উপন্যাসে মযহাবী বিতর্কের চিত্র তুলে ধরেছেন।[২৩৩] মযহাবী বিতর্ক সেদিনকার মুসলিম ধর্ম্মসমাজকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলো। এই বিতর্কের ভেতর প্রচার প্রবণতাই বেশি। এছাড়া হিন্দুদের নানাপ্রকার আচরণ প্রসঙ্গেও তৎকালীন লেখকেরা ইসলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।[২৩৪] কোন কোন উপন্যাসে সুপরিকল্পিত ধর্ম্মপ্রচারের নিদর্শনও রয়েছে এসব পরিকল্পনা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনো নায়ক বা নায়িকা কর্ত্তৃক ধর্মোপদেশ প্রদানের মাধ্যমে,[২৩৫] কখনো হিন্দুদের কোন আচার-অনুষ্ঠানের সমালোচনাপ্রসঙ্গে,[২৩৬] কখনো বা ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বহসের নামে।[২৩৭] এছাড়া বহু উপন্যাসে মিলাদ মাহফিলের চিত্র দেখা যায়। এসব মাহফিলের নেতৃত্বে প্রায়ই নায়ক বা নায়িকা অংশগ্রহণ করে থাকে।[২৩৮] কখনো সাধারণ ধর্মকর্মের ন্যায় বাইরের লোক মিলাদ পড়েন।[২৩৯] এসব উপন্যাসে ব্যাপক মিলাদ পাঠের কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। কারণ মিলাদ ধর্মেরই একটা অঙ্গ। তবু মিলাদ নিয়ে ইসলাম ধর্মবিশারদদের ভেতর প্রচুর মতভেদও লক্ষ্য করা যায়। ওয়াহাবী বলে কথিত ধর্মসম্প্রদায় মিলাদের বিভিন্ন অনুশাসনের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।[২৪০] সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী মহররম উৎসব বর্ণনাপ্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে এঁদের সমালোচনা করেছেন।[২৪১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান সমাজের যে অংশটির চিত্র এসব

উপন্যাসে পাওয়া যায় তারা ওয়াহাবীবিরোধী এবং ইংরেজের সমর্থক বলে পরিচিত।

এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় বিধান সম্পর্কেও লেখকদের ভেতর সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিপদ-আপদে জেকের বা হরীসঙ্কীর্তনকে অবশ্য[২৪২] ধর্মকর্মের চেয়েও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তবে বিপদকালে আল্লার নাম বেশি উচ্চারণ করার ব্যাপারে কোরআনের বাণীর কথা স্মরণ করে[২৪৩] এই কাজটিকে ধর্মের অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো। ইসলাম ধর্মে সুদ হারাম বলে লেখকদের অনেকে এর নিন্দা করলেও[২৪৪], সুদ সম্পর্কে সহনশীল ও যুক্তিবাদী মানসিকতাও লক্ষ্য করা যায়।[২৪৫] এছাড়া রোজা, নামাজ ও জাকাতের চিত্রও এসব উপন্যাসে দেখা যায়। নায়ক-নায়িকারা (প্রায় উপন্যাসেই) নামাজ পড়ে থাকেন, কেউ কেউ জাকাতও প্রদান করতেন।[২৪৬] হজের দৃশ্য তেমন নেই। কারণ এসব উপন্যাসে লেখকেরা যে সংগ্রামশীল জনগোষ্ঠীর চিত্র অঙ্কন করেছেন তাদের প্রায়ই এসেছে নিম্ন বা সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে—যাদের আর্থিক সঙ্গতি তেমন ছিলোনা। তবু দুয়েকটা সাধারণ চিত্র যেমন দেখা যায়[২৪৭], তেমনি অবৈধ অর্থের সাহায্যে সমাজে প্রতিপত্তি লাভের পর হজ্জ গমন করার চিত্রও রয়েছে।[২৪৮] এসব ক্ষেত্রে লেখকের নিন্দাই বেশি প্রতিধ্বনিত।

এছাড়া এসব উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্মবিশ্বাসনির্ভর অলৌকিকতা। এসব অলৌকিকতায় রয়েছে পানিপড়া ও ফুঁ দিয়ে রোগমুক্তি[২৪৯], তাবিজ ও তেলপড়ায় হিষ্টিরিয়া রোগের নিরাময়[২৫০], খাসি সদকা দেওয়ার পর বা প্রার্থনা করে নিজের জানের বিনিময়ে রোগমুক্তি[২৫১], মুসলমান পীরের অলৌকিকতা[২৫২] ইত্যাদি। এই পর্বে লোককাহিনীনির্ভর উপন্যাস-সমূহে বর্ণিত অলৌকিকতা[২৫৩] সন্নিবেশিত হলো না। কারণ সেগুলোর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই। এছাড়া কোন কোন উপন্যাসে ধর্মীয়

নেতাদের যুক্তিবাদ ও ঔদার্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।[২৫৪]

এসব উপন্যাসে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসনকে নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্যস্থল পরান্নজীবী ধর্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়—যাদের কেউ পীর-মুরিদীর মাধ্যমে,[২৫৫] কেউ মোয়াযযেনী করে[২৫৬], কেউবা মাজারের খাদেম হিসেবে[২৫৭] অর্থ উপার্জন করছে। এছাড়া উর্দু-ফারসীর বিচিত্র সবককে যেমন ব্যঙ্গ করা হয়েছে[২৫৮], তেমনি না বুঝে খোৎবা পড়া বা তোতা পাখির মতো কোরআন পড়াও সমালোচিত হয়েছে।[২৫৯]

গ.

এসব উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্মান্তকরণ। বিশাল হিন্দু জনসাধারণের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক সত্য। ধর্মীয় গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ইত্যাদি নানাকারণে হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিজধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হতে হয়েছে। এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের ঔদার্য এবং মুসলিম সমাজের সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা যে বহুলাংশে কাজ করেছে তা বলাই বাহুল্য। যে বিশেষ কারণে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছে, সেই একই কারণে বঙ্গদেশের বর্ণহিন্দুরা একাজ থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে যেসব ধর্মান্তরণের চিত্র রয়েছে, তার বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ এবং দুয়েকটা কায়স্থও দেখা যায়। কিন্তু উপন্যাসে নিম্নবর্ণের হিন্দু বা বৌদ্ধদের ধর্মান্তরণের চিত্র একেবারেই নেই। শুধু তাই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ নরনারী মুসলমানদের ধর্মীয় ভাব ও ঔদার্য দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।[২৬০] মুসলিম পীরের "জ্ঞানগর্ভ অমৃত-নিস্যন্দিনী বক্তৃতা শ্রবণে পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত"—এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের চিত্র যত হাস্যকর হোকনা কেন[২৬১], তাকে হার মানিয়ে গেছে সন্ন্যাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্যে অপরাধীর মতো

বসে থাকার চিত্রটি ।[২৬২] সব চাইতে মজার কথা হলো, যে পীরের গুণ প্রভাবে এতগুলো সন্ন্যাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো সেই "ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে" উপবিষ্ট "তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দিব্যকান্তি দরবেশ" বারোমাস রোজা রাখলেও "রাত্রিতে সামান্য কিছু দুগ্ধরুটী ও ফলমূল ভক্ষণ করিতেন। মৎস মাংস স্পর্শও করিতেন না"[২৬৩]—যা মূলতঃ হিন্দু সন্ন্যাসীদেরই আদর্শ। এছাড়া কুলীন-কায়স্থদের ধর্মান্তরণের চিত্র যেমন রয়েছে[২৬৪] তেমনি সাহেব-মেমের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের চিত্রও দেখা যায়।[২৬৫] উপরন্তু মুসলমান কর্তৃক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের চিত্রযেমন দুর্লক্ষ্য নয়[২৬৬], তেমনি পুনঃধর্মন্তরণের চিত্রও রয়েছে—যার মূলে কাজ করেছে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস নয়।[২৬৭] এই চিত্রটিতে একটা বিশেষ ধারণা কাজ করেছে বলে মনে হয়। মুসলমান নারী-পুরুষের ধর্মান্তরণের চিত্র একেবারেই বিরল। এর কারণ নানাপ্রকার হতে পারে। কিন্তু এসব উপন্যাসে যে এক-আধখানা চিত্র রয়েছে, তার মূলে ধর্মান্তরণের কারণ হিসেবে কাজ করেছে দারিদ্র্য—যেমন হিন্দুদের ক্ষেত্রে কাজ করেছিলো সাম্প্রদায়িক নির্যাতন।

॥ চার ॥

ক.

মুসলিম রচিত উপন্যাসে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মবোধই সর্বাধিক ক্রিয়াশীল। প্রাচীন ইতিহাসের চিত্র প্রায় নেই বললেই চলে। এর কারণ, সম্ভবতঃ প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, অথবা অপ্রয়োজনীয় বোধেও লেখকেরা প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে নীরব থাকতে পারেন।

মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো সম্রাট আকবরের ঔদার্য এবং সম্রাট ঔরঙ্গজীবের গোঁড়ামি। এই দুটি ব্যক্তির ভেতর মূলতঃ কাজ করেছে দুটি ভাবধারা—যার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য সংরক্ষণ। তাঁরা দুটো পরস্পরবিরোধী পদ্ধতি অবলম্বন

করেছেন মাত্র। এর ভেতর প্রায় প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে আকবরের নীতি নিন্দিত হয়েছে, ঔরঙ্গজীবের নীতি হয়েছে সমর্থিত।[২৬৮] শুধু তাই নয়, এসব উপন্যাসে আকবরের হিন্দুঘেঁষা নীতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যেমন করা হয়েছে[২৬৯], তেমনি তাঁর রাজপুতনীতিকে প্রচারণা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭০] মোঘল যুগে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে "রাজপুত বা ভারতবাসীদের" সংগ্রামকেও একজন ঔপন্যাসিক প্রশংসা করেছেন।[২৭১] একটি উপন্যাসে কারারুদ্ধ সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের দুর্ব্যবহারের চিত্রও যেমন রয়েছে[২৭২], তেমনি একটি উপন্যাসে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর মোঘল সম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার প্রতিও পাঠকের দৃষ্টিআকর্ষণ করা হয়েছে।[২৭৩] বহু উপন্যাসে মুসলিম রাজপুরুষদের সঙ্গে হিন্দু মহিলার বিয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭৪] এছাড়া মোঘল হেরেমে নারীর অবাধ বিচরণের চিত্রও দেখা যায়। সম্রাট আকবরের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র সেলিমের গৃহে প্রহরীর কাজ করতো নারী।[২৭৫]

এসময় যেসব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মূলে তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি যেমন কাজ করেছে,[২৭৬] তেমনি ইতিহাসের প্রতি আনুগত্যের ছাপও রয়েছে।[২৭৭] তবে সাধারণভাবে উপন্যাসে কিছু ইতিহাসবিকৃতি থাকেই।

খ.

এসব উপন্যাসে সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কেও চেতনাবোধ লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু এই সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাধারাই বিতর্ক-মূলক, সেহেতু তার প্রভাব আনুপাতিক।

এসব উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদী ও খেলাফৎ আন্দোলন। এসব আন্দোলনকে লেখকেরা নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কোন কোন উপন্যাসে সরাসরি

এসব আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে,[২৭৮] আবার কোন কোন উপন্যাসে এসব আন্দোলনকে হুজুগ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে[২৭৯] অনুরূপ এসব আন্দোলনের পক্ষেও অনেকে নানাভাবে নিজ নিজ মতামত প্রদান করেছেন। কখনো সরাসরি এসব আন্দোলনের পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে,[২৮০] কখনো বা পারিপার্শ্বিক চরিত্রে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।[২৮১] এছাড়া উপন্যাসের নায়কদের কেউ আসামীপক্ষের উকিল,[২৮২] কেউ বা নিজে সন্ত্রাসবাদী, অতএব বাবার 'খানবাহাদুর' উপাধিতে অসন্তুষ্ট।[২৮৩] এই উপন্যাসে লেখক এসব আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সেদিন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা প্রসঙ্গে নানা-প্রকার বাধ্যবাধকতার প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিলো বলেই তিনি তাঁর উপন্যাসে একজন মুসলিম সন্ত্রাসবাদীর চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে সেদিনের মতভেদটি ফুটিয়ে তুলেছেন।[২৮৪] মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গও যেমন এসব উপন্যাসে রয়েছে, তেমনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলত্যাগ প্রসঙ্গও দেখা যায়[২৮৫] —যা লেখকের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণার পোষকতা করে মাত্র। একই লেখক তাঁর উপন্যাসে মুসলিমবিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচারণার নিন্দা করেছেন, তেমনি বাঙালীর সমালোচনার নামে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করেছেন।[২৮৬]

এসব উপন্যাসে ইংরেজপ্রসঙ্গও এসেছে। এসেছে কখনো তার গুণগান করতে গিয়ে,[২৮৭] কখনো বা তার বিরূপ সমালোচনার উদ্দেশ্যে।[২৮৮] স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরকা কাটার পরে যেমন বক্তব্য রয়েছে,[২৮৯] তেমনি তার বিরুদ্ধেও।[২৯০] একটি উপন্যাসে স্বরাজের বিরুদ্ধেও বক্তব্য রাখা হয়েছে।[২৯১] এছাড়া সমকালীন যেসব সমস্যার প্রতি সেদিনের লেখকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিলো, তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো গো-কোরবানী ও পর্দা নিয়ে দাঙ্গা।[২৯২]

এবং স্বদেশানুরাগ।[২৯৩]

পাদটীকা

১ সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব।

২ আবদুল মালেক চৌধুরী ঃ স্বপ্নের ঘোর।

৩ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

৪ সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব।

৫ আকবরউদ্দীন ঃ মাটির মানুষ।

৬ মোহাম্মদ শাহজাহান ঃ নিমক-হারাম।

৭ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ ফিরোজা বেগম, ("রাজা-নবাবদিগের আশা ত্যাগ করে অত্যাচারিত যারা—উৎপীড়িত যারা, তাদিগকেই প্রতিহিংসাপরায়ণ করতে হবে।")।

৮ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান।

৯ আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহা।

১০ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ গরীবের মেয়ে।

১১ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

১২ বন্দে আলী মিয়া ঃ ঘূর্ণি হাওয়া।

১৩ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার।

১৪ মোমতাজউদ্দীন আহমদ ঃ জীবনের সাথী।

১৫ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ ; কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী।

১৬ সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব।

১৭ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ প্রেমের সমাধি।

১৮ সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব।

১৯ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে।

২০ আকবরউদ্দীন ঃ মাটির মানুষ।

২১ সৈয়দ আবুল হোসেন ঃ কপালকুণ্ডলা বা সখের সতীন।

২২ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

২৩ সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব।

২৪ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে ; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ।

২৫ মোহাম্মদ কোরবান আলী : মনোয়ারা ; কাজী নজরুল ইসলাম : মৃত্যুক্ষুধা ; কাজী আবদুল ওদুদ : আজাদ।

২৬ কাজী ইমদাদুল হক : আবদুল্লাহ।

২৭ মোহাম্মদ কোরবান আলী : মনোয়ারা।

২৮ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন : প্রেমের সমাধি।

২৯ কাজী ইমদাদুল হক : আবদুল্লাহ ; কাজী আবদুল ওদুদ : আজাদ।

৩০ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন : প্রেমের সমাধি।

৩১ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন : আনোয়ারা ; খোন্দকার মহাম্মদ আবুল্যাএছ চোখের আলো ; ("বিদ্যা ত আর সুপারিশ অপেক্ষা জোর নয়।")

৩২ মোহাম্মদ রহমতউল্লা : সফুরার পরিণাম।

৩৩ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন : আনোয়ারা ; মোহাম্মদ বেলায়েত আলী : মিলন কুটির ; বন্দে আলী মিয়া : ঘূর্ণি হাওয়া।

৩৪ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন : প্রেমের সমাধি ; সফিউদ্দীন আহমদ : সৈয়দ সাহেব ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : রায়হান।

৩৫ এম. মনির হোসেন : অপরিচিতা।

৩৬ "কিন্তু আল্লাহ ব্যবসায় বৈধ করেছেন, কিন্তু সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। "কোরআন শরীফ, আল-বাকারাহ, অষ্টাত্রিংশ অনুচ্ছেদ, ২৭৫ আয়াত। কাজী আবদুল ওদুদ অনূদিত, ৫৪।

৩৭ কাজী ইমদাদুল হক : আবদুল্লাহ।

৩৮ আকবরউদ্দীন : মাটির মানুষ ; বন্দে আলী মিয়া : ঘূর্ণি হাওয়া।

৩৯ কলিমউদ্দীন আহমদ : লায়লী ; আবুল ফজল : চৌচির।

৪০ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম : পল্লী-সংসার।

৪১ সফিউদ্দীন আহমদ : সৈয়দ সাহেব।

৪২ কাজী ইমদাদুল হক : আবদুল্লাহ।

৪৩ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী : বঙ্গের জমিদার।

৪৪ কাজী ইমদাদুল হক : আবদুল্লাহ।

৪৫ এম. মনির হোসেন : অপরিচিতা।

৪৬ এম. মনির হোসেন : অপরিচিতা ; কাজী নজরুল ইসলাম : কুহেলিকা।

৪৭ সফিউদ্দীন আহমদ : সৈয়দ সাহেব ; বেগম রোকেয়া সাদাওয়াৎ হোসেন : পদ্মরাগ; কাজী আবদুল ওদুদ : নদীবক্ষে।

৪৮ মোহাম্মদ বেলায়েত আলি ঃ মিলন কুটির ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভুলের বাঁধন ; মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী ঃ বঙ্গের জমিদার।

৪৯ মোমতাজউদ্দীন আহমদ ঃ জীবনের সাথী ; কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ ; নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ আত্মদান ; আবুল ফজল ঃ চৌচির।

৫০ মীর মশাররফ হোসেন ঃ বিষাদ সিন্ধু।

৫১ক মোহাম্মদ আজ্জর্মন্দ আলী ঃ প্রেম-দর্পণ।

৫১ মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা।

৫২ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে ; কাসিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী।

৫৩ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্মরাগ।

৫৪ মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভুলের বাঁধন ; কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মৃত্যুক্ষুধা।

৫৫ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ গরীবের মেয়ে।

৫৬ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

৫৭ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ আত্মদান।

৫৮ মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা ; কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

৫৯ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ স্বপ্নদৃষ্টা ; মোমতাজউদ্দীন আহমদ ঃ জীবনের সাথী।

৬০ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

৬১ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ স্বপ্নদৃষ্টা।

৬২ মতীয়র রহমান খান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি।

৬৩ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা।

৬৪ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি ; মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা ; আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহা।

৬৫ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা ; আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহা।

৬৬ গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা।

৬৭ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্মরাগ।

৬৮ মোহাম্মদ জিলানি ঃ ব্যথিতের ডায়রি ; গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙ্গা বুক।

৬৯ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনেয়োরা।

৭০ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা ; আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহা।

৭১ মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী।

৭২ মীর মশাররফ হোসেন ঃ বিষাদ সিন্ধু ; শেখ ফজলল করিম ঃ বিবি রহিমা।

৭৩ মীর মশাররফ হোসেন ঃ বিষাদ সিন্ধু।

৭৪ আবদ্‌ল মজিদ খোন্দকার ঃ প্রেম-বিকাশ।

৭৫ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

৭৬ কাজী আবদ্‌ল ওদ্‌দ ঃ নদীবক্ষে।

৭৭ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান ; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে ; আবুল ফজল চৌচির।

৭৮ সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব।

৭৯ জানে আলম চৌধুরী ঃ সাধনার জয়।

৮০ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান।

৮১ গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙ্গাবুক।

৮২ কাজী ইমদাদ্‌ল হক ঃ আবদ্‌ল্লাহ।

৮৩ শেখ ফজলল করিম ঃ বিবি রহিমা (আরব) ; মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা (ইরান) ; আবদুল মালেক চৌধুরী ঃ স্বপ্নের ঘোর (উপজাতীয়)।

৮৪ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে ; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি : মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভ্‌লের বাঁধন।

৮৫ মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ ঃ নেক নজর।

৮৬ কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী।

৮৭ মোহাম্মদ রহমতউল্লা ঃ সফুরার পরিণাম ঃ ("পুত্রের বাল্যবিবাহের অপকারিতা এবং কন্যার বাল্যবিধবা হওয়া ও দেশের অন্যান্য বাল্য বিবাহের বিষময় ফল দেখিয়া বাল্যবিবাহের প্রতি তাঁহার অতিশয় ধিক্কার জন্মিয়াছিল।")

৮৮ শেখ ফজলল করিম ঃ বিবি রহিমা।

৮৯ দ্‌ই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব উপন্যাসে।

৯০ মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা ঃ ("বিবাহ! বিবাহ তো একটা চাকরি—একটা চিরস্থায়ী গোলামীতে আবদ্ধ হওয়া নারীর নিকট পুরুষের চিরজীবন দাস-খতে নাম সহি করা।")

৯১ গোলাম মোস্তফা ঃ র্‌পের নেশা।

৯২ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে।

৯৩ আবদুল মালেক চৌধুরী ঃ স্বপ্নের ঘোর।

৯৪ গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক।

৯৫ বোখারী শরীফ, ষষ্ঠ খণ্ড। আজিজুল হক অনূদিত (দ্বি-স : ঢাকা, ১৩৮৪)১৮৯।

৯৬ মোহাম্মদ রহমতউল্লা ঃ সফুরার পরিণাম।

৯৭ মীর মশাররফ হোসেন ঃ বিষাদ সিন্ধু; শেখ ফজলল করিম ঃ বিবি রহিমা : সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব।

৯৮ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী ঃ আকর্ষণ; মোহাম্মদ রহমতউল্লা ঃ সফুরার পরিণাম।

৯৯ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ গরীবের মেয়ে ; মোহাম্মদ রহমতউল্লা ঃ সফুরার পরিণাম।

১০০ মীর মশাররফ হোসেন ঃ বিষাদ সিন্ধু ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভুলের বাঁধন

১০১ গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা।

১০২ গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক।

১০৩ আবু সঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিকে হোসেন খান লোহনী ঃ শপথ ; শাহাদাৎ হোসেন ঃ খেয়াতরী, যুগের আলো ; কমরন্নেছা খাতুন ঃ গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার।

১০৪ মোহাম্মদ আর্জ্জমন্দ আলী ঃ প্রেম-দর্পণ ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লীসংসার মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী ঃ আকর্ষণ ; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি ; এম. মনির হোসেন ঃ অপরিচিতা ইত্যাদি।

১০৫ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ চাঁদ-তারা বা হাসান-গঙ্গা বাহমনী ; মোহাম্মদ এবরাহিম ঃ যোবেদা।

১০৬ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

১০৭ এম. মনির হোসেনঃ অপরিচিতা ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ব্যাথিতের ডায়রি ; কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বাঁধন-হারা।

১০৮ মতীয়র রহমান খান ঃ যমুনা ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজি ঃ তারাবাঈ ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লীসংসার ; মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী ; নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ জানকী বাঈ ইত্যাদি।

১০৯ মোহাম্মদ আর্জ্জমন্দ আলী ঃ প্রেম-দর্পণ, মেহোম্মদ নূরুল হক চৌধুরী ঃ আকর্ষণ ; আবদুল মালেক চৌধুরী ঃ স্বপ্নের ঘোর ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি : ব্যাথিতের ডায়রি।

১১০ আবু সঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন খান লোহানী ঃ শপথ ; শাহাদাৎ হোসেন ঃ পথের দেখা, যুগের আলো : মোহাম্মদ এবরাহিম ঃ যোবেদা ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভুলের বাঁধন।

১১১ শাহাদাৎ হোসেন ঃ হিরণ-রেখা, সোনার কাঁকন ; কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী।

১১২ জানে আলম চৌধুরী ঃ সাধনার জয় ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়-নন্দিনী ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী।

১১৩ জানে আলম চৌধুরী ঃ সাধনার জয়।

১১৪ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা।

১১৫ মোহাম্মদ নজিরব রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ প্রেমের সমাধি ; বন্দে আলী মিয়া ঃ ঘূর্ণি-হাওয়া।

১১৬ মোহাম্মদ বেলায়েত আলি ঃ মিলন কুটির।

১১৭ মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা, মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী ঃ আকর্ষণ।

১১৮ বন্দে আলী মিয়া ঃ ঘূর্ণি-হাওয়া।

১১৯ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা।

১২০ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

১২১ আকরবউদ্দিন ঃ মাটির মানুষ।

১২২ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা।

১২৩ মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা।

১২৪ গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা।

১২৫ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা।

১২৬ আকবরউদ্দীন ঃ মাটির মানুষ।

১২৭ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ গরীবের মেয়ে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্মরাগ।

১২৮ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্মরাগ।

১২৯ গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক।

১৩০ আবু সঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন খান লোহানী ঃ শপথ ; মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা ; আকবরউদ্দীন ঃ মাটির মানুষ।

১৩১ মতীয়র রহমান খান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি।

১৩২ মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা ; কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ ; আকবরউদ্দীন ঃ মাটির মানুষ ; বন্দে আলী মিয়া ঃ ঘূর্ণি হাওয়া।

১৩৩ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ পরিণাম ; গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ পথহারা।

১৩৪ মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লীসংসার ; গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা।

১৩৫ জানে আলম চৌধুরী ঃ সাধনার জয় ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ পথহারা।

১৩৬ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী (হেকিমী) ; সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব (হেকিমী) ; নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ আত্মদান (হাতুড়ে) কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ (আধুনিক)।

১৩৭ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান।

১৩৮ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

১৩৯ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা।

১৪০ 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব, অধ্যায় এক।

১৪১ খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন ঃ অনাথিনী ; শাহাদাৎ হোসেন ঃ পথের দেখা।

১৪২ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে।

১৪৩ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ প্রেমের সমাধি।

১৪ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব ; মোহাম্মদ শাহজাহান ঃ নিমক-হারাম ; এম. মনির হোসেন ঃ অপরিচিতা ; আব্দুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহা ; ইত্যাদি।

১৪৫ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ ; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ প্রেমের সমাধি।

১৪৬ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ স্বপ্নদৃষ্টা ; কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ ; খোন্দকার মহাম্মদ আবদুল্যাএছ ঃ চোখের আলো ; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ পরিণাম।

১৪৭ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে ; গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা।

১৪৮ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে ; আবুল ফজল ঃ চৌচির।

১৪৯ এম. মনির হোসেন ঃ অপরিচিতা ; সফিউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব।

১৫০ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা।

১৫১ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ প্রেমের সমাধি ; কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

১৫২ গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা।

১৫৩ মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভুলের ব'াধন।

১৫৪ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ("এমন কাণ্ড ত বাবার জন্মেও শুনি নাই, মেয়ে পড়ে কি দারোগা হবে নাকি ?") ; কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ব'াধন-হারা।

১৫৫ শেখ ফজলল করিম ঃ বি ব রহিমা।

১৫৬ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান ; গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক ; মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা ; খোন্দকার আবুল্যাএছ ঃ চোখের আলো।

১৫৭ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা ; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্মরাগ।

১৫৮ মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভুলের বাঁধন।

১৫৯ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান ; বন্দে আলী মিয়া ঃ ঘূর্ণি হাওয়া।

১৬০ জানে আলম চৌধুরী ঃ সাধনার জয় ("আমার সমকক্ষ লোকের সহিত সম্বন্ধ করিতে গেলে সুশিক্ষিত ও সৎস্বভাব ছেলে পাওয়া সুকঠিন।")।

১৬১ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

১৬২ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ গরীবের মেয়ে।

১৬৩ মোহাম্মদ শাহজাহান ঃ নিমক-হারাম।

১৬৪ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী ; আবদুল মজিদ খোন্দকার ঃ প্রেম-বিকাশ ; আবুল ফজল ঃ চৌচির।

১৬৫ শেখ হবিবর রহমান ঃ পরীর কাহিনী।

১৬৬ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী ঃ বঙ্গের জমিদার।

১৬৭ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্মরাগ।

১৬৮ আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহা ("এই ক্লাশে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র সাত জন—মোট ছাত্রসংখ্যার সপ্তমাংশ।")।

১৬৯ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে ; মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা ; কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী ; নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ স্বপ্নদৃষ্টা ; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ।

১৭০ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান ("বিদেশী ভাষা, সে সব প'ড়ে মানুষ হওয়া কঠিন কাজ, জ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করবেন। শক্ত ব'লে বড় সাহিত্যকে অবহেলা করতে বলছি না। তবে দেশের প্রত্যেক লোককে বিদেশী সাহিত্য আলোচনা করতে হবে এরূপ ব্যবস্থা করা ঠিক নয়।")।

১৭১ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্মরাগ ; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ।

১ ২ খোন্দকার আবুল্যাএছ ঃ চোখের আলো।

১৭৩ গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক ; মোমতাজউদ্দীন আহমদ ঃ জীবনের সাথী।

১৭৪ গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক।

১৭৫ খোন্দকার আবুল্যাএছ ঃ চোখের আলো।

১৭৬ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী ; মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী ; নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ আত্মদান।

১৭৭ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান।

১৭৮ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা।

১৭৯ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে ; ("কি বলছ ভাবী যাত্রা অযাত্রা; ওসব হিন্দুর শাস্তর, মোসলমানের বেসমেল্লা বলে রওয়ানা হলেই হল।")।

১৮০ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ জানকী বাঈ।

১৮১ মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ব্যথিতের ডায়রী, ভুলের বাঁধন ; আবুল ফজল ঃ চৌচির ; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ।

১৮২ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা ; গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক।

১৮৩ মোহাম্মদ এবরাহিম ঃ যোবেদা ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ব্যথিতের ডায়রি।

১৮৪ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ স্বপ্নদৃষ্টা।

১৮৫ শেখ আবদুর রহিম ঃ প্রণয়-যাত্রী।

১৮৬ মতীয়র রহমান খান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি।

১৮৭ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ গরীবের মেয়ে।

১৮৮ মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে ; আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহা।

১৮৯ মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা।

১৯০ আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহা।

১৯১ আবদুল মালেক চৌধুরী ঃ স্বপ্নের ঘোর।

১৯২ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী।

১৯৩ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী ; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে ; মোহাম্মদ রহমত উল্লা ঃ সফুরার পরিণাম ; মোহাম্মদ শাহজাহান ঃ নিমক-হারাম।

১৯৪ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ হাসান-গঙ্গা বাহমনী।

১৯৫ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ পথহারা ; কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী।

১৯৬ গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা।

১৯৭ আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী : সালেহা।

১৯৮ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী : ফিরোজা বেগম ("কাশ্মীরে নির্মিত জরী-জড়োয়া, পাগড়ী, বোখারায় নির্মিত সুবৃহৎ দর্পণ, বৃহৎ মুক্তার হার, লাহোরে নির্মিত সুবর্ণখচিত কার্পেট, দামেস্কে নির্মিত হীরকের বাঁটবিশিষ্ট তরবারী।")।

১৯৯ গোলাম মোস্তফা : রূপের নেশা ("মুসলমান বালিকার বাঙ্গালা নামে অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তদুত্তরে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, সকলে সাধ করিয়া ছোট বেলায় তাহাকে মণি বলিয়া ডাকিত।")।

২০০ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : পদ্মরাগ।

২০১ শেখ ফজলল করিম : বিবি রহিমা ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম : পল্লী-সংসার।

২০২ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী : বঙ্গের জমিদার।

২০৩ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী : আকর্ষণ ; মোহাম্মদ কোরবান আলী : মনোয়ারা।

২০৪ গোলাম মোস্তফা : ভাঙাবুক।

২০৫ খোন্দকার আবুল্যাএছ : চোখের আলো।

২০৬ জানে আলম চৌধুরী : সাধনার জয়।

২০৭ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী : আকর্ষণ।

২০৮ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী : স্বপ্নদ্রষ্টা ; মোহাম্মদ বেলায়েত আলি : মিলন-কুটির।

২০৯ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী : বঙ্গের জমিদার ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : রায়হান ; আবদুল মালেক চৌধুরী : স্বপ্নের ঘোর।

২১০ মোহাম্মদ কোরবান আলী : মনোয়ারা ; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : পদ্মরাগ ; কাজী আবদুল ওদুদ : আজাদ।

২১১ মোহাম্মদ এবরাহিম : যোবেদা।

২১৩ মোহাম্মদ রহমত উল্লা : সফুরার পরিণাম।

২১৪ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী : স্বপ্নদ্রষ্টা।

২১৫ মোহাম্মদ গোলাম জিলানি : ভুলের বাঁধন (পুত্রবধূর সম্পত্তি নায়েবের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে শুনে শ্বশুর বলছে, "হিন্দুরা আবার বিশ্বাসী। ও জাতটাই চোর বাবা, ও জাতটাই চোর।")।

২১৬ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : রায়হান।

২১৭ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম : পল্লী-সংসার ; মোজাম্মেল হক : দরাফ খাঁ গাজী ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : সরলা, রায়হান।

২১৮ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ জানকী বাঈ।

২১৯ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ তারাবাঈ।

২২০ মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ নূরউদ্দীন।

২২১ মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী।

২২২ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

২২৩ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ ("সরঙ্গপথ-ঢাকা পেচোয়ান নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেছে এই ভদ্রমণ্ডলীর ধূমপান আর গল্প। কোথায় কোন্ মুসলমান চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছু তরক্কী করেছেন, কোন্ কোন্ ডিপার্টমেণ্টের সাহেব মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান, কমবখত হিন্দুদের দৌরাত্ম্যে মুসলমানদের কিছু হ'বার উপায় নাই—এই সবই প্রধানতঃ এ'দের গল্পের বিষয়।")।

২২৪ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা।

২২৫ গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক।

২২৬ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্মরাগ।

২২৭ কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী।

২২৮ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বাঁধন-হারা।

২২৯ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ পথহারা।

২৩০ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা ; কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মৃত্যুক্ষুধা।

২৩১ মতীয়র রহমান খান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি।

২৩২ মতীয়র রহমান খান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ হাসান-গঙ্গা বাহমনী।

২৩৩ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী সংসার ; শেখ হবিবর রহমান ঃ আলমগীর।

২৩৪ মোহাম্মদ এবরাহিম ঃ যোবেদা ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ নূরউদ্দীন।

২৩৫ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে ; শেখ হবিবর রহমান ঃ আলমগীর ; আবদুল মালেক চৌধুরী ঃ ঘপ্নের ঘোর।

২৩৬ মোহাম্মদ রহমত উল্লা ঃ সফুরার পরিণাম।

২৩৭ মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী।

২৩৮ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা ; কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী ; মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা।

২৩৯ আবুল ফজল ঃ চৌচির।

২৪০ মুর্ফাত ফয়েজউল্লাহ তাঁর 'ফয়জুল কালাম' (চট্টগ্রাম, ১৩৯৯ হিজরী) গ্রন্থে

মিলাদ এর বিভিন্ন অনুশাসনকে বেদআৎ বলে উল্লেখ করেছেন।

২৪১ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী ("তখন বাঙালা দেশে অদূরদর্শী কাটমোল্লার আবির্ভাব ছিল না; সুতরাং মহরম উৎসব তখন বেদাত বলিয়া অভিহিত হইত না।")।

২৪২ শেখ হবিবর রহমান ঃ পরীর কাহিনী।

২৪৩ "মন্দ যখন তোমাদের পীড়া দেয় তাঁকেই তোমরা ডাকো সাহায্যের জন্য।" কোরআন শরীফ, সুরা আল-নহল', সপ্তম অনুচ্ছেদ, ৫৩ আয়াত। প্রাগুক্ত ৩৩০।

২৪৪ আকবরউদ্দীন ঃ মাটির মানুষ; বন্দে আলী মিয়া ঃ ঘূর্ণি-হাওয়া।

২৪৫ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ; কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী।

২৪৬ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ প্রেমের সমাধি; মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা।

২৪৭ মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ারা।

২৪৮ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

২৪৯ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী; মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী

২৫০ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ আত্মদান।

২৫১ মোহাম্মদ রহমতউল্লা ঃ সফুরার পরিণাম; নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ আত্মদান।

২৫২ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী।

২৫৩ শেখ আবদুর রহিম ঃ প্রণয় যাত্রী; আবদুল মজিদ খোন্দকার ঃ প্রেম-বিকাশ।

২৫৪ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ গরীবের মেয়ে; আবদুল মজিদ খোন্দকার ঃ প্রেম-বিকাশ।

২৫৫ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

২৫৬ বন্দে আলী মিয়া ঃ ঘূর্ণি হাওয়া।

২৫৭ মোমতাজউদ্দীন আহমদ ঃ জীবনের সাথী।

২৫৮ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ।

২৫৯ আবুল ফজল ঃ চৌচির; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ।

২৬০ মতীয়র রহমান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী, নূরউদ্দীন; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ হাসান গঙ্গা বাহমনী; মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী।

২৬১ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী।

২৬২ মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী।

২৬৩ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী।

২৬৪ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা।

২৬৫ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার।

২৬৬ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মৃত্যুক্ষুধা।

২৬৭ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা ("বিশ্বাসে ধর্ম পরিবর্ত্তন করি নাই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা আমাকে খ্রীষ্টান করিয়াছে।")।

২৬৮ শেখ হবিবর রহমান ঃ আলমগীর ; মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী ঃ আকর্ষণ।

২৬৯ নূরুল হক চৌধুরী ঃ আকর্ষণ, কালাপাহাড়।

২৭০ শাহাদাৎ হোসেন ঃ মরুর কুসুম।

২৭১ শাহাদাৎ হোসেন ঃ হিরণ-রেখা।

২৭২ শেখ হবিবর রহমান ঃ আলমগীর।

২৭৩ শাহাদাৎ হোসেন ঃ সোনার কাঁকন।

২৭৪ মতীয়র রহমান খান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়-নন্দিনী ; নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ জানকী বাঈ।

২৭৫ শাহাদাৎ হোসেন ঃ মরুর কুসুম।

২৭৬ মতীয়র রহমান খান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী, নূরউদ্দীন ; মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী।

২৭৭ শেখ হবিবর রহমান ঃ আলমগীর ; নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ জানকী বাঈ।

২৭৮ সৈয়দ আবুল হোসেন ঃ দুর্গেশনন্দিনী বা ত্রিজায়জা ; সীতারাম বা কাগজরাজ্য।

২৭৯ সৈয়দ আবুল হোসেন ঃ ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ ; কাজী আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ।

২৮০ এম. মনির হোসেন ঃ অপরিচিতা ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভুলের বাঁধন ; কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মৃত্যুক্ষুধা।

২৮১ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা।

২৮২ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ঃ স্বপ্নদৃষ্টা।

২৮৩ এম. মনির হোসেন ঃ অপরিচিতা।

২৮৪ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কুহেলিকা।

২৮৫ সৈয়দ আবুল হোসেন ঃ সীতারাম বা কাগজরাজ্য, আনন্দমঠ বা নন্দের বন্দী।

২৮৬ প্রাগুক্ত।

২৮৭ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা, মোজাম্মেল হক ঃ জোহরা ; আবু সঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন খান লোহানী ঃ শপথ।

২৮৮ এম. মনির হোসেন ঃ অপরিচিতা ; কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা।

২৮৯ মোহাম্মদ রহমতউল্লা ঃ সফুরার পরিণাম।

২৯০ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মৃত্যুক্ষুধা (সূতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না)

২৯১ সৈয়দ আবুল হোসেন ঃ সীতারাম বা কাগজরাজ্য।

২৯২ মতীয়র রহমান খাঁন ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়-নন্দিনী, নূরউদ্দীন ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান।

২৯৩ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা।

উপসংহার

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে আদিপর্ব বলতে আমি ১৮৮৫-১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে নির্দেশ করতে চাই। এই সময়ের ভেতর মীর মশাররফ হোসেন ছাড়া আর মাত্র দুজন লেখকের দুখানা উপন্যাস[১] আমার হস্তগত হয়েছে। বাকিগুলো আজো দুষ্প্রাপ্য।[২] সেজন্যে মাত্র কয়েকখানা উপন্যাসের উপর নির্ভর করেই আমাকে আদিযুগ প্রসঙ্গ সারতে হয়েছে। এর ভেতর মীর মশাররফ হোসেন কথাসাহিত্যের এই শাখায় যে পরিমাণ দক্ষতা অর্জন করেছেন আদি-যুগ বলে চিহ্নিত সময়ে আর কেউ তেমনটি পারেননি। শুধু তাই নয়, এই সময়ে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলোকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস বলাও শক্ত। তবু ১৯০৪ সাল থেকে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন। শেখ ফজলল করিম বা মতীয়র রহমান খানের ভেতর যে স্বচ্ছন্দপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তাকে একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ১৯১০ সালে প্রকাশিত আবদুল লতিফের 'জোলেখা' নামক উপন্যাস সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকার মন্তব্য একারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৩১৭ সালের এই সংখ্যাটিতে বলা হয়েছে :

> "শ্রীযুক্ত আবদুল লতিফ, ফিরদৌসী ও জামী-কবির পারস্য কাব্য হইতে জোলেখা ও হউসুফের প্রণয় কাহিনী বিশুদ্ধ বাংলায় বর্ণনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। ইহা শুধু কাব্যদ্বয় বর্ণিত উপাখ্যান নহে, ইহার মধ্যে সম-সাময়িককালের বহু ঐতিহাসিক তথ্যও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রণয় ও নিষ্ঠা, সংযম ও চরিত্র, মোসলেম জগতের রীতিনীতি প্রভৃতির বহু মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।"

এরপর থেকে মুসলমানদের প্রচেষ্টা একটা সুস্পষ্ট গতিপথ লাভ করে। আমরা সেই গতিধারা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তাতে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেগুলো নিম্নরূপ।

॥ ক ॥ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ

১.

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের সুচনা হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনা চিত্রায়ণের মাধ্যমে। 'বিষাদ সিন্ধু'তে ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেন যত ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করুননা কেন, তার প্রয়াস প্রশংসনীয়। এরপর অনেকেই ইতিহাস থেকে কাহিনী আহরণ করে উপন্যাস রচনা করেছেন।

যেসব কারণে লেখকেরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন তার একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হলো সমকালীন জীবনবিমুখতা। এই বিমুখতা প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করে সমকালীন জীবনের বাস্তবতা নিয়ে উপন্যাস রচনায় নানাপ্রকার বাধাবিপত্তিতে—যাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকে রাজনৈতিক নির্যাতনের ভয় বা সামাজিক নিগ্রহের আশঙ্কা। মুসলমান ঔপন্যাসিকদের ভেতর উল্লিখিত কারণদ্বয়ের একটাও সক্রিয় বলে মনে হয়না। কারণ সেদিনের রাজনীতি মুসলমানদের অনুকূলে ছিলো। সামাজিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এসব লেখক যে বাস্তব পটভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাতে মনে হয়, সামাজিক নিগ্রহটাও সেদিনের জন্যে সমস্যা ছিলোনা। মুসলিমরচিত উপন্যাসে সামাজিক সমস্যার ব্যাপকতা ও বৈচিত্রই তার প্রমাণ। আমরা জীবনবোধ আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, সেদিন এমন কোন সমস্যা ছিলোনা যার প্রতি মুসলিম ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি, বা তা নিয়ে তাঁরা উপন্যাস রচনা করেননি। অতএব এসব উপন্যাস রচনার পেছনে সমকালীন জীবন-

বিমুখতা কাজ করেছে বলে মনে হয়না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় সব মুসলিম ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকই সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। শুধু তাই নয়, অনেকে এসব উপন্যাসে নানাপ্রকার সমস্যা উত্থাপন করেছেন এবং তার উপর পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়েছেন। ব্যতিক্রম শুধু প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাসের লেখকবৃন্দ। এঁদের ভেতর মোজাম্মেল হক ছাড়া আর কেউ তেমন উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস রচনা করেননি। শেখ ইদরিস আলীর সামাজিক উপন্যাস-গুলোতে সমাজের চাইতে প্রতিক্রিয়াই বেশি।

মুসলিম ঔপন্যাসিকেরা মূলতঃ দুটো কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এর একটা হলো, মুসলিম ঐতিহ্যের গৌরব-গান, অপরটি প্রতিক্রিয়াজাত। গৌরব-গানের উদ্দেশ্যে যেসব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা হয়েছে তার ভেতর তিনখানি উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকা থেকে অতীতের কীর্তি স্মরণ করা হয়েছে। এসব উপন্যাসে বিন্যস্ত ঘটনাক্রম এই ঐতিহ্য-গানে বিশেষ সহায়তা করেছে—সে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের চিত্র হোক বা নির্জলা গৌরবগান। প্রতিক্রিয়া-জাত উপন্যাসগুলোও মূলতঃ ঐতিহাসিক। এসব উপন্যাসে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে তাও ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে উদ্গত। প্রায় সর্বত্রই কোন না কোন জনপ্রিয় ব্যক্তি বা ঘটনাকে এসব উপন্যাসে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম মতীয়র রহমানের 'মোক্ষপ্রাপ্তি'। 'মোক্ষপ্রাপ্তি'র পটভূমিকা ঐতিহাসিক, কিন্তু ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়না। একারণে প্রতিক্রিয়াজাত হলেও তাঁর উপন্যাস পাঠকের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে।

২.

এসব উপন্যাসে উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটি মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এর প্রথম ভাগে রয়েছে মীর মশাররফ হোসেনের

'বিষাদ সিন্ধু'। 'বিষাদ সিন্ধু'র কাহিনীধারা ঐতিহাসিক হলেও লেখক উপাদান গ্রহণ করেছেন মিশ্রভাষারীতির কাব্য থেকে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে শেখ হবিবর রহমানের 'আলমগীর' এবং মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর 'কালাপাহাড়'। এই উপন্যাসদ্বয়ে লেখক সরাসরি কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আরোপের ফলে উপন্যাসদ্বয়ে ইতিহাসের চেয়ে মতামত বা মতবাদ প্রাধান্য পেয়েছে—যা একদেশ-দর্শী মানসিকতার স্বাক্ষর। বাকি উপন্যাসগুলোতে উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। এসব উপন্যাসে ঘটনা তেমন প্রাধান্য না পেলেও ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের ব্যাপারে লেখকেরা বেশ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। মুসলিম ঔপন্যাসিকের বেশির ভাগই ইতিহাসের উপাদানের ব্যবহারে নৈর্ব্যক্তিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই কল্পনা আরোপ করা হয়েছে। কল্পনা এসব উপন্যাসে দুভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। একটা হলো, কোন বিশেষ সাহিত্যাদর্শের অনুকরণজাত—যথা 'বিষাদ-সিন্ধু', অপর ভাগে রয়েছে শাহাদাৎ হোসেন ও নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর উপন্যাসগুলো। এসব উপন্যাসে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, সেগুলো সাহিত্য ও ইতিহাসের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। এসব উপন্যাসকে 'ঐতিহাসিক রোমাঞ্চ' বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে শাহাদাৎ হোসেনের তুলনায় নূরন্নেছা খাতুনের রচনা দুর্বল। কিন্তু তাঁর ইতিহাসচেতনা প্রখর—বিকৃতি একেবারেই কম। শিল্পসৌকর্য বিচার করলে এই রোমাঞ্চগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত—এমন কি 'বিষাদ সিন্ধু'র তুলনায়ও। এসব রোমাঞ্চও নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তিতে ভাস্বর।

শেখ হবিবর রহমানের 'আলমগীর', মোহাম্মদ নূরুল হকচৌধুরীর

'কালাপাহাড়', আবদুল গফুরের 'সোলতানা রাজিয়া'তে কল্পনার প্রাধান্য একেবারেই কম। যদিও কোথাও কোথাও একদেশদর্শী বিশ্লেষণে উপন্যাসগুলো ভারাক্রান্ত। ব্যতিক্রম 'সোলতানা রাজিয়া'। এই উপন্যাসে কল্পনা যেমন প্রাধান্য পায়নি, তেমনি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও কোন বিকৃতি নেই। তবে তার শিল্পমূল্য নগন্য। এসব উপন্যাসে কল্পনা না থাকলেও ইতিহাসের ঘটনাধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অসচেতনতা দুর্লক্ষ নয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। এসব উপাদানের প্রায় সবটাই জুড়ে আছে পাঠান বা মোগল ইতিহাস। শাহাদাৎ হোসেন 'সোনার কাঁকনে' মোগল-ইংরেজ সন্ধিযুগের উপাদান ব্যবহার করেছেন। এছাড়া 'বিষাদ-সিন্ধু' ও 'সোফিয়াতে' বহির্ভারতীয় ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে—তার ভেতর প্রথমটি ইসলামের আদিযুগের, দ্বিতীয়টি নব্যতুরস্কের।

॥ খ ॥ সামাজিক

১.

এসব উপন্যাসে পূর্বরাগের দৃশ্য একেবারেই কম। দুয়েকখানা উপন্যাসে পূর্বরাগের চিত্র থাকলেও তাতে গাঢ়তা যেমন নেই, তেমনি পরিমিতিজ্ঞানও অনুপস্থিত। ফলে কাহিনীতে তার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়না। কারণ এজাতীয় প্রেমানুভূতি অস্ফুট। শুধু তাই নয়, এসব উপন্যাসে কখনো কখনো ছবি বা স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রেমানুভূতি সঞ্চারের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এর একমাত্র কারণ মুসলিম সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথা। এই প্রথার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দুয়েকখানা পূর্বরাগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেগুলোও ব্যাপক বিরূপতার সম্মুখীন হয়েছিলো। উদাহরণ হিসেবে মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন রচিত 'আনোয়ারা' উপন্যাসের

সমালোচনা প্রসঙ্গে গোলাম মোস্তফার উক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই সমালোচনায় তিনি নদীর খোলা ঘাটে আনোয়ারার ওজু করার দৃশ্যের সমালোচনা করেছিলেন।[৩] ফলে লেখকদের সামনে শুধু দুটো পথই খোলা থাকে। তার একটা হলো, নীরব প্রেমের ডালি নিয়ে পরস্পরের কথা স্মরণ করা, অন্যটা হিন্দু নারীর কাছে প্রেম নিবেদন করা। এই উভয় পথই আবার কাল্পনিক। ফলে এসব ঘটনা থেকে প্রেম সম্পর্কে কোনপ্রকার ধারণা জন্মানোর কথা নয়। সেজন্যে যখনি নায়ক-নায়িকার সামনে প্রেমালাপের সুযোগ আসে, তখন স্থূল কথাবার্তাতেই সেটি সারতে হয়, কোন প্রকার সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য তাতে থাকে না। এর বিকল্প মাত্র একটা। তাহলো, বিয়ের পর রাগ-অনুরাগ বিনিময় এবং সেজাতীয় দৃশ্য কল্পনা।

প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসে প্রেমিক বা প্রেমিকা পরস্পরের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এই অসুস্থতার কোন কারণ নেই বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কারণ আরো গভীরে নিহিত। প্রেমিক বা প্রেমিকার অনুপস্থিতির যে প্রভাব তাদের বিচলিত করে তার একটা রূপ যেমন রয়েছে, তেমনি তার বিশ্লেষণও। এই রূপ যদি লেখক উপলব্ধি করতে পারেন তবেই তাঁর পক্ষে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কিন্তু এসব লেখকের অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা এত সীমিত যে, তাঁদের পক্ষে এর গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়না বলে তাঁরা কিছু বাহ্যিক লক্ষণ কল্পনা করেন, যা অসুস্থতার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই কল্পনায় তাঁরা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য বা তার পরবর্তী বাঙলা কাহিনী কাব্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়।

একই পদ্ধতি কাহিনীতে চমক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হয়েছে। 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করতে হলে তার নির্মাণকৌশল জানা চাই—যা পাশ্চাত্য শিল্পরীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এসব

ঔপন্যাসিকের বেশির ভাগের সেই রীতির সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে বলে মনে হয়না। ফলে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি করে তাতে পাঠককে টেনে নিয়ে যেতে পারেননি। অথচ পাঠক যদি নিজেকে ঘটনাধারার সঙ্গে সংযুক্ত করতে না পারেন তাহলে উপন্যাস জনপ্রিয়তা হারায়। এসব কারণে উপন্যাসগুলোতে এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, যার মূলে কোন বাস্তববোধ যেমন নেই, তেমনি চিন্তাশক্তির পরিচয়ও নেই। এর ভেতর একটা স্থূলত পদ্ধতি হলো, নায়ক বা নায়িকাকে মাতাপিতার একমাত্র সন্তান কল্পনা করে তার অর্থ, রূপ বা স্বভাবের প্রতি পাঠককে আকর্ষণ করা। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়, যা পাঠককে কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ করে। অথচ এই আকর্ষণ সৃষ্টি করা উচিত ছিলো দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে।

এইজাতীয় মনোভাব দেখে এসব উপন্যাসকে বাঙলা উপন্যাসের সক্ষম অনুকৃতিও বলা যায় না। কারণ এই সময়ের ভেতর বাঙলা উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এটি রীতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের জন্যেও হতে পারে। কারণ এসময় যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে, তাতে অনুকরণ করা ছাড়া অন্য কোনপ্রকার পরীক্ষা-নীরিক্ষা দেখা যায়না।

২.

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রবল ধর্মানুভূতি আরোপ এসব উপন্যাসের আরেক বৈশিষ্ট্য। এই গোটা ধারণাটাই মধ্যযুগীয়। ফলে স্ত্রী নিজেকে সর্বদাই পুরুষের দাসী বলে কল্পনা করতে অভ্যস্ত। এই কল্পনার একটা উৎকট বহিপ্রকাশ হলো, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর কদমবুচি। এই মনোভাব ইসলাম ধর্মের নারীসম্পর্কিত ধারণার পরিপোষক।[৪] পুরুষেরা একই কর্তব্যবোধের অনুরোধে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে থাকে।

প্রায় সর্বত্র উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকার অন্য দোষগুণ যাই থাকনা কেন, তারা ধর্মবোধের দ্বারা পরিচালিত। এই ধর্মবোধ প্রবল উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে রচিত, কোনপ্রকার ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত নয়। এই কারণে বহু উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ধর্মকর্ম ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক জীবন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই সমাজ মধ্যবিত্ত সমাজ। এবং যে মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ এসব উপন্যাসের শিল্পসৌকর্যের অনুকূল সে সমাজের চিত্র এসব উপন্যাসে বেশি—যাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্র অঙ্কনে সক্ষম বা অনীহ তাঁদের বেশির ভাগই দূর অতীতের আলো-ছায়া থেকে কাহিনী চয়ন করেছেন। সমকালীন জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে খুব কম লেখকই উচ্চবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তের শরণাপন্ন হয়েছেন। উল্লিখিত ধর্মবোধ তুলনামূলকভাবে এই সমাজেই বেশি।

আশরাফ ও আতরাফ অনুভূতির মূলে কোন ধর্মানুভূতি কাজ না করলেও, তার অহমিকা প্রচুর জলসিঞ্চন করে। যদিও এই তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ববোধের মূলে হিন্দুদের জাত্যাভিমানই বেশি সক্রিয় তথাপি আশরাফ শ্রেণী ধর্মকে একটা বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। আশরাফ ও আতরাফ প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে, আশরাফ শ্রেণী বলে কথিত চরিত্র সর্বদাই নিজেদের বহিরাগত বলে দাবি করে। বাহির বলতে তারা দুটো স্থানকে নির্দেশ করে। এর একটা হলো বাইরে অবস্থিত মুসলিম অঞ্চল। যেমন, বাগদাদ, খোরাসান, হিরাত ইত্যাদি। অন্যটি বঙ্গদেশের বাইরের মুসলিম অধ্যুষিত ভারতীয় অঞ্চল। যেমন, কাশ্মীর, দিল্লী লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি। বহিরাগত বলে দাবিদার এসব 'শরীফ' মানুষের চিত্র অঙ্কনের পেছনে প্রায়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে বলে মনে হয় না। বরং তাঁরা এর অন্তর্নিহিত হীনম্মন্যতা সম্পর্কে মোটেই অবহিত নন। নচেৎ তাঁরা বুঝতে পারতেন, বঙ্গদেশ,

বাঙলাভাষা ও বাঙালী আবহের প্রতি তাঁরা যে আকর্ষণ অনুভব করছেন, তার সঙ্গে এই চিত্র অসঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য এই প্রচারের পেছনে যে কোন সত্য নিহিত নেই, একথা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তাঁর একটি উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। সেই উপন্যাসে একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান সাধককে তাঁর অর্থশালী উত্তরপুরুষ বিদেশ থেকে আগত বলে দাবি করেছে। এই চিত্র যে উদ্দেশ্যমূলক একথা উপলব্ধি করতে তেমন অসুবিধে হয়না। অনুরূপ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী সজ্ঞানে বহিরাগত অবাঙালী মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান করেছেন। এই উভয়পক্ষই উল্লিখিত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। শেষপক্ষের ধারণা বঙ্গদেশবহির্ভূত ব্যক্তিমাত্রই মোগল বা পাঠানের বংশধর। এই ধারণার সঙ্গে তিনি ধর্মান্তরকে একীভূত করে বাঙালী মুসলমানদেরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কারণ বহিরাগতরা এখানে এসে যাঁদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন তাঁরা ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ তাঁরাও বর্ণবিচারে শ্রেষ্ঠ। শিরাজীর উপন্যাসে তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

৩.

এসব উপন্যাসে পারিবারিক সম্পর্ককে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিকদের অনেকেই পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেননি। উপন্যাসের উপরে প্রকৃতিসূচক পরিচিতি তার প্রমাণ।

পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অনেকে বহুবিবাহের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এতে ভিন্নধর্মী মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কারো উপন্যাস পড়েই এর কারণ অনুমান করা যায়না যেহেতু মানবিক অনুভূতিও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু তার অন্তর্নিহিত আবেগ আবিষ্কার করা দুরূহ। সম্ভবত বহুবিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধেই বেশি কাজ করেছে কারণ, বহু-

বিবাহের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য নেই, কিন্তু তার পক্ষে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। ঔপন্যাসিকদের একটা বিরাট অংশ বহুবিবাহ সমর্থন না করলেও, সম্ভবতঃ ধর্মীয় অনুশাসনের কথা চিন্তা করে তা প্রকাশ করেননি। তাঁরা শুধু অশান্তি ও কলহের চিত্র অঙ্কন করে সমাজ বা পরিবারে তার প্রতিক্রিয়াটাই ব্যক্ত করেছেন, নীতিগত দিক সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নির্ধারিত। ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগও মুসলিম ইতিহাসে ব্যাপক। ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা পুত্রে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের ভেতর রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামা ইসলামের আদিযুগ থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এসব উপন্যাসে উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগের তেমন কোন চিত্র নেই। কারণ, প্রায়ই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান—যেখানে পর্যাপ্ত ধনসম্পদ নেই। যে দুয়েকঘর বিত্তশালীর চিত্র রয়েছে, তাদের সন্তানসন্ততি বেশি না থাকায় কোন গোলযোগ দেখা যায়নি। তবে বিত্তশালীর একমাত্র সন্তানের ভাবী সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে নানাপ্রকার চক্রান্তের কাহিনী দেখা যায়, যার সঙ্গে আইনের কোন সম্পর্ক নেই। এই কারণে মামলা-মোকদ্দমার চিত্রসমূহের সঙ্গে এই আইন সম্পর্কিত নয়।

তবে উপন্যাসে মামলা-মোকদ্দমা, থানা-পুলিশের বিবরণ বহু রয়েছে। এসব মামলা-মোকদ্দমার পেছনে নানাপ্রকার সামাজিক কারণ কাজ করেছে বটে, কিন্তু পারিবারিক কারণ খুবই কম। যে কয়েকখানা পারিবারিক কারণে ঘটেছে, তার ভেতরও উত্তরাধিকারের ভূমিকা কম। অনেকক্ষেত্রে কাহিনীতে চমক সৃষ্টির জন্যেই এপথ অবলম্বন করা হয়েছে।

মুসলিমরচিত প্রথম উপন্যাসটির মৌল ভিত্তি সপত্নীবিদ্বেষ—যা মুসলিম পরিবারের একটা অতি পুরাতন সমস্যা। অতএব এসব

উপন্যাসেও সপত্নী বিদ্বেষের নানা প্রকার চিত্র রয়েছে। তবে প্রায় সর্বত্রই এই বিদ্বেষটিকে গাসহা করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এর পেছনে যে ধর্মীয় অনুশাসনজনিত আবেগ কাজ করেছে তা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পুরো সমস্যাটিই সামাজিক—যা পারিবারিক জীবনেই বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৪,

এসব উপন্যাসে বহু ধর্মান্তরণের চিত্র রয়েছে। এসব ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হলো প্রায় লেখকই ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের উচ্চবর্ণের হিন্দু বলে দাবি করেছেন। অবশ্য ধর্মান্তরণের পেছনে এমনিতেই একটা প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যাপার কাজ করে—যা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে উৎসারিত। এর মূলে কাজ করেছে বঙ্গদেশের মুসলমানদের বংশমূলসংক্রান্ত সেই বিতর্ক—যার সূচনা করেছিলেন খোন্দকার ফজলে রাব্বি। তিনি দাবি করেছিলেন, বঙ্গদেশের মুসলমানদের মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশই ধর্মান্তরিত, বাকিসব পৃথিবীর নানা মুসলিম দেশ থেকে আগত। কিন্তু এই লেখকেরা মুসলমানদের ব্যাপক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এই দাবি মেনে নিতে পারেননি, অথচ নিজেদের নিম্নবর্ণের হিন্দু বা বৌদ্ধদের বংশধর বলে ভাবতেও তাঁদের খারাপ লাগছিলো। ফলে তাঁরা যত্রতত্র ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ হিন্দু খুঁজে বের করেছেন এবং তাঁদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষার মাধ্যমে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে চেয়েছেন। এসব প্রচারণার একটা লাভ হলো, মুসলমানদের ধমনীতে তথাকথিত মোঘল ও পাঠান রক্তধারা প্রবাহিত বলে যে বিশ্বাস চালু করার চেষ্টা চলেছে তা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, নিম্নবর্ণের হিন্দু বা বৌদ্ধদের ধর্মান্তরণের পেছনে ইসলামের ঔদার্য যে ভূমিকাই পালন করুকনা কেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকাও এক্ষেত্রে কম কাজ করেনি। মুসলমান লেখকেরা এখন

ইতিহাসের সেই বিস্মৃত অধ্যায়ে আর ফিরে যেতে চাননা। নচেৎ তাঁরা মুসলমান নামের পেছনে 'সরকার', 'বিশ্বাস', 'ঠাকুর', 'মল্লিক' ইত্যাদি দেখে তা উপলব্ধি করতে পারতেন।

এছাড়া সাধারণ লেখকদের প্রবণতা ঠিক উল্টো। তাঁরা প্রায়ই এজাতীয় বিতর্ক পরিহার করেছেন এবং উপন্যাসে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কন করেছেন। একারণে মুসলিমরচিত উপন্যাসের প্রায় সর্বত্রই যুগপৎ হিন্দুমুসলমান চরিত্র দেখা যায়—যাদের পরিচয় নামে বা ধর্মকর্মে নয়, কাজে। এই ক্ষেত্রে মুসলিম লেখকদের ঔদার্য স্বীকার করতেই হবে। এরকম ব্যাপকহারে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চরিত্র সৃষ্টি করা কোন হিন্দু লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৫.

এসব উপন্যাসের সর্বত্রই বঙ্গদেশ এবং তার জনপ্রিয় আবহ স্বীকৃতি লাভ করেছে ফলে লেখকরা যেখান থেকেই কাহিনী চয়ন করুননা কেন, বা যে ভাষাভাষীর চরিত্র সৃষ্টি করুননা কেন, তাঁরা দেশ ও মাটির কথা একমুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেননি। একারণে বহু উপন্যাস যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি বহু চরিত্রও খেলো হয়ে গেছে। এই ভাবধারার পেছনে যৌথ অনুভূতি—দেশভিত্তিক ও দেশাতীত—কাজ করেছে বলে মনে হয়। এই গুণটির জন্যেও মুসলমান লেখকেরা ধন্যবাদের পাত্র।

এই দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব ও মৌলিকত্ব বাঙলা ভাষাপ্রীতিতেও লক্ষ্য করা যায় প্রায় সব উপন্যাস বিশুদ্ধ বাঙলায় রচিত। ফলে কোন উপন্যাসেই তেমন ব্যাপকহারে আরবি-ফারসি শব্দ প্রাধান্য পায়নি। এমন কি যাঁরা প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাস রচনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁরাও বিশুদ্ধ বাংলায় উপন্যাস রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, মোজাম্মেল হকের মতো মিশ্রভাষারীতির প্রবল

অনুরাগীও ভাষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, এসব ঔপন্যাসিক সর্বদা শুদ্ধ বাঙলা লিখতেন। ভাষার ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা স্বীকার করেই আজ আলোচনা করতে হবে।

ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আরো একটা বিষয় আমাকে বিস্মিত করেছে। তাহলো, সংলাপে বাঙলার বদলে বিশুদ্ধ উর্দু বা হিন্দুস্থানী ব্যবহার। প্রায় সব উপন্যাসেই চাকর, মালী, দারোয়ান, পাইক-পেয়াদা ইত্যাদি অশিক্ষিত ও মানমর্যাদাহীন ব্যক্তিরাই এসব ভাষায় কথা বলে থাকে। কাজী আবদুল ওদুদ ও বেগম রোকেয়ার উপন্যাসে এই ব্যবহার আরো বিস্ময়কর। কারণ, তাঁদের উপন্যাসে চরিত্র, সংলাপ বা আবহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচুর সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। একারণে প্রবণতাটিকে একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন আখ্যা দেওয়া যায়।

সমকালীন রাজনীতিবিমুখতা এসব উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমাদের আলোচ্য সময়সীমার রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই সময়ে উত্থিত আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা সুদূরপ্রসারী। অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদী ও খেলাফৎ আন্দোলন, হিন্দুমুসলিম মিলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কার্যক্রম ইত্যাদি সেই প্রভাবের ফল। কিন্তু কোন উপন্যাসেই এসব আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ছায়াপাত নেই, পরোক্ষ যা আছে তাও ক্ষীণ। এম. মনির হোসেন তাঁর 'অপরিচিতা' উপন্যাসে একটি সন্ত্রাসবাদীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন, কিন্তু তাতে সুস্পষ্ট কোন কর্মধারা নেই। তবে 'খানবাহাদুর' পিতার জীবনে পুত্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ছাপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। এছাড়া কাজী নজরুল ইসলামও স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন ; তার ফলাফল 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'য় ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরেজভীতিই এর একমাত্র কারণ বলে মনে হয়, প্রীতি নয়। প্রীতি হলে এসব

আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনায়াসেই লেখকবৃন্দ সোচ্চার হতে পারতেন। অবশ্য বেসরকারী রাজনৈতিক প্রতিশোধের ভয়ও দু' এক ক্ষেত্রে এই বিমুখতায় ইন্ধন যোগাতে পারে। কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই।

উল্লিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিক্রিয়া এসব উপন্যাসে অত্যন্ত গভীর। প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন এক্ষেত্রে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লেখকের শিল্পানুভূতি। কারণ এসব ভাবধারা আরোপের দরুন উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে। ফলে সমালোচকের পক্ষে এসব রচনাকে শৈল্পিক দৃষ্টি-কোণ থেকে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। এসব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিল্পের চেয়ে সমাজের সম্পর্কই বেশি।

॥ জ ॥ লোককাহিনীনির্ভর

মুসলিমরচিত প্রথম বাঙলা উপন্যাস হিসেবে যে গ্রন্থটি প্রায় সকল সমালোচকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী'। এই গ্রন্থের কাহিনী লোকজীবন থেকে আহৃত বলে গবেষকেরা অনুমান করেছেন। অতএব মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের উন্মেষপর্বে লোককাহিনীর প্রভাবই বেশি ছিলো—যার থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে কথিত 'বিষাদ-সিন্ধু'ও মুক্ত নয়। উপন্যাসের এই যাত্রা দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিলো। এসব উপন্যাসের অনেকগুলোই এখন দুষ্প্রাপ্য। আমাদের আলোচনায় মাত্র পাঁচখানা লোককাহিনীনির্ভর উপন্যাস রয়েছে। এগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে শেখ হবিবর রহমানের 'পল্লীর কাহিনী' এবং আবদুল মজিদ খোন্দকারের 'প্রেম-বিকাশ'। অন্য-ভাগে শেখ ফজলল করিমের 'বিবি রহিমা', 'রাজর্ষি এবরাহিম' এবং এম. নাসিরুদ্দীনের 'শিরী-ফরহাদ'।

প্রথমভাগে উল্লিখিত কাহিনীদ্বয়ের মূল খুঁজে বের করা অসম্ভব।

কারণ পরীর কাহিনীর মূলে একটা ধর্মবিশ্বাস কাজ করলেও সে বিশ্বাস কতদূর বিস্তৃত তা বলা মুসকিল। তবে মুসলিম জগতে প্রচলিত লোককাহিনীর সঙ্গে জিন ও পরীর বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জিন ও পরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে দেও। যেসব জিন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নয়, তারাই দেও নামে পরিচিত। 'আরব্য উপন্যাস' এবং 'হাতেম তায়ী'র মতো জনপ্রিয় উর্দু-ফারসি উপাখ্যানে জিন-পরী-দেওয়ের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাকি উপন্যাসগুলোর উপাদান জনপ্রিয় ফারসি বা আরবি কাহিনী থেকে আহৃত। এর ভেতর 'রাজর্ষি এবরাহিম'-এর সঙ্গে ইতিহাসেরও খানিকটা সম্পর্ক রয়েছে। এসব উপাখ্যানের সঙ্গে মিশ্রভাষারীতির কাব্যের সম্পর্ক আছে। 'বিষাদ-সিন্ধুর'র কথা আগেই বলা হয়েছে। শিরি-ফরহাদের প্রণয় নিয়ে মিশ্রভাষারীতির কাব্য উনবিংশ শতাব্দী থেকেই জনপ্রিয় ছিলো। আদহমের প্রণয়-কাহিনী মিশ্র ভাষারীতির 'তাজকেরাতুল আওলিয়া'র অংশবিশেষ। এই সাদৃশ্য থেকে একটা কথাই অনিবার্যভাবে মনে পড়ে। বাঙলা উপন্যাসের প্রকৃত সূচনার পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যের জনপ্রিয় উপাখ্যান যেমন 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র রূপ নিয়ে ছিলো, সেই আদর্শে কোন কোন মুসলমান লেখকও মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি-ফরাসি-মূলীয় জনপ্রিয় বাঙলা কাহিনীকাব্যকে গদ্য আখ্যানে রূপান্তরিত করেছিলেন। এগুলো যেখানে উপন্যাস হয়ে ওঠেনি, সেখানেও এই গদ্য উপাখ্যান জনপ্রিয় হয়েছিলো। আর অনিবার্য-ভাবে সেখানেও 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাসে'র প্রভাব ব্যাপ্ত হয়েছিলো। শেখ ফজলল করিমের রচনায় বিশেষভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রভাব কাহিনী বিন্যাসে বা প্রকাশ ভঙ্গিতে অতটা নেই, যতটা আছে প্রেমময়ী নারীর আত্মত্যাগ, নির্যাতন স্বীকার ও আদর্শ-জীবনযাত্রার প্রকাশে। প্রকৃত জীবনের ঘটনার সঙ্গে অতি প্রাকৃতের ঘনিষ্ঠ যোগও উভয় ধারার সাধারণ লক্ষণ।

পাদটীকা

১ প্রেম দর্পণ (১৮৯১) ও প্রণয়যাত্রী (১৮৯২)।

২ কফিলউদ্দীন আহমদ : নিষাদ কুমারী (১৮৯৩) ; মহাম্মদ জমিলদ্দীন : তারাবাঈ মনোহরা (১৮৯৬) ; মোঃ ওসমান আলী : হাফেজ সাহেব (১৯০০) : শেখ সাজ্জাদ করিমের : আমিনা (১৯০০) ; মুনসী রিয়াজউদ্দীন আহমদ : আমিরজানের ঘরকন্না, জোলেখা (১৯০০)

৩ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৬।

৪ "পুরুষরা স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণকারী (অভিভাবক), যেহেতু আল্লাহ এদের এক শ্রেণীর" অন্যশ্রেণীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কোরআন শরীফ ; সূরা আন-নিসা, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ, ৩৪ আয়াত। কাজী আবদুল ওদুদ অনূদিত, প্রথম খণ্ড, ৯০।

নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	লাঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০	১২	ভেতর	ভেতর
৮২	১৩	আলিমুলাহ	আলিমুল্লাহ
৮৭	১৮	আজ্জুমান	আঞ্জুমান
১০৩	২০	১৮১৭	১৮৩৭
১১৮	৯	সংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক
১২৪	১৮	পড়িয়া	গড়িয়া
১৩৪	২১	নামধের	নামধেয়
১৩৫	২১	সামন্তরাল	সমান্তরাল
১৭৫	৬	সরক	সবক
৭৭	২	সমমানবিকতার	সমমানসিকতার
১৮৮	২৬	জ্ঞানবৃদ্ধারাই	জ্ঞানবৃদ্ধরাই
১৯৩	৭	চালিয়ে	চারিয়ে
১৯৭	৩	জশ	জন্ম
২০৪	১২	দ্বন্ধের	দ্বন্দ্বের
২০৫	৭	পায়না	পাওনা
২০৫	১১	প্রবণত্ব	প্রবলত্ব
২০৮	১১	স্ত্রী	শ্রী
২০৮	১৮	মেজ-বৌ	সেজ-বৌ
২০৮	১৯	মেজ-বৌ	সেজ-বৌ
২০৯	১৫	রেগে উঠলো	জেগে উঠলো
২১১	৯	ফেলে	ক্ষেত্রে
২১৩	১৯	সাম্রাজ্যের	সাম্রাজ্যের
২১৪	১০	হিবেবে	হিসেবে
২১৯	১১	মোটা	গোটা
২১৯	২৫	সঙ্গে সঙ্গে	সঙ্গে
২২৩	৮	দৈর্ব	দ্বৈধ
২২৩	২২	সমুদ্রে	সমূলে

পৃঃ	লাঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৩	২৫	বিকিনিতে	বিকিকিনিতে
২২৬	২৪	মদজিদ	মসজিদ
২২৯	২৪	চেয়ে	ক্ষেত্রে
২২৮	২৬	বিবাহ বাদী	বিবাহাদি
২৩৯	৭	ঘৃণ্যপ্রযুক্ত	ঘৃণাপ্রযুক্ত
২৪০	১০	কাহিনীনিয়ম	কাহিনীনির্মাণ
২৪০	২৪	আকতার	আফতাব
২৪৩	১৯	আরমাদার	আয়মাদার
২৫০	২৭	চরিত্রগোষ্টকে	চরিত্রগোষ্ঠীকে
২৫৪	১০	বত্তশদেশের	বঙ্গদেশের
২৫৯	২৬	গর্বিত	গর্হিত
২৬২	৪	অনুলব্ধির	অনুপলব্ধির
২৭২	২	লোফিয়া	সোফিয়া
২৭২	২৪	আলাদ	আসাদ
২৭৫	১৩	(আসলে আলি)	(আসলে অলি)
২৮১	৩	যেভাবে	খেতাবে
২৮৩	১৪	ছিলোনা	বেশি ছিলোনা
২৮৫	৮	নূরন্নেজা	নূরন্নেছা
২৮৬	১৮	ঘটনায়	ঘটনার
২৮৬	২৫	পৌছুনে৷	পৌছুলো
২৮৮	৪	হরতনের	হরতালের
২৮৮	৭	নুরন্নেহা	নুরন্নেছা
২৮৯	৮	যতিন	মতিন
২৮৯	১২	গোসন	গোসল
২৯১	১৭	অনেকে	কনেকে
২৯২	২৭	রোবেয়া	রোকেয়া
২৯৬	১৫	গণিতে	গণ্ডিতে
২৯৯	৭	গল্পোপন্যাস	পত্রোপন্যাস
৩০৪	২	বয়ান	বন্ধন

পৃঃ	লাঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৪	১১	সূক্ষ্ম মূল্য	মূল্য
৩০৯	২৮	সুর	সুর
৩১৪	৬	পারম্পর্য	পারম্পর্য
৩১৪	৮	ঝড়ে	ঝরে
৩১৭	২২	শেষ	শেখ
৩২০	১৫	রেয়াতুদ্দীন	রেয়াজুদ্দীন
৩২৬	৭	শিবাজী	শিরাজী
৩২৮	৩	"	"
৩২৯	১৪	দৃঢ়তা	গাঢ়তা
৩২৯	১৫	মৌন	মৌল
৩৩০	১৬	সোদারতা	সেবারতা
৩৩০	১৮	কন্যাকে	কন্যা
৩৩১	১৪	ছন্নদেন	ছন্নদেল
৩৩১	২৫	শিরাজীও	শিবাজীও
৩৩২	১০	প্রশ্নের	গ্রন্থের
৩৩৫	১১	উপন্যাসেতে	উপন্যাসের
৩৩৬	১০	অশোধনীয়	অশোভনীয়
৩৩৯	১৮	'মধুর কুসুম'	'মবুর কুসুম'
৩৪৮	৬	রাতী	রাজ্ঞী
৩৪৯	২৭	জুরে	জুড়ে
৩৫০	২৭	অভিজ্ঞতা	আভিজাত্য
৩৫৩	৩	গড়তে	পড়তে
৩৬০	২৪	ঐতিহাসিকদের	ঔপন্যাসিকদের
৩৬৬	২০	শিকার	শিক্ষার
৩৬৭	১৪	১৮৮০	১৮৮২
৩৬৯	১০	চালিয়ে	চারিয়ে
৩৬৯	২৭	অসতই	অমতই
৩৭৯	২৪	পরে	পক্ষে

এছাড়া 'দরুন' 'এতদ্দারা', 'আকাঙ্ক্ষা', উপলব্ধি, 'আহৃত', 'ধরন'—জাতীয় শব্দের বানান ভুলক্রমে প্রায়ই 'দরুণ', এতদ্বারা, 'আকাঙ্খা'' উপলব্দি, 'আহুত', এবং 'ধরণে' রূপান্তরিত হয়েছে। কোন কোনক্ষেত্রে 'শিল্প' বানান 'শিক্ষায়' রূপান্তরিত হয়েছে। উপরন্তু রেফে (') দ্বিত্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বহু ভুল রয়ে গেছে।